প্রথম সংস্করণ : ১৯৫৩

ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস :
৩/৫ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১

আঞ্চলিক অফিস :
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩
নিকল রোড, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই ১
৩৬এ মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ ২
বি-৩/৭ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১

প্রকাশক : শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাশ
ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

মুদ্রক : শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৬

॥ উৎসর্গ-পত্র ॥

একটানা সুযোগ-সন্ধানের ঐতিহ্য ভেঙে
দেশে
দুর্যোগের সাধনা করলেন যাঁরা,
যাঁরা নিজেদের জীবন এবং বাণী দিয়ে
প্রেরণা যুগিয়েছেন
আমার জীবনে অতীতে
আজও যুগিয়ে চলেছেন—
তাঁদের কাছে
ভক্তি-নিবেদন।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

॥ চিত্রসূচী ॥

পরিচিতি : প্রথম ওরিয়েণ্ট লংম্যান সংস্করণ

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে 'বিপ্লবের পদচিহ্ন' প্রথম প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন কাগজে বইখানি সুখ্যাতি পেয়েছিল ; বহু পাঠকের মনও আকর্ষণ করেছিল। কয়েক বছরের মধ্যে বইখানির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এর মধ্যে বহু পঠনেচ্ছু লোক বইখানির সন্ধানে এসে বিফল হয়ে গেছেন। তবুও নানা কারণে বইখানা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এর একটা প্রধান কারণ ছিল ভূপেনবাবুর রাজনৈতিক ব্যস্ততা। ১৬।১৭ বছর তাঁর কেটেছে পাকিস্তানের ঊষর ও ব্যর্থ রাজনীতির মধ্যে। সেখান হতে যখন কোনো প্রকারে ভারতে চলে আসতে পারলেন, তখনও এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ করার মতো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করতে তাঁর কিছু সময় লাগল। প্রায় দু'বৎসর পূর্বে ওরিয়েণ্ট লংম্যান (Orient Longman) এই পুস্তকের পুনঃপ্রকাশে আগ্রহ দেখালে, ভূপেনবাবু পাণ্ডুলিপি তৈরি করায় মন দেন।

গত কয়েক বছরে বিপ্লবী যুগের বিষয় নিয়ে বহু বই বের হয়েছে এবং পাঠক-সমাজে আদৃতও হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে ঐ সব বই বাংলার বিপ্লবী যুগের ইতিহাস নয় ; বরং বাস্তবকে বিকৃত ক'রে ঐ সব পুস্তককে করা হয়েছে রোমাঞ্চকর কাহিনী বা রম্যোপন্যাস। ইতিহাস বা ইতিহাস-ভিত্তিক কিছু লিখতে হলে প্রথমেই দরকার ঘটনা নিরূপণ করা। যে ধৈর্য ও অনুসন্ধিৎসা এর জন্য দরকার, ঐ সব লেখকগণ তার জন্য কষ্ট স্বীকার করতে চাননি। অনেক সময় গোষ্ঠীগত, দলগত বা ব্যক্তিগত মাহাত্ম্য প্রচার করার জন্যও সত্যকে বিকৃত করা হয়েছে। তাছাড়া, কাহিনীকে পাঠকের কাছে মুখরোচক ক'রে পুস্তকের আদর বাড়াবার আগ্রহ আছে। দুঃখের বিষয় যে সত্যের সঙ্গে সংস্রব-বর্জিত ঐ সব রম্য-রচনাও অনেকের কাছে ইতিহাসের আদর পাচ্ছে।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবী লিখেছেন যে ইতিহাসে তিনটে জিনিস

থাকে— প্রথম : সত্য ঘটনা নির্ণয় ও লিপিবদ্ধ করা (ascertainment and recording of facts), দ্বিতীয় : সত্য ঘটনাসমূহের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা কয়েকটি সাধারণ সূত্রের বিন্যাস বা ব্যাখ্যা করা (elucidation of general laws) এবং তৃতীয় : ঐ সব নির্ণীত সত্য ঘটনাকে শিল্পিক-ভাবে সাজিয়ে কাহিনীরূপে বিন্যাস করা (recreation of 'facts' in the form of fiction)। এর মধ্যে তাঁর প্রথম শর্ত হল—সত্য ঘটনা নির্ণয় করা।

আরিস্টটল ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কাহিনী বর্ণনার (history, science and fiction) মধ্যে একটা পার্থক্য টেনেছেন। এই তিনটি বিষয়ের আলোচনা পৃথক-পৃথকভাবে করতে হবে— এই হল আরিস্টটলের মত। টয়েনবী তাকে মূলত সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। আজ বাংলাভাষায় যাঁরা বহু জীবনী বা রাজনৈতিক পুস্তক লেখেন— তাঁদের সামনে আরিস্টটলের ও টয়েনবীর মতটা আমি তুলে ধরতে চাই।

সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে, যে বিরাট আন্দোলনের পিছনে ছিল মহান আত্মাহুতির আদর্শ, নিজেদের প্রাণ দিয়ে মৃতপ্রায় জাতির দেহে প্রাণের সঞ্চার করার আদর্শ, সেই আদর্শকেও বহু পুস্তকে বিসর্জন করা হয়েছে। এমনভাবে কাহিনী সাজানো হয়েছে যেন জীবনে ব্যর্থ হয়ে কিছু সংখ্যক যুবক অর্থহীন, আদর্শহীন ও মহৎ-উদ্দেশ্যহীনভাবে সমাজ জীবনে উৎপাত সৃষ্টি করেছে। বাংলার গৌরবের ইতিহাসকে এইভাবে পাঠকদের কাছে বিকৃত ক'রে দেখানো মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

ভূপেনবাবু আজ বার্ধক্যের প্রায় শেষ প্রান্তে পা দিয়েছেন। ১৯০৫-০৬ সাল হতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত— এই ৪০ বছরই গেছে তাঁর কৃচ্ছ্রসাধন ও সংগ্রামের জীবন। রাজনীতি হতে তিনি অবসর নিয়েছেন বহুদিন পূর্বে। আত্মপ্রচারে একটা অনীহা তাঁর বরাবরই ছিল। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা যা ছিল, তার সুষ্ঠু প্রয়োগ হয়নি— তারও মূলে ঐ অনীহা। আমাদের যুগের কথা নিয়ে কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন আজ এসেছে— বিশেষ ক'রে বাংলার অশান্ত যুব-মনের সামনে একটা আত্মাহুতির আদর্শকে স্থাপন করার জন্য। আমরা যে অবস্থায় যে পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম— আজকের যুবকদের পক্ষে সে অবস্থা নেই, সে পন্থার প্রয়োজনও নেই; কিন্তু প্রয়োজন আছে তাদের নিষ্ঠা ও ত্যাগস্বীকারের জন্য আগ্রহ।

ভূপেনবাবুর পুস্তক বাস্তবভিত্তিক ইতিহাস —সত্য ঘটনার বিন্যাস; আর

তার পিছনে ছিল যে বিরাট একটা আদর্শের প্রেরণা—তার মূল সূত্র বের করার প্রয়াস। সমস্ত কাহিনী তিনি বিবৃত করেছেন শিল্পী ও সাহিত্যিকের দক্ষতা নিয়ে। আশা করি এই পুস্তক পাঠকদের কাছে, বিশেষ ক'রে আজকের যুবক কর্মীদের কাছে, আদৃত হবে।

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

পরিচিতি : প্রথম সংস্করণ

'বিপ্লবের পদচিহ্ন' ভূপেনবাবুর ঠিক জেল-জীবনের কাহিনী নয়, এটা একটা ইতিহাসের ক্রমবিকাশের কাহিনী। বাংলার রাজনীতিতে শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেন। বাংলার বিপ্লবী যুগের ঘটনার বিন্যাস ভূপেনবাবুর চেয়ে ভালো কেউ করতে পারবে কি না সন্দেহ। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল— বাংলার বিপ্লবী যুগের কাহিনীর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে ভূপেনবাবুর সমকক্ষ কেউ নেই— একথা তাঁর সহকর্মীরা অনেকেই জানেন ও মানেন।

এই পুস্তকে জেলখানার কথা এবং কারা-জীবনের কথা অবশ্যই আছে। কিন্তু সেটা হল উপলক্ষ। কি চিন্তাধারা নিয়ে আমরা বিপ্লব-আন্দোলনে আসি? ইংরেজকে তাড়াতে হবে— এই অন্ধ আবেগ ভিন্ন আর কিছুই প্রায় প্রথমে ছিল না। তারপর কি হবে? হয়তো বরোদার মহারাজাকে ডেকে ভারতের সিংহাসন দেব; হয়তো আনন্দমঠের মতো সন্ন্যাসী সমাজের হাতে শাসনভার দেওয়া হবে; হয়তো আকবরের মতো সর্বধর্মসমন্বয়কারী একটি সম্রাট খুঁজে বের করতে হবে; অথবা হয়তো প্রতাপ বা শিবাজীর বংশধরদের মধ্য থেকে কাউকে বসাব। এমনি নানা উদ্ভট ধারণা মনে আসত। কিন্তু তা নিয়ে আমরা বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম না;— আমরা ব্যস্ত ছিলাম ইংরেজকে তাড়াবার প্রয়াস করব এবং সম্ভব হলে সেই প্রয়াসে আত্মবলিদান করব।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তার একটা সুযোগ এল। পড়া-শুনা ছেড়ে উত্তেজিত হয়ে দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে ছুটেছি। কোন্ উন্মাদনায়? সশস্ত্র বিদ্রোহের সুযোগ আসছে; তাতে আমরা মরতে পারব— এই ছিল আমাদের আশা। জার্মানীর দেওয়া কয়েক হাজার বন্দুক বা অন্য কিছু অস্ত্র-শস্ত্র দিয়েই আমরা দেশকে স্বাধীন করতে পারব— সে আশা ছিল না। কিন্তু জাতির অন্তরে আমরা একটা দাগ রেখে যাব— তার সুপ্ত চেতনাকে

জাগিয়ে দিয়ে যাব— এই ছিল আমাদের আকাঙ্ক্ষা। আমাদের সে প্রয়াস ব্যর্থ হল; আত্মাহুতির সুযোগ আমরা পেলাম না। একে একে ধরা পড়লাম; জেলে আবদ্ধ হলাম। ব্রিটিশ-রাজ্যের জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে তার শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছি— তাকে ঘা দেবার জন্য। এত বড় অপরাধ ইংরেজ যে সহজে ক্ষমা করবে না— তা আমরা জানতাম। কিন্তু খালাস একদিন হবো— এটা বুঝতে পারলাম। তখন থেকে শুরু হল আত্ম-বিশ্লেষণ।

কিসের আবেগে আমরা ঘর ছেড়ে, মাতা-পিতাকে ত্যাগ ক'রে বের হয়েছি? কি আমরা চাই? কি পথে তা পাওয়া সম্ভব বা সহজ? এ সব প্রশ্ন আমাদের মনে আসতে লাগল। স্কুল-কলেজে যা পড়েছি, তা পরীক্ষা-পাশের পড়া; দলের আওতায় যা পড়েছি, তা প্রধানত চরিত্র-গঠন ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার জন্য। জেলে বসে রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান পড়ার সুযোগ পেলাম। এর মধ্যে এল রুশ বিপ্লব। লেনিন ও ট্রটস্কী আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করল। রাজনৈতিক বই পাওয়ার যথেষ্ট অন্তরায় ছিল; কিন্তু কোনো রকমে তা যোগাড় করতাম। ট্রটস্কীর একখানা বই বের হল— Russian Revolution from October to Brestlitovsk (Published by Allen & Unwin)। বই-এর তালিকা সরকার থেকে পাশ করিয়ে আনতে হবে। এক গাদা বই-এর নামের সঙ্গে লিখে দিলাম— 'From October to Brestlitovsk'— Allen & Unwin। Censor-এর হাত থেকে ঐ বই পাশ হয়ে গেল। Censor-এর বিদ্যায় কুলোয় নি— October-এর তাৎপর্য কি এবং Brestlitovsk কি। হয়তো বই-এর পরিচয়ে লেখা ছিল উপন্যাস বা এমনি কিছু। যাক— ২/১ বছরের মধ্যেই জেলের দেওয়াল ভেদ করেও রুশ বিপ্লবের কথা আমাদের কানে এল।

এর মধ্যে শুরু হল গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ। গান্ধীজী যখন তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনীতি সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, তখন বের হল রৌলাট কমিটির (Rowlatt Committee) রিপোর্ট। এই কমিটি গঠিত হয়েছিল বিপ্লবী ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা বাতলাবার জন্য। এই কমিটির প্রধান সুপারিশ সভ্য-সমাজের অনুপযুক্ত বলে গান্ধীজীর ধর্ম-বুদ্ধিতে আঘাত লাগল। তিনি এর প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। মৌলিক দিক থেকে দেখলে গান্ধীজীর এই আন্দোলন আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনের অনুস্মৃতি মাত্র। আমাদের চিন্তা জগতে আর একটি পর্বের উদয় হল। আমাদের রাজনীতির

ক্রমবিকাশ এখান থেকে শুরু হয়। আমরা সিদ্ধান্ত করলাম, খালাস হয়ে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেব।

পন্থা-গত এত বড় একটা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত একদিনে বা হুজুগের মুখে হয়নি; হয়েছে অনেক আলোচনা, অনেক তর্ক-বিতর্ক এবং অনেক অন্তর্দ্বন্দ্বের পর। সহিংস বিপ্লবীর আত্ম-শ্লাঘা অহিংস পন্থা অবলম্বনে অনেকের পক্ষে অন্তরায় হয়েছিল। তখন আমরা গান্ধীর পন্থা-ই (technique) গ্রহণ করেছিলাম— কিন্তু তাঁর মত (ideology) গ্রহণ করিনি। কি ক'রে আস্তে আস্তে আমরা গান্ধীর মতবাদও গ্রহণ করলাম— সে এক বিস্ময়কর কাহিনী। অথচ মার্কস্ ও তাঁর মতের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা কখনও লোপ পায়নি। এই যে আত্ম-বিশ্লেষণ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, ভূপেনবাবু তার ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর নানা লেখার ভিতর দিয়ে। এই পুস্তকের প্রধান বিশেষত্বই হল গোপন ষড়যন্ত্র থেকে গণ আন্দোলনের পথ, বিদ্রোহ থেকে বিপ্লবের পথ, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বরাজ গড়ে তোলার পথ গ্রহণের ক্রমবিকাশকে ব্যাখ্যা করা। এই হল এই গ্রন্থের দার্শনিক তত্ত্ব— এই গ্রন্থের মধ্যমণি।

তা ছাড়া, এই গ্রন্থের একটা সাহিত্যিক দিকও আছে। বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে ভূপেনবাবুর সাহিত্যিক হিসাবে একটা খ্যাতি আছে। ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তাঁর লিখবার ক্ষমতা কতকটা অসাধারণ। ১৯৩৯ হতে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ইংরাজী সাপ্তাহিক 'Forward' তাঁর সম্পাদকতায় বের হতো। বিদ্বজন মহলে ভারতের সর্বত্র Forward তখন সমাদৃত হতো। অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন—বিপ্লবী কর্মী ভূপেন দত্ত আবার লিখতে শিখলেন কবে! দু'চারজন এমন সন্দেহও প্রকাশ করেছেন— ভূপেনবাবু কেবল নামে সম্পাদক— প্রকৃত পক্ষে ঐসব প্রবন্ধ লেখে অন্য কেউ। তাঁর বাংলা লেখাও তেমনি বিস্ময় উৎপাদন করেছে। তাঁর লেখার বিশেষত্ব যে কেবল লেখার ভঙ্গী বা style-এর জন্য, তা নয়; লেখার বিষয়বস্তুও বা contents-ও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ও ইতিহাসে তাঁর অধিকার ও পাণ্ডিত্য তাঁর লেখায় প্রকাশ পায়। ১৯৪৬ সালে তাঁর লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ Forward-এ প্রকাশিত হয়। তখনও তিনি জেলে আবদ্ধ; সেখান থেকে গোপনে প্রেরিত প্রবন্ধ স্বভাবতই বেনামীতে বের করতে হয়েছিল। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি ঐ সব প্রবন্ধের জন্য Forward-এর তৎকালীন সম্পাদককে সন্তোষ-জ্ঞাপন ক'রে চিঠি দিয়েছেন। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও সন্তোষ প্রকাশ

করেছিলেন। 'Indian Revolution and the Constructive Programme' নামে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভূমিকা-সহ ঐসব প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

'বিপ্লবের পদচিহ্ন' ভূপেনবাবুর সাহিত্যিক ক্ষমতারও পরিচায়ক। জেলের কঠোর জীবনের কাহিনীকে সরস ক'রে লেখা, জেল-জীবনে বন্দীদের মনের উপর যে চাপ পড়ে এবং তার ফলে যে একটা অস্বাভাবিক মনোভাব ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়— তাকে সহৃদয়তার সঙ্গে মানবিকতার স্পর্শ (human touch) দিয়ে প্রকাশ করা খুব সহজ নয়। বহু জেল-সহচরের নাম এই বইতে আছে; তাঁদের মধ্যে প্রায় সবাই এখনও জীবিত। জেলে একটা অস্বাভাবিক মনোভাব ও আবেষ্টন নিয়ে বাস করতে হয়; কাজেই প্রায় প্রত্যেক রাজবন্দীই আচরণে সময় সময় একটা অস্বাভাবিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তা নিয়ে বা তার জন্য কাউকে বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ না করেও, তাকে হাস্য-রসের উপযোগী করা যায়। ভূপেনবাবু এই পুস্তকে তা ক'রে দেখিয়েছেন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের ও দলের লোক নিয়ে জেলে বাস করতে হয়েছে। এই পার্থক্য যে কেবল সাধারণ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কেই সীমাবদ্ধ থাকত, তা নয়; অনেক সময় গ্রাম্য দলাদলির পর্যায়েও তা নেমে যেত। একদল যুবক— যাদের কল্পনা-শক্তি প্রবল, যাদের প্রেরণা উদগ্র, যাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ প্রতিনিয়ত ব্যাহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, যাদের সেবা করার প্রবৃত্তি প্রকাশের কোনো রন্ধ্র না পেয়ে আত্ম-সেবার ও স্বার্থ-সাধনের পঙ্কিলতায় ডুবে যায়— তাদের জীবনের এই করুণ দৃশ্যকে দরদ দিয়ে দেখা ও ব্যাখ্যা করা, ভূপেনবাবুর মতো দরদী লোকের পক্ষেই সম্ভব।

তাই নানাদিক থেকেই এই পুস্তকের একটা বিশেষত্ব আছে। কয়েকজন শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক বন্ধু মুখে মুখে ভূপেনবাবুর জেল-জীবনের কাহিনী প্রথমটা শোনেন। কেউ বা প্রথম ধরা পড়ার দিনের তাঁর মনের পরিচয় পেয়ে, কেউ বা ১৯১৭ সালের অনশনব্রত কি ভাবে আরম্ভ হয়, কি মনোভাব নিয়ে তিনি ৭৮ দিন উপবাসে কাটান, তা শুনে, দেশের যুবক সাধারণের কাজে লাগবে বলে, সেই সব কথা লিখে প্রকাশ করতে তাঁকে পীড়াপীড়ি করেন। তারপর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় বহু গুণগ্রাহী ব্যক্তি লেখার সুখ্যাতি করেছেন; কার্যত, এঁদের অনুরোধেই ভূপেনবাবু এতদূর পর্যন্ত লিখেছেন। প্রথমে দু'একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন; ধারাবাহিক হিসাবে চালাবার ইচ্ছা ছিল

না। বিভিন্ন লোকের অনুরোধেই তিনি এতগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন। ভূপেনবাবুর লেখার ক্ষমতায় ও বিষয়বস্তুতে আকৃষ্ট হয়েই অনেকে এই অনুরোধ তাঁকে করেছিলেন। তা না হলে ভূপেনবাবুর মতো আত্ম-বিলোপী বিপ্লবী আত্ম-কাহিনী লিখতে বলতেন না।

বাংলার বিপ্লবী সাধনায় বহু লোক বহু ত্যাগ স্বীকার করেছে; বহু লোক বহু লাঞ্ছনা বরণ করেছে; বহু লোকের জীবন জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে গিয়েছে। হয়তো পৃথিবীর ইতিহাসেই এর তুলনা বিরল। আর কেউ না হোক— বাঙালী যেন শ্রদ্ধার সঙ্গে সে সব কাহিনী স্মরণ করে। অনেকে বেদনার ভারে ভেঙে পড়েছেন, অনেকের অন্তর দুঃখের দাহনে অকালে শুকিয়ে গিয়েছে; অনেকে ব্যর্থতার ব্যথায় নিরাশাবাদী (cynic) এবং মানুষের উপর বিশ্বাসহীন (misanthrop) হয়েছেন। আজ তাঁরা ভাঙা ও পরিত্যক্ত মন্দিরের বিগ্রহের মতো লোকের খেলার দ্রব্যে পরিণত হয়েছেন।

দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভূপেনবাবুর জীবনে যা পড়েছে, তা অনেকেই জানে না। কিন্তু ভূপেনবাবু এখনো ভেঙে পড়েন নি, এখনও তিনি cynic বা misanthrop হননি। আজও তাঁর সঙ্গ মানুষের মনকে নাড়া দিতে পারে; আজও রাজনৈতিক আলোচনায় যুবকদের মন ও চিন্তাকে তিনি স্পর্শ করতে পারেন, আজও তাঁর কাছে যুবকদের আহ্বান আসে বিচার-মূলক (intellectual) রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনার জন্য।

ভূপেনবাবু তত্ত্বের দিক দিয়ে ইতিহাসের এবং মানুষের অভিব্যক্তিতে এবং তারই পন্থা হিসাবে বিপ্লবেরও অভিব্যক্তিতে বিশ্বাসী। এই কারণে অন্য অনেকে যেখানে ভেঙে পড়েছেন, ভূপেনবাবু আজও সেখানে 'আপন মর্মবাণী' শুনছেন। অতীতের কাহিনীর ভিতর দিয়ে সেই মর্মবাণীই এখানে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে।

১৯৫৩। শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

গ্রন্থকারের নিবেদন

১৯৪৭ সালের আগেও কিছু কিছু এবং পরে আরও বেশি ক'রে শোনা গেছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের দান কিছু নেই, বরং তাঁরা অকাজই বেশি করেছেন। বিপ্লবীদের এ বিষয়ে বলার কিছু থাকতে পারে এবং বলা উচিত— অনেক সময়েই মনে হয়েছে। কিন্তু সে অনেক কথা। প্রায় ৪০ বছরের জীবনে যা কিছু করেছি এবং তা করার ভিতর দিয়ে ক্রমে যা বুঝেছি তার ছবি শুধু দু'পাঁচটি প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা চলে না। অন্তত আমার সাধ্যে তা কুলোবে না। আমাকে তা বলতে হলে বলতে হবে এতগুলি বছরের সমগ্র অভিজ্ঞতার কাহিনীর ভিতর দিয়ে।

ইতিমধ্যে স্নেহাস্পদ সহকর্মী কমলা দাশগুপ্ত, তখন 'মন্দিরা' মাসিক পত্রিকা চালান, লেখার জন্য বলেন। তাঁর দাবি আমার কাছে অনুপেক্ষণীয়। গোড়াতে রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে প্রবন্ধ লিখতাম। কিন্তু তখন আমি পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য। গণপরিষদ বা পার্লিয়ামেণ্ট নামেই মাত্র বসত। তার কাজ সামান্য। কিন্তু ওর সভ্য হওয়ার ফলে আমি যাঁদের প্রতিনিধি, অর্থাৎ, তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়— তাঁদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং তৎ-দরুন মানসিক অবস্থা এমন ছিল যে সবসময় তাঁদের ভিতর ঘোরার প্রয়োজন অনুভব করতাম। ঘোরার সুবিধা তেমন ছিল না— বিশেষত পল্লীগ্রামে, যেখানে ঘোরার প্রয়োজন ছিল বেশি; কারণ, সেখানে পাকিস্তানী পুলিশ আমাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার সাহস না পেলেও যাঁদের কাছে যেতাম তাঁদের জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলত। তবু যেতেই হতো। অন্তত শহরে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতে হতো, তাঁদের উপর নির্যাতন-নিপীড়নের খবর নিতে হতো এবং সাহায্য করার বিফল প্রয়াস করতে হতো।

এখন জীবনে তত্ত্বকথাও বেশি ভাববার বা লেখবার সুযোগ থাকত না। বিশেষত রাজনীতি একটি জীবন্ত, নিত্যচলমান বস্তু। এক আবহাওয়ায় বাস

ক'রে আর এক আবহাওয়ার কথা বলা দুঃসাধ্য মনে হল। তাই এক সহজ পন্থা ধরি। বন্ধুবান্ধবের সাথে গল্পগুজবে, অনেক সময় হাসিঠাট্টার ভিতরও জেল-জীবনের কথা বলতে হতো, এখনও বলি। মন্দিরা-সম্পাদিকার অনুরোধ পূরণে এইভাবে তাঁকে ফাঁকি দিতে শুরু করি—ধারাবাহিকভাবে জেল-জীবনের কাহিনী অন্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে লিখতে থাকি।

ওতে আমার বিপ্লবীজীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। কিন্তু কোনো কোনো বন্ধুর মতে ও থেকে একটা পরিচয় পাওয়া যায়, যে শিক্ষা-সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে সেযুগে আমরা গড়ে উঠতাম তার। তাতে অন্তত আমাদের জীবনধারা এবং তার চরিত্রের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। সেইসব লেখাগুলিকে এইসব বন্ধুরা বইয়ের আকারে বের করার উপদেশ দিলেন। সেকাজে উৎসাহী হলেন বন্ধু শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ। এবং 'বিপ্লবের পদচিহ্ন' নামটাও তিনিই দিলেন।

'পদচিহ্ন' মানে বিপ্লব যেপথ ধরে এগিয়েছে তার আভাসই মাত্র। লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছাবার সমস্ত পথের ছক নয়। যে-সম্বলে চলেছি, যে-সম্বল নিয়ে সেপথে চলার হিম্মৎ জুটেছিল তারই সামান্য পরিচয় এতে আছে। আবার পথচলা যখন ফুরিয়ে আসার দিকে, সম্বলও যখন ক্ষীণ হতে শুরু করেছে, তখন কিভাবে আমাদের চির-অভ্যস্ত সাধারণ-জীবনধারায় ধীরে ধীরে নেমে এসেছি তারও কিঞ্চিৎ পরিচয় এতে আছে। এইভাবে দেখতে গেলে 'বিপ্লবের পদচিহ্ন' যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই একে শেষ করা বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছে— যদিও আমার বছর বাইশেকের জেল জীবনের ভিতর এখানে যা আছে তা দশ বছরেরও কম সময়ের কথা। স্বচ্ছ জলের কপোতাক্ষ যেখানে ঘোলাটে জলের ইছামতীতে মিশেছে, দুই ধারারই পরিচয় সেখানে কিছুদূর পর্যন্ত পাশাপাশি রয়েছে। সেই পুরোনো ধারার আত্মবিলুপ্তির আক্ষেপ আর বাড়াতে চাইনি। তাই পদচিহ্ন যেখানে শেষ হবার সেখানেই তাকে শেষ করেছি।

'বিপ্লবের পদচিহ্ন' পড়ে অনেক বন্ধু বলেছেন, শুধু জেল-জীবনের কাহিনী পড়ে তৃপ্তি নেই। অতীতের অনেক কাহিনীই তো গোপনতার আড়ালে রয়ে গেছে, সেসব বলুন। পাকিস্তানে বসে সেসব লেখাও চলত না, আর লিখলেও পাঠাতে অথবা সঙ্গে নিয়ে আসতে পারব কিনা সেবিষয়ে প্রচুর সন্দেহ ছিল। তখন ওদেশে সামরিক শাসনের যুগ। সেযুগের চারটি বছর প্রায় গৃহবন্দী অবস্থাতেই কাটল। ঘোরাফেরার প্রতিবন্ধক যা ছিল তা আগেই বলেছি। ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহরগুলিতে মাঝে মাঝে যেতাম। কারও কোনো কাজে

আসতাম না। বন্ধুরা উপদেশ দিলেন, আর ওখানে থেকে কিছু করতে পারবে না, এদিকে চলে এস। ইতিমধ্যে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি দুই-ই ক্ষীণ হয়ে আসছে দেখে বন্ধুদের উপদেশ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে হল। পৈতৃক ঘরজমি সামান্য যা ছিল একটি সাবরেজিস্ট্রার ভদ্রলোকের গোপন সহায়তায় সেগুলো চট্টগ্রামের প্রবর্তক সংঘকে লিখে দিলাম। তারপর বয়ঃকনিষ্ঠ বন্ধু উৎফুল্ল রায়ের বুদ্ধি ও ব্যবস্থাপনায় একরকম পালিয়ে আসা সম্ভব হল— যদিও এসেছিলাম দেশ-ত্যাগের সার্টিফিকেট নিয়েই। প্রবর্তকের কর্তৃপক্ষীয় পাঁচটি বন্ধুকেই বাংলাদেশের বিগত মুক্তিসংগ্রামের শুরুতেই পাকিস্তানী মিলিটারি গুলি ক'রে মারল। নিরুপায়ভাবে এখানে বসে সব সংবাদ শুনলাম। এঁদের ভিতর সংঘের সম্পাদক অতুলনীয় চরিত্রের বীরেন্দ্রলাল চৌধুরীকে লোকে বলত পাকিস্তানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক। আমার ঘরবাড়ি সংঘ থেকে জনশিক্ষার কাজে লাগিয়েছিলেন, তা-ও প্রথম লুট ক'রে পরে পুড়িয়ে দিল। তবু স্থানীয় পরিচালকরা আবার তার সদ্ব্যবহার করছেন।

ইতিমধ্যে চক্ষুকর্ণের দৈন্য যা বেড়েছে তা নিয়ে লেখালিখির কাজ সংক্ষিপ্ত করতে হল। হঠাৎ একটা সুযোগ জুটে গেল। দিল্লীর নেহরু মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ আমার জীবনকথা টেপ-রেকর্ড করতে চাইলেন। তাঁরা শুধু জীবনের ঘটনাই জানতে চান না আমার কাছে; আমাদের জীবনের প্রেরণার উৎস, আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, মনোবৃত্তির অভিব্যক্তি সবই আমার কণ্ঠস্বরে ধরে রাখতে আগ্রহী। এর ফলে, 'বিপ্লবের পদচিহ্নে' যেভাবে এই ধরনের কথাগুলো বলেছি, সেইভাবে সব কথা বলারই অবকাশ পেলাম। তাঁদের এই রেকর্ড যদি কেউ কোনোকালে তাঁদের অনুমতি নিয়ে কাজে লাগান তাহলে সব কথাই সাধারণের জন্য প্রকাশ পেতে পারে— এই আশাতে সব কথা সেখানে বলার চেষ্টা করছি।

প্রয়োজনবোধে এ সংস্করণে সামান্য কিছু কিছু বাদ দিয়েছি, তেমনি সামান্য কিছু বাড়িয়েছি। আর একটি কথাও এখানে বলা প্রয়োজন। লেখাগুলি প্রথম যখন 'মন্দিরা'য় অথবা পরে পুস্তকাকারে বের হয় তখনকার দিনের পাঠকদের কাছে যেসব ব্যক্তি কতকটা পরিচিত ছিলেন এবং দু'একটি প্রতিষ্ঠানও, কালক্রমে লোকের স্মৃতিতে সেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আর স্থান নেই। তাই এই সংস্করণে একটি পরিশিষ্ট জুড়ে দিয়ে কয়েকটি ব্যক্তির ও একটি প্রতিষ্ঠানের কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। পাকিস্তান থেকে ভারতে এসে যে কিছুদিন পড়তে পেরেছি সে সময় মাঝে মাঝে দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌সে

অনেক পুরোনো কর্মী সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য পাই। এখানে তারও সামান্য কিছু কাজে লাগিয়েছি। বইতে উল্লিখিত অন্য বহু সহকর্মী ও সহযোগী-দের পরিচয় নামের সঙ্গে সঙ্গেই দু-এক কথায় দিতে চেষ্টা করেছি।

এত বৎসর বাদে 'বিপ্লবের পদচিহ্নে'র দ্বিতীয় সংস্করণ বের করতে এগিয়ে আসার জন্য প্রকাশক ওরিয়েণ্ট লংম্যানের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই ভূমিকা শেষ করছি। এটা আমার কোনো ব্যক্তিগত কথা বলে আমি মনে করি না। যে আন্দোলনের এটা পদচিহ্ন সেই আন্দোলন মানবচরিত্রের একটা ছবি রেখে গেছে— যে ছবি সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে না, অথচ যে ছবি ভবিষ্যতের এক মহত্তর ভারতের মানুষের চরিত্রের উপাদান হতে পারে। সেই হিসাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রকাশকগণ এক বিশেষ জনকল্যাণের কাজেই হাত দিয়েছেন বলে আমার ধারণা। ইতি—

১লা জানুয়ারি, ১৯৭৩। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত



যতীন্দ্রনাথ (দেহাবসান)

প্রথম যেদিন ধরা পড়ি

ধরা তো কয়বারই পড়েছি। কিন্তু সেই প্রথমবারের কথাই বলছি।
জার্মানির দেওয়া অস্ত্র আর এসে পৌছাতে পারল না। আমেরিকা-প্রবাসী চেকোশ্লাভাক বিপ্লবীরা খবর দিয়ে দিল—সমস্ত ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রটা ধরা পড়ে গেল। বালেশ্বরের হলদিঘাটে যতীনদা নিহত হলেন। ও-পর্ব প্রায় শেষ হয়েই গেল।

আশা ছাড়লে আর যারই চলুক, বিপ্লবীর চলে না। 'দাদা'র মৃত্যুর পর সবাই প্রায় ভেঙে পড়েছেন—এই সেদিন যেমন গান্ধীজীর মৃত্যুর পর সারা দেশ ভেঙে পড়েছিল। যাদুগোপাল মুখার্জি তখনও চেষ্টা করছেন। পূর্ব বন্দোবস্ত মতো স্থলপথে চীনের ভিতর দিয়ে, শ্যামের ভিতর দিয়ে, আসামের সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র আনবার জন্য লোক গেছে, ধরা পড়েছে, অথবা যাবার বা ফিরবার পথে বা ফিরে এসে ধরা পড়েছে। বর্মায় কিছু অস্ত্র এসে পৌছেছিল। তা-ও একজন পাঞ্জাবী এঞ্জিনিয়ারের বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়ে গেল।

আর প্রায় আশা করবার কিছু রইল না। কলকাতায় বসন্ত চ্যাটার্জির হত্যা হল ৩০শে জুন, ১৯১৬ সাল। ঐদিন থেকে টেগার্ট সাহেবের তাণ্ডব শুরু হল—এতদিনের সঞ্চিত ক্রোধ একেবারে ফেটে পড়ল। আমরা এটার নাম দিয়েছিলাম 'জুলাই বিপ্লব'।

কলকাতায় এবং মফস্বলে কত যে লোক ধরা পড়তে লাগল, তার আর সংখ্যা নেই। আশ্রয়ের অভাবে কত রাজনৈতিক কর্মী রাস্তার পাশে অপরিচিত বাড়ির বা বাজারের রোয়াকে শুয়ে থাকেন। শেষরাতের দিকে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যায়। খানাতল্লাশি লেগেই আছে। রাস্তায় বের হলেই দু'চারটে বাড়ি চোখে পড়তো লালপাগড়িতে ঘেরা, প্রায়ই মেস-বাড়ি। ধরা-ধরিরও কোনো হিসাব-বিচার নেই।

নরেন শেঠের* বাড়ির বালিশ-তোশক ছিঁড়ে-ফুঁড়ে সমস্ত জিনিস লণ্ডভণ্ড ক'রে ১লা জুলাই ভোরে ছেলে-বুড়ো এগারোটি লোককে ধরে নিয়ে গেল।

সকালবেলায় যে বের হয়, সে যে ভাত খেতে দুপুর বেলায় ফিরবে এমন আশা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না। দালান্দা হাউজ ভরতি হয়ে গেল। সেখান থেকে পাঁচদিন, সাতদিন, দশদিনের জন্যে নিয়ে যায় কীড স্ট্রীট থানায় টেগার্ট সাহেবের নিজের হেফাজতে।

ঐ কয়দিন কাউকে দিনে রাতে বসতে বা শুতে দেবার নিয়ম ছিল না। পাশেই রুল হাতে পাহারা দেবার জন্যে পুলিশ মোতায়েন থাকত। রুল ব্যবহার না ক'রে কোনো পাহারাওয়ালা যদি কয়েক মিনিটের জন্যে মানুষ বা ভারতীয় হয়ে পড়ত তা হলে তার চাকরি যেত।

ও-কয়দিন স্নান করতে দেবারও হুকুম ছিল না। খেতে দেওয়া হতো দু' বেলায় দু' পয়সার মুড়ি-মুড়কি—মুড়কি কোথা থেকে ফরমায়েশ দিয়ে আনা হতো জানা নেই, কিন্তু মুখে দেওয়া যেত না, এমন তিতো; দু-পাঁচদিনের ক্ষুধাতেও তা কারও মুখে মিষ্টি হয়ে উঠত না, ফেলে রেখে দিত।

এর উপর কিছু মিষ্টিরও ব্যবস্থা ছিল। এবং তারই জন্যে কীড স্ট্রীটের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হতো। সেটা জুটত প্রায়ই রাতের বেলায়। মাঝে মাঝে টেগার্ট সাহেব নিজে এবং প্রায়শ বাঙালী অফিসাররা মদে চুর হয়ে আসত। মুখে ছুটত যেমন মদের দুর্গন্ধ, তেমনি ভাষার।

কিল, ঘুঁষি, চড়, লাথি, কেশাকর্ষণ, আঙুল মোচড়ানো, পেছন দিকে হাত-কড়ি লাগিয়ে পিঠের উপর রুলের ঘা এসব তো ছিল অতি সাধারণ ব্যবস্থা। নানাবিধ অসম্ভব কসরত করানো, পাঁচ-সাতদিনের ক্ষুৎপিপাসা-অনিদ্রাকাতর, অথবা তিন-চার ডিগ্রি জ্বরে আক্রান্ত বন্দীকে নিয়ে ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ঠেলে পনেরো মিনিট আধঘণ্টা ধরে টেনিস খেলা, পুরুষাঙ্গ রশি বেঁধে টানা বা রুল দিয়ে থেঁতলানো, মলদ্বারে রুল ঢোকাবার চেষ্টা, 'কমোড্ প্যান থেকে' মল-মূত্র মাথায় মুখে সর্বাঙ্গে ঢেলে দেওয়া এবং তারপর দিনের পর দিন জলের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখা—ইত্যাদি যত রকমের ধর্ষকাম (sadist) জুলুমবাজির কল্পনা করা চলে বা কল্পনা করাও চলে না, তেমনি অনেক কিছু অভিনয় হতো, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সারারাত ধরে, অথবা বন্দী জ্ঞান না হারানো পর্যন্ত।

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ফলে কেউ কেউ ভেঙে পড়ে স্বীকারোক্তি করত। কিন্তু যত লোক স্বীকারোক্তি করে, তার চেয়ে অনেক বেশি করে বলে রটে যায়। রটানোটাও স্নায়ুর উপর কাজ করানোর উদ্দেশ্যে। সে কথা আজ বুঝি। তখন অবাক হয়ে ভাবতাম, যে-সব লোকের কথা রটছে, তারা কি ক'রে স্বীকারোক্তি করতে পারে—তা সে জুলুম যতো প্রচণ্ডই হোক।

চারদিকে একটা হতাশা আর থমথমে ভাব। ভয়ে সব জড়সড়ো। এদেশে অমন ব্যাপক ধরপাকড়, তার সঙ্গে অত জুলুমবাজি—সে-ই তো প্রথম।

এই সব স্বীকারোক্তির ফলে পাছে আমিও ধরা পড়ে যাই—সেই ভয়ে চন্দননগর থেকে অতুল ঘোষ বলে পাঠালেন কলেজ ছেড়ে সরে পড়তে। দল গঠন ও পরিচালনার কাজে অতুলদা ছিলেন যতীনদার দক্ষিণ হস্ত। তখন তিনি পলাতক—ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রে যে কয়জনের নামে মোটা মোটা পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে, তাঁদের ভিতর একজন। কলকাতায় আসা-যাওয়া তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। সতীশ চক্রবর্তী আমায় জানালেন অতুলদার নির্দেশের কথা। সতীশদা তখনও ঘোরা-ফেরা করেন অতি সাবধানে। আর পলাতকের পক্ষে সাবধানতা অবলম্বনের কায়দা-কানুনে আমাদের ভিতর যাদুদার পরেই ছিলেন সতীশদা।

কলেজ ছেড়ে দিয়ে পলাতক হওয়া স্থির করলাম। কিন্তু বাধা ছিল। অতুলদার সঙ্গে চন্দননগরে দেখা ক'রে সব বললাম।

সেই বছরেই একটা মেস করেছিলাম। আমার সঙ্গে বাড়ির ভাড়াটে ছিলেন ফরিদপুরের অমৃত গুপ্ত*। মাখনলাল সেনের প্রভাবে তখন তিনি ধর্মজীবনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন, রাজনীতি প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। তবু সেবারে ধরা পড়া থেকে বাঁচেননি। পরে যক্ষ্মারোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

মেসটাকে প্রায় আমাদের দলের লোক দিয়েই ভরে ফেলেছিলাম। মেঘনাদ সাহা, শিশির মিত্র, শৈলেন ঘোষ, যতীন শেঠ, জ্ঞান মুখার্জি, জ্ঞান ঘোষ প্রভৃতি যাঁরা তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ গড়ে তুলতে স্যার আশুতোষ মুখার্জিকে সাহায্য করছিলেন, তাঁদের আটজন এই মেসে 'সীট' নিয়েছিলেন। এঁরা প্রায় সবাই যতীনদা এবং শশীদার (শ্রমজীবী শিক্ষার প্রবর্তক, ২৪ পরগনা তেঘরার শশিভূষণ রায়চৌধুরী) সঙ্গে মিশতেন, কেউ কেউ ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছিলেন, যতীনদার পূর্ণোদ্যম কার্যকলাপের সময় ১১০নং কলেজ স্ট্রীটে নীলরতন ধরের মেসে তাঁর যে আড্ডা ছিল, সেখানে,

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

হিন্দু হোস্টেলে এবং আরও অন্যত্র ঘনিষ্ঠভাবে যাওয়া-আসা করতেন, কেউ কেউ বা ঐ সব জায়গাতেই থাকতেন।

ইতিমধ্যে শৈলেন ঘোষ আমেরিকায় যাবার পাসপোর্ট পেয়েছেন। পাসপোর্ট পাবার পরে তিনি একবার দৌলতপুর, নড়াল ইত্যাদি অঞ্চলে বেড়াতে যান। এসব অঞ্চলে তখন যতীনদার সহকর্মীরা বেশ কর্মচঞ্চল। শৈলেন ঘোষের পাসপোর্ট বাতিল হয়ে গেল। তারপর তাঁর আত্মীয়-পরিচয়ে নলিনী মজুমদার (তখন আই. বি-র সাব-ইনস্পেক্টার) আমার মেসে একদিন তাঁকে খুঁজতে এলেন। লক্ষণ ভালো নয় বুঝে যতীন শেঠের কাছে ওঁদের আটজনের সীট ভাড়ার টাকাটা ফেরত দিয়ে এলাম—বলে এলাম, ও-মেসে এখন এঁদের যাওয়া বুদ্ধির কাজ হবে না। মেসের সীট ভরতি করা, বাড়ি ভাড়ার টাকা আদায় ক'রে বাড়িওয়ালার দেনা মেটানো ইত্যাদি দায় তখন ঘাড়ে।

নিজে তখন আর নিজের মেসে থাকি না। ফরিদপুরের ইন্দু সরকার* এক মেস করেন, সেখানে হেমেনদার* (বর্তমানে ডাক্তার, স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্-এর ডিরেক্টর) সঙ্গে রাত কাটাই। দিনের বেলায় দু' একবার গিয়ে মেসের দায় মেটাতে চেষ্টা করি। যা নিজে না পারি, আশুদার (টাকি সৈদপুরের আশুতোষ রায়চৌধুরী) ঘাড়ে চাপাই।

ইতিমধ্যে সতীশদাকে একদিন রাত্রে শালখের এক বাড়িতে ঘিরে ফেললো। তিনি গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পুকুর-ধার দিয়ে ছুটতে গিয়ে অন্ধকারে দেখতে পাননি, ঘোড়ার পিঠ থেকে কোনো ইউরোপিয়ান পুলিশ মারলে তাঁর বুকে এক লাথি। হাতের রিভলবার ছিটকে পড়ে গেল, নিজেও পড়ে গিয়ে ভাবলেন, ধরাই পড়ে গেলেন—পকেটে ছিল পটাসিয়াম সায়ানাইড, তাই খেয়ে ফেললেন। কিন্তু পালাতে পেরেছিলেন। ভাগ্যে সায়ানাইডটা গুঁড়ো (oxidized) হয়ে গিয়েছিল। জীবনে বেঁচে গেলেন, কিন্তু চমৎকার স্বাস্থ্যটি সারাজীবনের মতো হারালেন।

এই ঘটনাকে উপলক্ষ ক'রে পরদিন মেহেরপুরের রাজেন পালকে ধরল সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে। রাজেন থাকতেন আমার মেসে, তাঁর সীট তল্লাশি হল। দু' একদিনের মধ্যেই কুমিল্লার গ্রেফতারী পরোয়ানায় অশ্বিনী ভট্টাচার্য ধরা পড়লেন আমার মেসে। প্রথম শৈলেন ঘোষ, তারপর রাজেন পাল, অশ্বিনী ভট্টাচার্য—পুলিশ বুঝল, মেসটি একটি আড্ডা। দৈনন্দিন দৌরাত্ম্য শুরু হল। আজ একে

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ধরে, কাল ওর জবানবন্দি নেয়, পরশু ওর সীট তল্লাশি করে। আমার খোঁজ শুরু হল। আমি ও-মুখো হওয়া ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তখনও আধা-পলাতক।

বিপদে পড়লাম অন্যভাবে। কুন্তলও (মনোজ বসুর 'ভুলি নাই' উপন্যাসের নায়ক কুন্তল—সরকার নয়—চক্রবর্তী) প্রায় এই সময়েই পলাতক হলেন। অতুলদা তাঁর জন্যে চন্দননগরে একটা মাস্টারি যোগাড় করেছেন—একখানা অন্য নামের সার্টিফিকেট চাই। আমায় বললেন কলেজের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে।

কলেজে অধ্যাপকদের প্রিয়পাত্র ছিলাম। সুভাষ তখন ওটেন-পর্ব শেষ ক'রে বেরিয়ে পড়েছেন। ডাঃ আদিত্য মুখার্জি রোল ডাকতে ডাকতে একদিন বললেন, Master Dutta is also giving us the slip.।

কিন্তু প্রেসিডেন্সিতে পড়তাম শুধু অনার্স ক্লাসে। আমাকে ট্রান্সফার সার্টি-ফিকেট নিতে হবে সংস্কৃত কলেজ থেকে। ডাঃ মহেন্দ্র সরকার বিশেষ স্নেহ করতেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কেন সার্টিফিকেট নেবে?

অতখানি স্নেহ যিনি করেন তাঁর কাছে মিথ্যা বলতে আটকায়। কিন্তু জীবন তখন অন্য সত্যে ভরপুর, আপ্লুত—বলি, বাড়িতে বাবার অসুখ, তাঁর কাছে থাকতে হবে।

বলেই কিন্তু তাঁর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে ফেলি। তার পরের পরীক্ষা প্রিন্সিপালের কাছে। প্রিন্সিপাল তখন ডঃ সতীশ বিদ্যাভূষণ। তিনি বললেন, যতদিন তোমার বাবার অসুখ থাকবে, ততদিন তুমি তাঁর কাছে থাক, সার্টি-ফিকেট তোমায় দেব না।

আমিও নাছোড়বান্দা। দু' তিনদিন ঘুরি। এদিকে আমাকে ধরবার মতো জানা ঠিকানা পুলিশের কাছে তখন শুধু ঐ কলেজেরই। সুতরাং সন্তর্পণে যাই আসি। অবশেষে সার্টিফিকেট নিয়েই বেরিয়ে পড়ি।

তখন থেকে প্রায়ই আমি চন্দননগরে—কখনও কুন্তলের বাড়িতে, কখনও অতুলদার বাড়িতে, কখনও সুরেশ দাশের বাড়িতে, কখনও খুলনার সুরেন কুশারি একখানা বাড়ি নিয়েছিলেন, সেখানে। মাঝে মাঝেই বাড়ি বদল করার প্রয়োজন হতো। নিজেও একখানা বাড়ি নিয়েছিলাম। কলকাতাতেও পর পর কয়েকখানা বাড়ি নেওয়া হয়েছিল।

পূর্ণদা ও বাদল এই সময় এইসব আশ্রয়ের বাড়ি যোগাড় করতে ও অন্য ভাবে একান্ত দরদ দিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন। পূর্ণদা মানে অমলুকের পূর্ণ

সেন। ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমার মামলায় ধরা পড়েন, কিন্তু ছাড়া পান। পরে বহু বৎসর স্টেট্‌সম্যান কাগজের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। বাদলের ভালো নাম সত্যব্রত দাশগুপ্ত। বগুড়ার কর্মী। ডঃ জে. এম. দাশগুপ্তের ভাই। এঁদের আর এক ভাই মৃন্ময় এসময়ে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনের বন্দী।

পলাতক বা অর্ধ-পলাতক আমাদের দৈনন্দিন অর্থের প্রয়োজন কম নয়। অনেকে সাধ্যমতো পাঁচ-দশ টাকা ক'রে দিতেন, বা যা পারতেন সংগ্রহ ক'রে দিতেন। এ-কাজে একটা সত্যিকার আন্তরিকতা ফুটে উঠত যাঁদের ব্যবহারে, তাঁদের ভিতর আর ছিলেন শ্রীরামপুরের ডাক্তার আশুতোষ দাশ, বঙ্গবাসী কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক লাড্‌লি মোহন মিত্র, আর বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা। এঁরা অবশ্য সবাই ছিলেন আমাদের দলের লোক।

আমরা কয়েকজন তখন পলাতক বটে, কিন্তু ঘুরে ফিরে বেড়াই—আমি, কুন্তল চক্রবর্তী, চারু ঘোষ, সুরেন কুশারি, জীবন চ্যাটার্জি, সুরেশ দাশ। তখনকার মতো কাজ আমাদের প্রায় ফুরিয়ে গেছে—বিদেশ থেকে অস্ত্রপাতি আসবার আশা আর নেই, ধরপাকড়ে কলকাতায় এবং জেলায় জেলায় দলবলও ভেঙে পড়েছে। বলতে গেলে, আমাদের কাজ হয়ে পড়েছে প্রধান প্রধান পলাতক কয়েকজনকে রক্ষা করা—এঁদের মধ্যে আছেন তখন যাদুগোপাল মুখার্জি, অতুল ঘোষ, অমরেন্দ্র চ্যাটার্জি, সতীশ চক্রবর্তী, নলিনী কর, মন্মথ বিশ্বাস (লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসি যান বসন্ত বিশ্বাস, তাঁর ভাই) ও পাঁচুগোপাল ব্যানার্জি। এঁদের বাঁচিয়ে রাখা তখন বিপ্লবী দলের মর্যাদার প্রশ্নে দাঁড়িয়ে গেছে। পুলিশও এঁদের না ধরতে পারলে আর সোয়াস্তি পাচ্ছে না।

কলকাতায় ক্রমাগত তাড়া খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রায় একমাত্র আশ্রয়স্থল দাঁড়িয়েছে তিলজলা রেলওয়ে কেবিনের দেবেন ঘোষের* বাড়ি। ইনি সেই বিখ্যাত সিন্ধুবালার স্বামী—যে সিন্ধুবালার নাম পেয়ে পুলিশ বাঁকুড়া জেলা থেকে দুই সিন্ধুবালাকে ধরে এনেছিল, তার ফলে তখন খুব হৈ হৈ হয়।

১৯১৪-১৫ সালে জার্মানির সাহায্য নিয়ে যতীনদার নেতৃত্বে বৈপ্লবিক উত্থানের উদ্যোগ-আয়োজন হয়। তার আগে অতুলদার চেষ্টা ছিল সকল দল একত্র করার। ১৯১০ সাল থেকে তিনি ঢাকা অনুশীলন দলের অনেক পলাতককে নিজ বাড়িতে, অনেককে ভগ্নীপতি, অঙ্কশাস্ত্রের খ্যাতনামা অধ্যাপক কে. পি. বাসের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন। সেই সূত্রে তিনি এসময় এই দলের নেতা

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ) ও প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে যতীনদার সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। আলোচনার পর তাঁরা বিপ্লবায়োজনে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। শুনে দলের অন্যতম নেতা নগেন দত্ত (গিরিজা বাবু) ও কাশীর শচীন সান্যাল (পূর্বে ইনি যাদুদা, অতুলদার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন) দল ছেড়ে দেন; আর অতুলদার কাছ থেকে সাংকেতিক পরিচয় নিয়ে উত্তর ভারতে রাসবিহারী বোসের সঙ্গে কাজ করতে থাকেন।

তারপর যখন বৈপ্লবিক উত্থানের, এমন কি অস্ত্র আনানোর আশাও ফুরিয়ে গেছে, দলের সব ছত্রভঙ্গ, তখন অনুশীলনের নেতা নলিনী ঘোষ (রাজেন বাবু) দালান্দা হাউজ থেকে পালান। সঙ্গে প্রবোধ বিশ্বাস। এঁরাও চন্দননগরে আসেন। এসে অতুলদাকে দুই দলের মধ্যে মিলনের প্রস্তাব দেন। অতুলদার উৎসাহ ছিল না। তিনি অমরদাকে বলেন। অমরদা বল্লেন, কথা বলতে অস্বীকার করা চলে না। বরং যাদুকে খবর দাও। তাই করা হল। অনুশীলনের আরও দু'একজন এলেন, হয়তো এই উপলক্ষে। যাদুদা কিছুদিনের ভেতর এলেন নলিনীদাকে সঙ্গে নিয়ে।

কথা শুরু হল। কি যে কথা তা জানিনে। কথার যেন আর শেষ নেই। তখন যে অত কথার কি থাকতে পারে নিজেরা আলোচনা ক'রে পাইনে। আমরা ছুটোছুটি ক'রে বেড়াই, অত কথা শোনার অবকাশও নেই। সতীশদার অধৈর্য প্রকাশ পায় মাঝে মাঝে।

এমন সময় বিরাট তোড়জোড়ের সাথে এক থানাতল্লাশি চলে। নয়খানা বাড়ি ছিল আমাদের সবার আশ্রয়স্থল। তার আটখানাতেই ঐ দিন তল্লাশি হয়।

চন্দননগরে আমাদের যুগান্তর দলের নেতা ছিলেন শ্রীশ ঘোষ। তাঁকে দেখিনি, কর্মোদ্দীপনাময় তাঁর জীবন ও রাশভারী ব্যক্তিত্বের কথা শুনেছি। তিনি রাসবিহারী বোসের আত্মীয় এবং তিনিই তাঁকে দলে আনেন। শ্রীশবাবু এসময় জেলে রাজবন্দী। তাঁর সঙ্গে যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের ভিতর বসন্ত ব্যানার্জি, বীরেন ব্যানার্জি প্রভৃতি প্রায় সকলেই গোন্দলপাড়া অঞ্চলের লোক। এঁরা তাই গোন্দলপাড়া গ্রুপ বলে পরিচিত ছিলেন। প্রায় সবাই তখন ধরা পড়েছেন। যাঁরা বাইরে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান নরেন ব্যানার্জি। আমরা তাঁকে 'বড়দা' বলি। চন্দননগরের আমাদের প্রায় সব আশ্রয়ের ব্যবস্থা তিনিই করেন, বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের কাজও অনেকটা তাঁর হাতে। অস্ত্রও কিছু কিছু যোগাড় করতেন, অস্ত্র রাখার স্থানও দিতেন।

আর ঢাকা অনুশীলনের সঙ্গে ওখানে যাঁদের সম্পর্ক, তাঁদের সম্পর্ক দলের বা রাজনৈতিক সহযোগিতার নয়। কতকটা পরস্পরকে কাজে লাগাবার ভাব। তা-ও প্রায় ডানহাত-বাঁহাতের ব্যবস্থা। দরকারমতো ওভাবে অতুলদাও তাঁদের সাহায্য নিতেন। উপরন্তু অতুলদার কাছে ওঁরা একটা বড় সাহায্য পেতেন—কোনোরকম খানাতল্লাশি হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে সে খবর আগে জেনে সাবধান হতে পারতেন।

যখনকার কথা বলছি তখন অনুশীলন দলের ওখানে আশ্রয়স্থল বলে কিছু ছিল না, ছিল রানীঘাটের পাশে একটা সাইকেল মেরামতের দোকান। সেটিতেও তল্লাশি হয়।

পরে জেলে ওঁদের লোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে জানতে পারি, ওঁদের তখনকার পলাতকদের একজনের দাদা ঐ সময় ধরা পড়ে এবং ঐ দোকান ও আশ্রয়ের বাড়িগুলি দেখিয়ে দেয়। নয়খানির ভিতর শুধু অতুলদা যে বাড়িখানিতে থাকতেন অর্থাৎ স্টেশন রোডের 'সেনেদের বাড়ি' বলে পরিচিত শ্রীশ সেনের বিশাল বাড়িখানি ছাড়া আর সবগুলি বাড়িই তল্লাশি হয়। শ্রীশবাবু তখন পণ্ডিচেরিতে ছিলেন। কখনও বের হননি বলে ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে ধরতে পারেনি। আমি, কুন্তল, জীবন আমরাও অনেক সময় এ-বাড়িতে দিনের পর দিন কাটিয়েছি।

অতুলদা অনেকদিন চন্দননগরে থাকার ফলে ফরাসি সরকারের কর্মচারী মহলের সঙ্গে তাঁর এমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দাঁড়িয়েছিল যে, শেষরাতের দিকে কোনো খানাতল্লাশির সম্ভাবনা থাকলে সন্ধ্যারাত্রেই তাঁর কাছে খবর পৌঁছে যেত। সারাদিন ঘরে বন্ধ থেকে বাইরের যা কিছু কাজকর্ম তার জন্য এই সময়টাতেই তিনি বের হতেন। এইভাবে খবর পেয়ে তিনি একবার চারুকে চন্দননগর হাসপাতালের গেট টপকে উদ্ধার করেছিলেন।

এবারে যেমন খবর পাওয়া গেল যে তল্লাশির জন্য পুলিশ ট্রেনে তো এসেছেই, উপরন্তু কয়েকখানা লঞ্চে ক'রে নদীপথেও এসেছে, সতীশদা অনুশীলনের দু' একজনকে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসলেন। পটাসিয়াম সায়ানাইড খাওয়ার পর থেকে রাতে প্রায় তাঁর ঘুম হতো না, আর এই ধরনের কাজে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

খবর দিলেন, ব্যাপার গুরুতর। তখন পলাতকদের আড্ডাগুলো কতক ঘিরেছে, কতকগুলোর চারপাশ দিয়ে ঘন ঘন সাইকেল ঘুরছে। এ রা তখন

দশজনই এক বাড়িতে এসে জমেছেন।

এক মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে যাদুগোপাল মুখার্জি বেরিয়ে পড়লেন, পেছনে পেছনে আর সবাই। সবাই সশস্ত্র। পুলিশ বেশ টের পেল, এই পালাচ্ছে। কিন্তু এমন সাহস ওদের হল না যে তাড়া ক'রে ধরে।

অমরদা আর অতুলদা শহরেই এক বাড়িতে কোনোরকমে রয়ে গেলেন—বাইরে ঘুরে বেড়াবার পক্ষে দু'জনেরই চেহারা তখন অনুকূল নয়।

বাকি যাঁরা রইলেন ফরাসি রাজ্যের সীমা পেরিয়ে দূরে এক মাঠের পাশে ঝোপের কাছে আশ্রয় নিলেন। সমস্ত দিন এঁরা মাঠে মাঠে সেটেলমেণ্ট অফিসার হয়ে কাটিয়ে দিয়ে, সন্ধ্যা নামতে আবার চন্দননগরে ঢুকে পড়লেন। সাময়িকভাবে আশ্রয় পেলেন হারাধন বকসীর বাড়িতে। হারাধনবাবুর দাদা নির্মল বকসী অতুলদার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেই সূত্রেই এই আশ্রয়। হারাধনবাবু প্রবর্তক সংঘের মতিলাল রায়ের লোক। কিন্তু তিনি যে এঁদের আশ্রয় দিলেন তা মতিবাবুর অজ্ঞাত রইল।

পুলিশ ইতিপূর্বেই বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেছে।

আমি সেদিন ছিলাম কলকাতায়। বেলা ন'টা আন্দাজ অতুলদার কাছ থেকে খবর পৌছালো, যেমন ক'রে পারি হাজার দেড়েক টাকা নিয়ে সন্ধ্যার মধ্যে চন্দননগর পৌছাতে হবে—পলাতকদের আশ্রয় নেই, অন্যত্র পার ক'রে দিতে হবে।

তখনকার দিনে সম্বল আমাদের স্কুল-কলেজ—সে মহলে আমি নামকরা ভিখারী। কিন্তু তখন স্কুল-কলেজেরও ছুটি। তাই গেলাম বজবজে অতুলদার বড়দার কাছে। শোনবামাত্র পাগলের মতো ছুটে হাতের কাছে যা পেলেন দিলেন—হল ছশো টাকা। আর যেখান থেকে যা পেলাম নিয়ে রাত্রে চন্দননগরে পৌছালাম।

তিলজলার দেবেন ঘোষের মারফত বাংলার বিভিন্ন জংশন স্টেশনে আমার কয়েকজন পরিচিত রেল কর্মচারী জুটেছিলেন। তাঁদের একজনের সাহায্যে নলিনী ঘোষ আর প্রভাস লাহিড়ীকে ব্যাণ্ডেল থেকে গৌহাটির দিকে পার করলাম।

যাদুদার সযত্ন-সঞ্চিত সুদীর্ঘ দাড়ির উপর মাথায় একটি ফেজ পরলে এবং তাঁর পেছনে টুপি মাথায়, খুর মুখে, গামছা কাঁধে, মাদুর বগলে এবং ফার্সিহুঁকো হাতে নিয়ে নলিনীদা দাঁড়ালে পরিচিত লোকেও তাঁদের চিনতে পারত না—যাদুদা সব সময়ে একভাবে পা ফেলে চলার অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কাজেই তাঁদের পার করতে কারও সাহায্যের দরকার হল না।

সতীশদাও 'মোটাদা'কে (মন্মথ বিশ্বাস) নিয়ে যে কোথায় উবে গেলেন তা কেউ টেরও পেল না। অতুলদা নিজের চেষ্টায় চন্দননগরে স্থান ক'রে নিয়ে শেষ পর্যন্তই কাটিয়ে দেন।

কিন্তু মুশকিল হল অমরদাকে নিয়ে। সুদীর্ঘ গৌরকান্তি পুরুষ, দীর্ঘ শ্মশ্রু-কেশের সমাবেশে তখনকার দিনে এমনই তাঁর চেহারা দাঁড়িয়েছিল যে রাস্তায় তাঁকে দেখলে লোকে তাকিয়ে থাকতো। তার উপর তাঁর পরিচিত লোকের কোথাও অভাব নেই। কিন্তু তাঁকে নিয়ে বিপদের কথা পরে বলছি।

অনুশীলনের নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন কানাই (কৃষ্ণ) সাহা। অতুলদা বললেন, ওঁদের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা, অপর দলের লোক, তার উপর এঁর বিরুদ্ধে অনেকগুলি হত্যা ও ডাকাতির চার্জ। তোমাদের সব চাইতে নিরাপদ যে আশ্রয়স্থল আছে, সেখানে রাখবে।

তখন আমাদের সব চাইতে নিরাপদ আশ্রয় ঐ দেবেন ঘোষের বাড়ি। ওঁকে এনে রাখলাম ঐ বাড়ির দোতলার ঘরে দেবেনবাবুর সঙ্গে। আমি আর কুন্তল সশস্ত্র হয়ে থাকি নিচের তলার ঘরে।

কিন্তু এঁকে নিয়ে আমরা বিপদে পড়লাম। ভদ্রলোকের তখনই বেশ খানিকটা অধোগতি হয়েছে। পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের রেলওয়ে কর্মচারির বেকার ভাই পরিচয়ে ওখানে থাকেন, ঢাকাই তাঁতের ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি ছাড়া পরেন না, হাতের দু'তিনটে আঙুলে জড়োয়া আংটি। অথচ থাকতে হয় অন্যান্য রেল-কর্মচারিদের সঙ্গে পাশাপাশি। রাত্রে একজন সহকর্মী আসেন, দামী জামাকাপড় রুমাল এসেন্স দিয়ে যান। নিজে কাউকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা ভিক্টোরিয়া ক'রে বের হন—অনেক রাতে ফেরেন মাংস, ল্যাংড়া আম, সন্দেশ নিয়ে।

কুন্তল বলেন, লক্ষণ ভাল নয়—এ শেষ পর্যন্ত অনেক অনর্থ করবে। আমরা কিছু বলতে সাহস করিনে, কারণ অপর দলের লোক। আভাসে ইঙ্গিতে যা বলি, তাতে কোনো সাড়া তো পাই-ই না, বরং তিনি যে একজন নেতা, তা-ই বুঝিয়ে দেন। দেবেন ঘোষ অতি সৎ এবং নিষ্ঠাবান লোক, আমাদের উপর অগাধ শ্রদ্ধা। কতদিন শুধু এক বাটি ফেন নিয়ে ভাত খেতে বসেছেন, আমি বা কুন্তল বা জীবন কেউ গিয়ে পড়েছি—অমনি ভাতের থালাটি ধ'রে দিয়ে বাজারে গেছেন দু' পয়সার চিঁড়ে কিনতে। নুন আর তেতুল মেখে তা-ই খেয়েছেন। কানাইয়ের এইসব তাঁর ভালো লাগে না। কিন্তু 'দেবী চৌধুরাণী'র

শিক্ষামতো ভাবেন বুঝি দোকানদারী।

কুন্তলের কথাই সত্যি হয়েছিল। ধরা পড়ার আগে এবং পরে ইনি অনেক অনর্থ ঘটিয়েছিলেন। সমস্ত অনুশীলন দলটিকে সর্বস্বান্ত করেছিলেন—এমনকি জেলে বসে নতুন-ধরা-পড়া বন্ধুদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ ক'রে বহু লোককে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

গোদের উপর বিষ ফোড়া। অতুলদা আবার খবর পাঠালেন, অমরদাকে যাঁদের কাছে রেখেছিলেন, তাঁরা ঐ অনুশীলন দলের আশ্রয়দাতা এবং তাদের কথা আগেই বলেছি, কিন্তু তাঁরা আর একদিনও রাখবেন না, সেই দিনই তাঁকে নিয়ে আসতে হবে। ঐ কয়দিন তাঁকে শেষ রাতে তুলে পায়খানা স্নান ইত্যাদি করিয়ে, কিছু খাইয়ে একটা ঘরে তালা দিয়ে দিতেন। ঘরের বারান্দায় সারাদিন ধরে স্কুল বসত অর্থাৎ একটু জোরে নিঃশ্বাস ফেললে বা কাশি দিলেই সর্বনাশ। আবার রাত বেশি হলে ঘর থেকে বের ক'রে কিছু খাবার-দাবার দিতেন। সেকালে অরবিন্দের যে কয়জন সহচর জুটেছিলেন, এরকমভাবে তাঁরাই শুধু কাটাতে পারতেন। যাদুদাকেও দেখেছি অনেক সময় সারাদিন ধরে ধ্যানস্থ হয়ে বসে কাটিয়ে দিতেন।

এ ভাবে হোক বা যে ভাবেই হোক অমরদাকে পনেরো দিন রাখবার কথা ছিল। তার জন্যে ছশো টাকাও নিয়েছিলেন। কিন্তু চারদিনের দিন বললেন, আর একদিনও নয়। কুন্তল গেলেন অমরদাকে আনতে। ব্যারাকপুরে অমরদার এক আত্মীয় ছিলেন—নৌকো ক'রে সেখানে গেলেন, আত্মীয় ওঁকে রাখতে অস্বীকার করলেন। গেলেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে। চেহারা দেখে লোকের ভিড় জমে যায়। তখন একটা ঘোড়ার গাড়ি ক'রে দু'জন রওনা হলেন শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের দিকে।

স্থান ও সময় বুঝে গাড়িখানি ভেঙে পড়ল। বেলা সাড়ে দশটা এগারোটায় যখন ডেলি প্যাসেঞ্জারের ভিড়, তখন অমর চ্যাটার্জি ঐ চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে হাওড়ার পুলে। ও-অঞ্চল থেকে যারা আসে অমর চ্যাটার্জি তাদের অনেকের পরিচিত। যাই হোক, কুন্তল আবার গাড়ি ঠিক ক'রে বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে সমস্ত দিন কাটালেন। রাতের বেলায় এসে উপস্থিত ঐ দেবেন ঘোষের বাড়িতে। আর উপায় নেই।

কানাই সাহা ইতিমধ্যে আরও এগিয়েছেন। রাস্তা থেকে উৎকলবাসী এক-একজনকে ধরে নিয়ে আসেন। দুটো-চারটে পয়সা দেন, সে গা টিপে দিয়ে যায়।

উৎকলবাসী আসন-ক'রে-বসা অমর চ্যাটার্জির দিকে ফিরে তাকায়, আর সংকুচিত হয়ে যায়। আমরা সংকুচিত হয়ে পড়ি, পাছে বাইরে গিয়ে গল্প করে।

অমরদার জন্যে তখন দুদিকে চেষ্টা করছি। এক, কলকাতাতেই একখানা উপযুক্তমতো বাড়ি ভাড়া ক'রে সেখানে সরানো। আর শৈলেন ঘোষকে আমেরিকায় পাঠানো হয়েছিল যার সহায়তায়, তাকে দিয়ে অমরদাকেও বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া।

এই লোকটির নাম রামগোপাল দত্ত, শৈলেন ঘোষের আত্মীয়, খিদিরপুর ডকে চাকরি করে। সে অমরদার জন্যে একটা জাহাজে চেষ্টা করে। কিন্তু হয়ে উঠল না। পরে আর একটা জাহাজে চেষ্টা করবার কথা। ইতিমধ্যে খিদিরপুর অঞ্চলেই একখানা বাড়ির চেষ্টা করতে বললাম, জাহাজে উঠবার আগে যেন যত-দিন প্রয়োজন সেখানে গিয়ে থাকতে পারেন।

আমরাও এদিকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারিনি। সেদিন কুন্তল ও আমি দুপুরে বেরিয়ে ওদিকে শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোন্নগর অঞ্চলে সুবিধামতো বাড়ি খুঁজলাম, পেলাম না। পরে ব্যারাকপুরের এদিকে খুঁজে, কলকাতাতেও দু'একজনের কাছে খোঁজ নিয়ে ক্লান্ত হয়ে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন রাত বারোটা। ইতিমধ্যে কানাইয়ের সেই সহচরটি এসেছেন। তাঁকে বিদায় ক'রে খেয়ে-দেয়ে শুতে শুতে রাত আড়াইটা হয়ে গেল।

বড়পিসী শুয়ে ছিলেন পাশের একটা গুদামমতো ঘরে, সঙ্গে তাঁর ছোট্ট একটি পালিত-পুত্র। এই বড়পিসী আর ছোটপিসী আমাদের আশ্রয়দাত্রী, আমাদের পলাতক জীবনের মা।

বড়পিসীকে আনেন ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় তারকেশ্বর অঞ্চলে তাঁর গ্রাম থেকে। ভোলানাথ পরে গোয়ার কাছে জার্মান অস্ত্র নামাতে গিয়ে ধরা পড়েন। পুলিশ বলে, পুনা জেলে তিনি আত্মহত্যা করেন। ভোলানাথ ছিলেন ঐ যুগের এক দুর্ধর্ষ কর্মী।

পরে আমি ধরা পড়ে গেলে অনুশীলনের লোকেরা পলাতকদের আশ্রয়ের সুবিধার জন্যে বড়পিসীকে গৌহাটি নিয়ে যান। সঙ্গে ছিল ঐ ১১।১২ বছরের ছেলেটি, লেখাপড়া কিছু শেখেনি, কিন্তু যেমন তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তেমনি কাজ করার শক্তি। যে-কোনো একটি পাইপ বেয়ে অক্লেশে দোতলার ছাদে উঠে যেত, আর লাফিয়ে পড়ত যেন কাঠবিড়ালীটি। জেল থেকে ফিরে এসে এদের আর কোনো উদ্দেশ পেলাম না। ওঁরা বললেন, কলেরা হয়ে মারা গেছে।

ঐ রাত্রে হঠাৎ সাড়ে তিনটায় পিসীমা চিৎকার ক'রে উঠলেন। রিভলভার হাতে আমি আর কুন্তল বেরিয়ে আসতে বললেন, জানলায় দেখলুম মানুষ।

উপরে অমরদা আর কানাই, নিচে আমি আর কুন্তল—চারজনেই পলাতক। উদ্বেগ তখনকার দিনে লেগেই আছে। চারদিক ঘুরে এলাম। কোথাও লোক-জনের কোনো চিহ্ন দেখলাম না। কিন্তু এর পর আর ঘুমও এল না। অর্থাৎ অত ক্লান্তির পর সারারাত প্রায় ঘুম হল না।

ভোরে শ্রীশবাবুকে নিয়ে আসবার কথা। ঢাকার শ্রীশ চ্যাটার্জিকে কলকাতায় খবর দিয়ে আনা হয়েছে। এতগুলি পলাতক, খরচ কম নয়। সি. আর. দাশ, সুরেন হালদার, বি. সি. চ্যাটার্জি ইত্যাদির সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে যাবেন যাতে আমরা এঁদের কাছ থেকে সাহায্য পাই।

কথাবার্তা হয়ে গেল। শ্রীশবাবুকে বাসায় পৌছে দিয়ে আরও দু'একটা কাজ সেরে বাড়ি থেকে খাওয়া-দাওয়া ক'রে বের হব। কথা ছিল, সেইদিনই রাম-গোপালের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা ক'রে ফেলতে হবে। এবং তারপর অমরদাকে তার আশ্রয়ে রেখে আমি গৌহাটি চলে যাব। এই সময়ে পুলিশ আমায় ধরবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে গেছে—চারদিক থেকেই খবর পাই। বন্ধুবান্ধবও অনেককে ধরেছে। যাদুদার নির্দেশ, কর্মঠভাবে পলাতকের জীবন যাপন করা আমার আর চলবে না, আমি যেন আগামী শনিবারেই তাঁর ওখানে চলে যাই।

ইতিমধ্যে অমরদার ব্যবস্থা করতে হবে। রামগোপালের সাহায্য নিয়ে তাঁকে জাহাজে তুলে দেওয়া এক কথা, আর তার আশ্রয়ে তাঁকে রাখা ভিন্ন কথা। এটা আমি পছন্দ করিনি বলেই আগের দিন রাত ঘোরাফেরা করেছি অমরদার আশ্রয়ের জন্য একটা বাড়ি খুঁজতে। বাড়ি যখন নেহাতই পাওয়া গেল না, তখন রামগোপালের সাথেই ব্যবস্থা করতে হবে, অমরদা ও কুন্তলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সেই সিদ্ধান্তই হল। অমরদা ভগবানে বিশ্বাসী, তাঁর উপর নির্ভর করতেই বললেন।

আদেশ-নির্দেশ সেদিন অনেকগুলিরই ব্যতিক্রম হল। অতুলদা বিষ্যুৎবারের বারবেলাকে বরাবর ডরাতেন। সেবারে চন্দননগর থেকে বেরিয়ে আসি বিষ্যুৎ-বারের বারবেলায়। বললেন, ছাখ্‌রে, আজ না গেলেই পারতিস। আমি একটু হেসে সেখান থেকে চলে এলাম।

যাদুদার নির্দেশ ছিল, গৌহাটি যাবার আগে যেন কখনোও দিনের বেলায় না বের হই, পায়ে হেঁটে না বের হই, একা যেন না বের হই, সশস্ত্র থাকলেও আর

একজন সশস্ত্র লোক যেন সঙ্গে থাকে। এছাড়া আমার নিজের প্রতি নিজের একটা নির্দেশ ছিল। রামগোপালের মতো লোক যারা আমাদের ঠিক দলের লোক নয়, এবং খুব বিশ্বাস যাদের করতে পারিনে, তাদের সঙ্গে কথা দিয়ে কথা না রাখতেই চেষ্টা করতাম—যদি বলতাম শনিবার আসব, তা হলে শুক্রবার যেতাম, সন্ধ্যার কথা বললে ভোরে যেতাম।

সেদিন সব আদেশ-নির্দেশেরই ব্যতিক্রম হল—সময় হাতে কম, এই জন্যে। দুপুরের পর অমরদার সাথে কথা বলছিলাম, কানাই পাশে শুয়ে, কুন্তল মেঝেয় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

রামগোপালের ওখানে যাব, কুন্তল সাথে থাকবে, সেখান থেকেই ওকে নিয়ে সন্ধ্যার দিকে চন্দননগর চলে যাব শেয়ালদা' শ্যামনগর হয়ে।

কুন্তলকে কয়েকবার ডাকলাম, অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ওর যখন ঘুম ভাঙলো না, আমি উঠে জামা পরছি দেখে অমরদা বললেন, একাই বের হবে? বললাম, এই সেদিন ও হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছে, কাল সমস্ত দিন খুব পরিশ্রম গেছে, রাতে ঘুম প্রায় হয়নি। ও থাক, ঘুমোক। ওকে বলবেন বিকেলে ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় যেন ক্যাম্বেল হাসপাতালের দরজায় থাকে, সেখান থেকে ওকে নিয়ে চন্দননগর যাব। হাসপাতালের দরজায় কোথায় দাঁড়াতে হবে, তা ও জানে।

হাতে টাকা কম—ট্রামে ক'রে খিদিরপুরে গেলাম। রামগোপালের ওখানে ঢুকতে সবই কেমন একটু নতুন নতুন মনে হল। অন্য কোনোদিন দেখিনি, সেদিন দেখলাম তেতলার দরজায় দারোয়ানের কাছে একটি দাড়িওয়ালা লোক কে বসে আছে। তার আমার দিকে তাকানোর ধরনটা ভালো লাগল না।

রামগোপালের নিজেরও বেশ একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম। অন্যদিন তাকে দেখি খুব ফিটফাট, আজ মনে হল কেমন একটা উষ্কখুষ্ক ভাব, যেন স্নানও করেনি। অন্যদিন আমায় দেখলেই উঠে আসে, বাইরে একটা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই, সেখানেই কথাবার্তা হয়।

এদিন ও যেন আমার দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারল না। জিজ্ঞেস করলাম, অসুখ করেছে? বলল, না। যা বলল তার অর্থ, বাসার কোনোরকম সুবিধাই করতে পারেনি সে।

বেরিয়ে এলাম। ডক থেকে বের হবার ওদিককার রেলিংঘেরা পথটা এমন যে তিন-চারটা রেলিং ছাড়িয়ে যদি কোনো লোক আমার গতিবিধির উপর

লক্ষ্য রেখে আসে, আমার পক্ষে তা টের পাওয়া শক্ত।

এসে ট্রামের ফার্স্ট ক্লাসে বসেছি। ওয়াটগঞ্জের মোড় থেকে চার-পাঁচজন সাধারণ পুলিশ কনস্টেবল সেকেণ্ড ক্লাসে উঠল। অমন তো কত পাহারা-ওয়ালাই ওঠে। তখন কিছু গ্রাহ্য করিনি।

এসপ্ল্যানেডে নেমেছি। চারু তখন চন্দননগর হাসপাতালে শয্যাগত—থাই-সিসের সন্দেহ আগে থেকেই ছিল, তার উপর পিঠে একটা গুলি লেগেছে। চন্দননগরের সিভিল সার্জন যিনি আগে কুন্তলের থাইসিসের চিকিৎসা করে-ছিলেন, তাঁরই চিকিৎসায় সেই হাসপাতালেই চারুকে রাখা হয়েছে। তার জন্যে কিছু ফল নিয়ে যেতে হবে। হগ্ মার্কেটের দিকে এগিয়ে চলেছি। পেছনে শুনি কতকগুলি জুতোর শব্দ।

পেছন ফিরে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে জাপটে ধরেছে। কয়েকদিন আগে ডান হাতের পাতার পেছনে একটা গুলি লেগেছিল, গুলিটা হাতের পাতা ফুঁড়ে হাতের রিভলভারের বাটের ভিতর ঢুকে গিয়েছিল। হাতটা তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। গলায় একটা সিল্কের চাদর পরি, তারই তলায় ব্যাণ্ডেজটা ঢেকে রাখি।

পুলিশ জাপটে ধরার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বাঁদিককার পকেটে একজন ডাচ্ কন্সালের একখানা চিঠি আছে। সেটা গৌহাটিতে যাদুদার কাছে নিয়ে যেতে হবে বলে কাছে রেখে দিয়েছি। তাতে তখন আর অনিষ্ট করার মতো কিছু ছিল না। তবু সেটাকে নষ্ট করারই প্রবৃত্তি হল মনের প্রস্তুতি অনুযায়ী। ব্যাণ্ডেজ করা ডান হাতে রিভলভার বের করতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম, এমন ক'রে ধরেছে দুটোর একটাও বের করা শক্ত।

তখন মাটিতে পড়ে চেষ্টা করছি, কাপড়ের ভিতরই যদি রিভলভারটার একটা আওয়াজ করতে পারি—এক মুহূর্তের জন্যে আঁতকে উঠে যদি হাতগুলো একটু ঢিলে ক'রে দেয়। সেফটিটা সরিয়েছি, ট্রিগারও ঠিকই ধরেছি। কাপড়েই আটকে গেল, কি, কি হল, ট্রিগার আর কিছুতেই পড়ল না। অথচ সেটা খুব ভালো রিভলভারই ছিল।

এসপ্ল্যানেডের মোড়। বহু পুলিশ এসে জমে গেল। আমি ক্রমাগত এমন ঝাপটা-ঝাপটি করছি যে ওরা আমার হাত-পা কিছুই বাঁধতে পারছে না। গায়ে তখন বেশ জোর ছিল। এই সেদিন পুলিশ যে একজিবিশন করেছিল, তাতে তখনকার দিনের নিজের ফটো দেখে নিজেরই হিংসে হচ্ছিল।

কিন্তু হলে কি হবে? পরে শুনেছি, সতের জন লোকে মিলে আমায় ধরেছিল।

দু'জন ইউরোপিয়ান সার্জেন্ট ছিল। তার একজন মাটিতে বসে আমার গলায় পা দিয়ে গলার চাদরটা ক্রমাগত পাকিয়ে চলেছিল।

সেই অবস্থাতেও তুমুল ধ্বস্তাধ্বস্তি করছি। ইতিমধ্যে বুঝলাম, ধরা পড়তেই হবে, রিভলভারও আর ব্যবহার করতে পারব না। তখন চেষ্টা করলাম পকেট থেকে পটাসিয়াম সায়ানাইড বের করতে, কিন্তু দেখি সে পকেটটা ছিঁড়েই নিয়ে গেছে।

মাঝে একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম, বহু লোক জমে গেছে। দু'-একজন বলছে, কি করছ, কি করছ তোমরা ? ছেড়ে দাও ভদ্রলোককে !

পুলিশও তার সনাতন জবাব দিচ্ছে, ইয়ে তো ডাকু হ্যায়। এই সব শুনতে শুনতে আর ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে কখন অজ্ঞান হয়ে গেছি। ওরা তখন আমার হাত-পা বেঁধেছে, একটা ট্যাক্সিতে তুলেছে। ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করছে কোথায় নিয়ে যাবে ? লালবাজার ? পুলিশের একজন বললে, ইলিশিয়াম রো। ঠিক এই রকম সময়েই আমার জ্ঞান ফিরে এল।

সব পুলিশগুলোও আর কয়েকটা ট্যাক্সিতে উঠল, নাম লেখাবে, ইনাম মিলবে। দেখলাম, আমার কাপড়-জামা সব ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, চাদরটারই এক অংশ কোমরে জড়ানো, সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, অনেক জায়গা থেকে রক্ত ঝরছে। বৈশাখের অপরাহ্ণ, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

ইলিশিয়াম রোতে যখন পৌছলাম, হাত দুটোকে পেছনে নিয়ে হাতকড়ি লাগিয়ে দিল। বারান্দা দিয়ে যখন একটা ঘরের ভিতর নিয়ে যায়, শুনতে পেলাম, পাশের ঘরে কে বলছে, ভূপেন দত্তকে ধরে নিয়ে এসেছে।

ঘরের ভিতর হাজির করলে বহু লোক এসে পড়ল দেখতে, সব স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চের কর্মচারী।

একটি হিন্দুস্থানী পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আমার চুল ধরে টানতে শুরু করল। চুল তখন ছোট ক'রে কাটা, বিশেষ সুবিধে করতে পারছিল না। আর, জানিই তো মারবে। তাই চুপ ক'রে রইলাম।

সাহস পেয়ে চারদিক থেকে গাল পাড়তে আরম্ভ করল। মার হয়ত সহ্য হতো, গাল সহ্য হয় না। চিৎকার ক'রে বললাম : Stop you brutes, you have sold your mother, sold your country, sold your conscience. And now, don't you feel ashamed to use filthy language against a patriot ?

চিৎকারে ঘরটা-সুদ্ধ যেন কেঁপে উঠল। গাল থেমে গেল। ইন্সপেক্টর কালি-সদয় ঘোষাল হিন্দুস্থানীটাকে বলল, মেরো না, এর কেস কোর্টে যাবে। মার থেমে গেল। আমার ভাগ্যে এর পরে আর মার জোটেনি।

একে একে ঘর ছেড়ে সব বেরিয়ে গেল। দু'চারজন যারা রইল, তাদেরই মধ্যে একজন পাশে এসে ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল, আপনার পিপাসা পেয়েছে? জল খাবেন?

ইংরেজিতেই ধমক দিয়ে জবাব দিলাম, মনে করেছ, তোমার হাতে জল খাব? ইউরোপিয়ান সার্জেন্টটাকে দেখিয়ে বললাম, বরং এর হাতে খেতে পারি, এরা যা করছে নিজের দেশের সেবার জন্য করছে।

সামনেই একটা জলের কল ছিল। সার্জেন্টটা একটা পেয়ালা নিয়ে বেশ ক'রে ধুয়ে জল এনে দিল, খেলাম। তারপর আবার পেয়ালায় জল নিয়ে এসে, আমার ধুতি-জামার যে টুকরোগুলো কাছেই পড়ে ছিল, তা থেকে খানিকটা ন্যাকড়া নিয়ে আমার সমস্ত গায়ের মাথার ঘাগুলো ধুয়ে ধুয়ে যে জায়গাগুলো থেকে তখনও রক্ত ঝরছে, সেখানেই জলপটি দিয়ে দিতে লাগল।

একটা চেয়ারে বসে ছিলাম। খানিক বাদে একজন বৃদ্ধ গোছের অফিসার এলেন, তাঁর কথায় একটু কুষ্টিয়ার টান শুনে আন্দাজ করলাম, পূর্ণ লাহিড়ী। বললেন, আহা! এই ছেলেডি? বাবা, তোমার নাম কি?

বললাম, Are you the officer-in-charge here?

না, না, সে আছেন, সাহেবরা আছেন।

Then I have nothing to tell you.

আচ্ছা, আচ্ছা—বলে সরে পড়লেন।

সন্ধ্যার সময় কয়টি সাহেব একে একে এসে দেখে চলে গেল। মনে হল, তারই একজন টেগার্ট। লর্ড রোনাল্ডশে এই সময় গভর্নর হয়ে এসে অত্যাচার জুলুমের কথা শুনে টেগার্টকে সরিয়ে দেন। তখন টেগার্ট চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছে, কর্বেট ডি. আই. জি হয়েছে।

সন্ধ্যার পর দোতলার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে কর্বেট, গোল্ডি, সতীশ মজুমদার এবং আরও অনেকগুলি বিলিতী ও দেশী অফিসার। কর্বেটের হাতে একটা পাতলা ছড়ি।

ছড়িটা টেবিলে রেখে কতকগুলো কাগজ নিয়ে একসাথে অনেকগুলো প্রশ্ন ক'রে গেল, What's your name? What's your father's name?

Where's your native village ? How old are you ? Was this revolver found on your person ?

আমি বললাম, Hear me once for all. My name is·····, my father's name······, my native village······, P.S.······, District ······, my age······. Expect from me so far and no further. I refuse to answer all further questions from the officers of a foreign Government.

খসখস ক'রে কথাগুলো লিখল, অত তাড়াতাড়ির কথা যা যা মনে পড়ল না, তা লিখতে সতীশ মজুমদার সাহায্য করল। লেখা হয়ে গেলে আমায় জিজ্ঞেস করল, Was this revolver found on your person ?

বললাম, I refuse to answer.

Was this monthly ticket found on your person ?

Ditto.

আরও দু'একটা প্রশ্নের ঐ রকম জবাব শোনবার পর চটেমটে কাগজগুলো টেবিল থেকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল, বেতটা তুলে নিয়ে ঘোরাতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে রাগে নাক দিয়ে ক্লান্ত কুকুরের নাকের আওয়াজের মতো একটা আওয়াজ বেরুতে লাগল।

বলল, You refuse to answer questions from a foreign Government's officers ! You are a revolutionary then ?

I am a patriot.

Do you know what this sort of behaviour will lead you to ?

What ? I know you have tortured many people, tortured some to death——

We torture men ! Don't you believe in British honesty ?

Yes. From Robert Clive down to yourself I don't know whom to call more dishonest.

You want us to leave the country ?

I know, you won't leave out of your own accord. We'll force you out.

You are a revolutionist then ?

I am a patriot.

You were going to stir up a revolution. How many are you ? I can count your number on my fingers. Have you got an army ? Have you got a navy ? Who is going to be your General ? Satish Chakravarti ? Satish Chakravarti going to be your General ? Do you know what an ordinary man-of-war would cost you ? It'll cost you three crores of rupees. Have you got the money ?

এইভাবে প্রশ্নের বন্যা চলল। তার উত্তরে আমিও এক বক্তৃতা ঝেড়ে দিলাম, যার মর্ম হল : কিছু তো নেই আমাদের, জানি। কিন্তু আমরা মরতে জানি, আমরা এক এক দল ক'রে মরব, আর দেশকে জাগাব—দেখি কতদিন তোমরা আমাদের লোকসংখ্যা আর টাকার হিসেব দেখিয়ে দাবিয়ে রাখতে পার। স্বাধীনতা চাইতে শিখলে কোন্ জাতকে কোন জাত কবে দাবিয়ে রাখতে পেরেছে ? আমরা জাতকে স্বাধীনতা চাইতেই শিখিয়ে যাব। তারপর না হয় দীর্ঘকাল তোমাদের সাথে আমাদের ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে হবে।

আমার বক্তৃতা চলছে, ওর হাতের ছড়ি ঘুরছে। আর আমি ভাবছি, এক ঘা যদি মারে, হাতেই না হয় হাতকড়ি আছে, একটা লাথিতে ওকে টেবিলের উপর দিয়ে ফেলব, তারপর যা হয় হবে।

দেখলাম, ছড়িটা সংযতই রইল। আমার বক্তৃতা থামবার পর অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বলল, 'লে যাও'। এই 'লে যাও' কথার অর্থ শুনেছিলাম, মারের ঘরে নিয়ে যাও। আমার বেলায় দেখলাম, লালবাজারে নিয়ে চলল।

সে আর এক কাণ্ড। দেখলাম, অফিসের সামনে একটা বন্ধ ভ্যান দাঁড়িয়ে— তার সামনে পাঁচজন বন্দুকধারী দেশী পুলিশ, এবং দু'জন ইউরোপিয়ান সার্জেন্ট। দেশী পুলিশগুলো ভিতরে ঢুকল, একটা সার্জেন্ট সামনে বসল, অপরটা বন্দুকের চেম্বার ও হাতের গুলি খুলে পেছনের দরজায় বসল। গাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একজন আই. বি অফিসার। সে আর ভিতরে ঢুকছে না। সতীশ মজুমদার এসে তাকে জিজ্ঞেস করছে, উঠছ না কেন ?

সে মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বলে, আর একজন কাউকে দিলে হতো না ?

তুমি বলছ কি ? ওর রয়েছে পেছনে হাতকড়ি লাগানো, তার উপর বন্দুক

নিয়ে অতগুলো কনস্টেবল ভেতরে রয়েছে, দরজায় রয়েছে রাইফেল নিয়ে সার্জেণ্ট। তোমার কাছে আছে রিভলভার। আরও লোক? অত ঘাবড়াচ্ছ কেন?

না, না, তবু, তবু—ক'রে তো সে উঠে পড়ল।

সেই প্রথম ব্ল্যাকমেরিয়ায় ঢোকা। ভেতরে অন্ধকার, আমার মনেও তাই।

লালবাজারে গিয়ে এক বুড়ো মতন ভালো মানুষ সার্জেণ্টের কাছে তো আমার নাম ইত্যাদি লেখাল। তখনও আমার সেই সিল্কের চাদরের অর্ধেকটা পরা। আই. বি-র লোকটা সার্জেণ্টটিকে বলল, ঐ কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে ওকে একটা হাফ প্যাণ্ট দাও।

সার্জেণ্ট বলে, How can I remove his national costume?

আই. বি-টা বলে, দিলে ভালো করতে, আচ্ছা যা খুশি কর।

এর পর সার্জেণ্ট আমায় নিয়ে একটা সেলে ঢুকল। সেখানে দুখানা কম্বল দিল। দরজায় পাঁচজন পুলিশ বসাল। তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। একটু বাদে দরজা খুলে, বোধ হয় ঐ আই. বি-র পরামর্শে, ওর একজন পুলিশকে সঙ্গীন-সুদ্ধ ভিতরে এনে দাঁড় করিয়ে দিল।

দরজার সামনাসামনি জানলার কাছে একটা কম্বল বিছিয়ে বসলাম। এলো-মেলো সমস্ত কথাগুলো মনের ভিতর ওলটপালট করতে রইল। তিনটি কথাই তার ভিতর বড় হয়ে দেখা দিল।

প্রথম কথা, কেমন ক'রে ধরা পড়লাম। আনুপূর্বিক সমস্ত ভেবে তখন যা মনে হয়েছিল, পরে সমস্ত জেনেশুনেও দেখলাম, আমার ঐ প্রথম সিদ্ধান্তই ঠিক। রামগোপালই আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে। শৈলেন ঘোষের আমেরিকায় যাবার ব্যাপারের সঙ্গে আর যারা সংশ্লিষ্ট ছিল, তার একজন কয়দিন আগে ধরা পড়েছে। সে স্বীকারোক্তি করার ফলে রামগোপালকে ঐদিন ভোরেই পুলিশ ধরতে যায়। তখন, আমায় ধরিয়ে দেবে, এই অঙ্গীকারে রামগোপাল সেইদিনই ছাড়া পায়। এবং আমিও ঠিক কথামতো ও সময়মতো ঐদিন তার কাছে যাওয়াতে সে সুযোগ পেয়ে যায়।

এ খবর বাইরে অজানা রইল না—রামগোপাল সমাজে একঘরে এবং ভাইদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু পুলিশ বিভাগে সে চাকরি পায়।

দ্বিতীয় কথা যা আমায় অস্থির ক'রে তুলেছিল সে হচ্ছে এই—আমি ধরা পড়লাম, কিন্তু যাঁরা রইলেন তাঁদের চলবে কি ক'রে? কুন্তল, চারু—অতজন

পলাতকের ভার ওদের উপর, অথচ ওরা তো বেশি লোককে চেনে না। আজ অবধি কোনো ঝামেলাই ওদের উপর দিয়ে যায়নি। তা ছাড়া স্বাস্থ্যও দুজনেরই খারাপ। কি ক'রে কোথা থেকে আজই ওদের চলবে? তার উপর, কতখানি হতাশায় যে ওরা ভেঙে পড়বে! কুন্তল আজ যখন ক্যাম্বেলের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে থাকবে, আমি নির্দিষ্ট সময়ে যাব না, কি নৈরাশ্য আর ব্যথা নিয়ে বাড়ি ফিরবে! আজ সন্ধ্যায় চারু হাসপাতালের জানলা থেকে পথের দিকে চেয়ে থাকবে। আমি যাব না, হাসপাতালের দরজা বন্ধ হবে অনেক রাতে, তখন অবধি আশায় থাকবে। তারপর?

সব ছাপিয়ে মনে জাগছিল এক ভাবনা। কত লোকের কথা শুনেছি, স্বীকারোক্তি করেছে। কি ক'রে হয়? টুকরো টুকরো নানা কথা মনে ভেসে আসছিল। একদিন অতুলদা বলেছিলেন, মারলেই যদি স্বীকারোক্তি করতে হয়, তা হলে কোনো দেশে কোনো কালে বিপ্লব সম্ভব হতো না। সুরেশ দাশ বলেছিলেন, আমি যদি সত্যি সত্যিই কিছু না জানতাম, মারলেই বা কোথা থেকে বলতাম? কুন্তল বলেছিলেন, মারতে মারতে মেরে ফেলে দেবে, মুখ দিয়ে একটি কথা বের হবে না—এই তো বিপ্লবীর জীবন।

এ সব কথাই জানি, বুঝি। মুখ দিয়ে কথা বের হতে পারে না। নিজেকে বাঁচাবার জন্য অপরের সর্বনাশ করা—বিপ্লবীর ধর্মত্যাগ, বিপ্লবীর জাতিপাত। বিশ্বাসঘাতক হতে পারে, পুলিশের কাছে মাথা নোয়াতে পারে—আত্মসম্মান-বোধের কতখানি অভাব হলে! অথচ কার নামে যে না রটেছে! জীবন চ্যাটার্জির নামে পর্যন্ত—যে জীবনকে আমি নিজের চেয়েও বেশি বিশ্বাস করি। অনুশীলনের অমৃত সরকার—তাঁকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানিনে, কিন্তু কত কথাই তো তাঁর সম্বন্ধে শুনেছি! পরে শুনেছি, এঁদের নামে যা কিছু রটেছে, সবই মিথ্যা, আত্মসম্মান অনাহত রেখেই এঁরা উৎরেছেন।

কিন্তু তখন ঐ জানলা দিয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি, মার খেয়ে বা কোনোরকম অত্যাচার-জুলুমের ভয়ে তো এঁদের মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হওয়া সম্ভব নয়। তবে কি কোনো রকম ঔষধ খাওয়ায়? কোনো রকমে অজ্ঞান ক'রে নিয়ে, উন্মাদ ক'রে দিয়ে কি তবে কথা বের করে?

যদি সত্যিই আমার তাই হয়? সেই কলঙ্কিত জীবন বয়ে আমার বেঁচে থাকতে হবে? আর, আমার মুখ দিয়ে যদি কোনো কথা বের হয়, আমার কথায় প্রথমেই ধরা পড়বে কে?—কুন্তল আর চারু, কাল পর্যন্তও আমার কাঁধে

মাথা রেখে যারা পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে!

পরে শুনেছি, ঐ দিনই আলোচনা হয়েছে। কানাই সাহা বলেছে অমরদাকে, ভূপেন দত্ত যদি ধরা পড়ে থাকে আমাদের তাহলে আজই বাসা বদলানো উচিত। অমরদা বলেছেন, কেন? ভূপেন যদি স্বীকারোক্তি করে, আমাদের ধরা পড়াই ভালো। আমরাই-বা তা হলে পালিয়ে থাকব কিসের আশায়?

কানাইয়ের ঠিক বিপরীত কথাও বলেছিলেন অনুশীলনের আর একজন গৌহাটিতে। আমার ধরা পড়ার খবর নিয়ে গৌহাটিতে যখন একজন বলেছেন, ভূপেন দত্ত তো গৌহাটির খবর জানে, তখন নলিনী ঘোষ জবাব দিয়েছেন, আমি তাকে অল্পই দেখেছি, কিন্তু যা দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে, দুই দলের আর যে কেউ স্বীকারোক্তি করতে পারে, আমি বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু এ নয়।

তখনকার দিনে কেউ ধরা পড়লে এই রকমই সব আলোচনা চলত। বাড়ি বদলের হিড়িক লেগে যেত।

লোকে আমার উপর আস্থা রাখে আমি জানি। সেই আস্থাকে চিরদিনের মতো বলি দিয়ে আমায় বেঁচে থাকতে হবে?

পেছন দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে দেখি—ঘরের মাঝখানে সঙ্গীন নিয়ে পাহারাওয়ালাটি তখনও দাঁড়িয়ে। মনে মনে সংকল্প আঁটি: রাতে ওর দিকে চেয়ে বসে থাকব। একবার না একবার ও ঝিমোতে শুরু করবেই, তখন ওর সঙ্গীন কেড়ে নিয়ে যা করবার করব।

মন ক্রমে দৃঢ় হয়ে ওঠে। কিন্তু রাত সাড়ে দশটা নাগাদ সেলের তালা খুলল, ঘরে ঢুকল কর্বেট। আবার তার সেই বক্তৃতা। তার উত্তরে আবার আমার মুখে ঝাঁজালো ঝাঁজালো কথা।

তারপর কর্বেট প্রত্যেকটা জানলায় দরজায় গেল, শিকগুলো টেনে টেনে দেখল শক্ত আছে কি না—কোনোটাকে ভেঙে বা বেঁকিয়ে যাতে আমি না সরে পড়তে পারি। পায়খানার ভিতরটাও ঢুকে দেখল। তারপর বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাবার বেলায় সঙ্গীনওয়ালা পুলিশটাকে বাইরে নিয়ে দাঁড় করিয়ে ঘরে আবার তালা লাগিয়ে, তালাটা বার-কয়েক ঝেঁকে পরখ ক'রে চলে গেল।

ও-আশা ফুরিয়ে গেল।

এরপর একবার পায়খানায় ঢুকলাম প্রস্রাব করতে। ঢুকে সমস্ত দিকটা বেশ ক'রে দেখে এলাম।

সারা রাত ঘুম আর হল না। কখনও শুয়ে কখনও বসে সংকল্পটা দৃঢ় ক'রে

নিচ্ছি, সমস্ত পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

রাত সাড়ে তিনটা আন্দাজ পায়খানায় যাব বলে কনস্টেবলদের কাছ থেকে এক মগ জল চেয়ে নিলাম। পায়খানার ভিতর একটা কাঠ পড়ে ছিল, সেই কাঠের উপর 'কমোড'টা চাপিয়ে দিতে উপরে জানলার গরাদে হাত ঠেকল। জানলায় বসে চাদরটা কোমর থেকে খুলে নিলাম। পাকিয়ে গরাদে বেঁধে গলায় পরিয়ে দিলাম।

মেডুলা ভাঙার তথ্যটা জানা ছিল না, শ্বাসরোধ হয়ে মরার কল্পনাই মনে ছিল। তাই আস্তে আস্তে ঝুলে পড়লাম, পাছে কোনো রকম আওয়াজ হয়। কিন্তু যা ভয় করেছিলাম, তাই হল। জানলার নিচের প্লাস্টারগুলো ছিল পুরনো, হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল কমোডের ওপর। আওয়াজ শুনে বাইরে কনস্টেবল-গুলো হাঁউমাউ ক'রে উঠল 'কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া' ক'রে।

সার্জেণ্টটা চাবি নিয়ে ছুটে এসে দরজা খুলে ফেলল। ওরা চেঁচাতে লাগল 'ছুরি লে আও, ছুরি লে আও' ক'রে। তখন আমার গলাটা বেশ শুকিয়ে আসছে। এক-একবার মনে হচ্ছে আর বেশি সময় নয়।

কিন্তু সার্জেণ্টটা হঠাৎ বলল, দুজনে ধরে উপর দিকে তোলো। ভয় হল, আর বুঝি মরা হয় না!

তখন চেষ্টা করলাম মাথা ঠুকে যদি মরা যায়। একটা কনস্টেবলের দুই কাঁধে দুই হাঁটু রেখে ঝুলে একবার জানলার একদিকে মাথার সামনেটা, আর একবার জানলার অপরদিকে মাথার পেছনটা জোরে জোরে ঠুকতে লাগলাম। কয়েকবার ঠুকবার পরই জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

আর যখন জ্ঞান ফিরল, তখন শুনছি সার্জেণ্টটা জিজ্ঞেস করছে, Do you think Doctor, it will be necessary to take him to the hospital?

Yes, it's better to take him.

কথাগুলো কানে যখন গেল তখন চুপ করেই রইলাম, দেখা যাক হাসপাতাল থেকে কোনো সুযোগ পাওয়া যায় কি না।

অ্যাম্বুলেন্স এল। আগের দিনের মতোই পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা। রাত তখন ভোর হয়ে গেছে।

চোখ বুজিয়ে রয়েছি। চারিদিকে কে আছে না আছে, কি ব্যবস্থা, কিছু তখনও বলতে পারিনে। কেবল বুঝলাম, মাথার ও গায়ের ঘাগুলো ধোয়া হচ্ছে,

ব্যাণ্ডেজ করা হচ্ছে।

একজন সাহেব ডাক্তার এলেন, নাড়ী দেখলেন। কিছু বুঝতে পারলেন না। চলে গেলেন। একটু বাদে একজন বাঙালী ডাক্তার এলেন। নাড়ীটা টিপে, হাত ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ তিনি একটা ম্যাচ বের করলেন, জ্বালিয়ে চোখের পাতা টেনে চোখের কাছে ধরলেন। তারপর বললেন, জ্ঞান বোধ হয় হয়ে গেছে। না হলেও এখনই হবে।

বুঝলাম, এর পর আর বেশি সময় ভান ক'রে থাকা ঠিক হবে না। ধীরে ধীরে চোখ মেললাম। প্রথমেই যাকে চোখে পড়ল সে কানাই বসু মল্লিক, আমার ভূতপূর্ব সহপাঠী, তখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। বড়ো মমতার সঙ্গে আমার ঘাগুলোতে ঔষধ লাগাচ্ছেন, আর ব্যাণ্ডেজ বাঁধছেন। ওঁর এই স্পর্শেই প্রথম মনে হল মাথায় বেশ ব্যথা হয়েছে।

চারদিকে তাকিয়ে দেখি, কয়েকটি ছাত্র ছাড়া ইউনিফর্মধারী এবং ইউনিফর্ম ছাড়া পুলিশই সব—তারা খাটখানিকে ঘিরে রেখেছে। বুঝলাম, আর কোনো আশা করা বৃথা।

খানিক বাদে স্ট্রেচার এল। আবার সেই অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি, আবার সেই পাহারাওয়ালা, আবার সেই লালবাজারের সেল।

ঐদিন প্রভাতের প্রথম রৌদ্রের সাথে সাথে কয়েক বছরের মতো বাইরের জগতের উপর যবনিকা পড়ে গেল। সেটা আগের দিনই পড়েছিল। এখন মনের আশাটুকু শেষবারের মতো একটু জ্বলে উঠে নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনের উপর চেপে রইল ঐ শঙ্কা, মরা তো হল না, এর পর কি? বেঁচে মরে থাকতে হবে না তো?

প্রথম জেলের অভিজ্ঞতা

লালবাজারে পনেরো দিন কাটল। খাদ্য-তালিকা পনেরো দিনেরই এক। সকাল সাড়ে দশটা আন্দাজ একজন ব্রাহ্মণ কনস্টেবল রান্না ক'রে দিয়ে যায় ভাত, মুগের ডাল, পটলের ঝোল—best sauce দিয়ে খাই, অমৃতের মতো লাগে। রাত আটটায় দোকানের চারখানা পুরি এবং ঠোঙ্গার তলায় একটু আলুর ছেঁচকি। সকালে-বিকালে কিন্তু কিছু নয়। ঘরের দরজার সামনে বসে চারটি কনস্টেবল, একজন দাঁড়িয়ে বন্দুক ও সঙ্গীন হাতে। কনস্টেবলরা সন্ধ্যার অন্ধকারে ছোলা ভাজা চিবুতে শুরু করবে। একজন বলল, আপনার তো খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই, সরকারের নয়, আমার নিজের ছোলা চারটি দিই, খাবেন?

পায়চারি করছিলাম, দরজায় একটু দাঁড়িয়ে বললাম, না ভাই, তোমরা খাও। আমি আমার নিজের ভাবনা, এবং গায়ের ও মাথার ব্যথা ও ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ঘরেই ঘুরে বেড়াই। হাতের গুলির ঘা প্রায় শুকিয়ে এসেছে, তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আছে।

প্রথম দিনটি অমনিই কেটে গেল, দ্বিতীয় দিনে বেলা আটটা আন্দাজ বৃদ্ধ সার্জেন্টটি এল; অমনিতেই একটা বিষণ্ণ চেহারা, আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরতে চেয়েছিলাম বলে সে এখন আরও বিষণ্ণ—এ-কথা পরে শুনেছিলাম। জিজ্ঞেস করল—You must be badly needing a bath?

বললাম, হাঁ।

খুলে বের ক'রে একটা স্নানের ঘরে ঢুকিয়ে দিল। কাপড়-গামছা নেই, একটি খাকি জাঙ্গিয়া তখন আমায় পরতে দিয়েছে। তাই নিয়েই যা ক'রে পারি, ঐ ক'দিন স্নান করতাম। তাতেই তৃপ্তি বোধ হতো।

তৃতীয় দিনে সার্জেন্টটি দুপুরে এসে বলল—You have nothing to pass your time with. Shall I ask for some books for you?

Please, do.

সন্ধ্যাবেলায় আর একটি আগাগোড়া খাকি-পোশাক-পরা ইউরোপিয়ানকে নিয়ে এল। তার গলায় ঝুলানো একটা বধিরদের কথা শোনবার যন্ত্র। বলল, আপনি বই চেয়েছেন ?

I never asked for anything.

সার্জেণ্ট বলল, আপনার সময় কাটাবার কিছু নেই।

বললাম, That's true.

Please ask the Deputy Commissioner when he comes round. I too shall speak to him.

ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসব ভাবছি, জিজ্ঞেস করল, আপনার নাম কি ?

বললাম।

জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথায় থাকতেন ?

পুরনো মেসের ঠিকানা বললাম, পটলডাঙ্গায়।

Where's that ?

Near the Amherst Street and Harrison Road crossing.

Did you happen to know শ্রমজীবী সমবায়, অমরেন্দ্র চ্যাটার্জি, মন্মথ বিশ্বাস and all that ?

What do you mean by all these questions ?

ফিরবার উপক্রম করছি, বৃদ্ধ Sergeant-টি বলল, না, না, ও কিছু নয়, he is only a brother Sergeant.

স্বস্থানে এসে কম্বলের উপর আসন ক'রে বসলাম। ওরা পেছনে দাঁড়িয়ে কি একটু বিড় বিড় ক'রে আলাপ ক'রে সরে পড়ল।

এই পনেরো দিনের ভিতর মাত্র দিন-তিনেক গোল্ডি সাহেবের এখানে আবির্ভাব হয়েছিল। সে বোধ হয় তখন স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার। মনে হয়, ধরা পড়ার পর দিনই একবার এসেছিল। বলল, You tried to commit suicide ?

What of it ?

But why did you do it ?

Because the sooner I am out of the foreigners' clutches the better.

তারপর চলল ওর ও কুতর্কের অছিলায় জেরা, আর আমারও সব বেয়াড়া

জবাব। লোকটি কথা বলে ভিজে বেড়ালের মতো মিউ মিউ ক'রে। আর গাল খেতে পারে বেশ।

ঐ দিনই হবে, কি ওর পরে আর একদিন আমার কোনো কথার জবাবে আমার প্রথম দিনের কথার রেশ টেনে জিজ্ঞেস করলে, সে-ও কি স্বদেশ-প্রেমিক নয় ?

Yes ! But had you been one, you would now be either in Flanders or in Mesopotamia. But I know, you have had it recommended, your services are indispensable here.

একটু ম্লান হাসি হেসে কেটে পড়ল।

আর একদিন বলল, You want us to leave India. Will you be able to manage your own affairs when we leave ?

জবাবে বলি, Ask Annie Besant. She will tell you, we were managing our affairs, when your ancestors were roaming about naked, with tattoo marks on, in the jungles of your happy Albion. মাথাটি নিচু ক'রে শুনে সে চলে যায়।

পনেরো দিনের দিন ডাক পড়ল। সকাল সকাল খাইয়ে দাইয়ে ব্ল্যাক-মেরিয়ায় ঢুকিয়ে বাঙ্কশাল স্ট্রীট কোর্টে নিয়ে গেল। পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা সমানই। ব্ল্যাকমেরিয়া যখন খুলল, দেখা গেল দরজার দু'পাশে দু'জন সার্জেন্ট, আর সামনে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহো, পাশে দাঁড়িয়ে সরকারী উকিল। উকিল বললেন, আমি চাই আসামীকে পনেরো দিনের জন্য জেল হাজতে রাখা হোক। মঞ্জুর হয়ে গেল। নিয়ে গেল প্রেসিডেন্সি জেলের ফটকে।

সেখানে ছিল এক ইউরোপিয়ান ওআর্ডার। সে জেলারকে ডেকে পাঠিয়ে আমার নাম-ধাম লিখে নিল। রাশভারী, বিখ্যাত জেলার ছিল সাহেব—জেলে নরেন গোঁসাইয়ের হত্যার পর আন্দামানের বিশেষ আমদানি। রেজিস্ট্রি খাতায় আমার নামটা পড়েই আপাদমস্তক কটমট ক'রে তাকাল, তারপর যেন হাঁড়ির ভিতর থেকে যে আওয়াজটা বেরুল, সেটা হল 'Follow me !' প্রথমটা বুঝতে পারিনি, ভিতরের দিকে খানিকটা এগিয়ে আবার আমার দিকে ফিরে বলল, 'I speak but once'।

'ধমকে-চমকে উঠিয়া যাইব, আমি যদি সে প্রকৃতির লোক হইতাম, তাহা হইলে আসিতাম না'—'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল,

তাই একটু হাসি পেল। ওর পেছন পেছন চললাম। জেলের সিপাই ভিতর দিকের দরজা খুলে দিল। ভিতরের আরও গোটা দুই দরজা খুলল, বন্ধ হল, তারপর যেখানটায় পৌঁছালাম, সেটার নাম গোরা ডিগ্রি বা ইউরোপিয়ান ওআর্ড। এখন এসব স্থান সুপরিচিত, কিন্তু আজ থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগে কে ভেবেছিল, জেলখানায় গিয়ে অমন ঘরে থাকব ?

বারান্দায় বসে ছিল একজন ইউরোপিয়ান ওআর্ডার। তার নাম ছিল অ্যাক্‌-সেলবি। ঐ শ্রেণীর যতগুলি জীব তখন প্রেসিডেন্সি জেলে দেখেছি, তাদের মধ্যে এই লোকটিকে দেখেছি বেশ ভদ্র।

জেলার সাহেবকে দেখে সে ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়াল। হাঁড়ির ভিতর থেকে আবার হুকুম হল সামনের সেলটা খোলবার। উপরে লেখা ৩নং। ওদের দু'-জনের মাঝখানে আমি ঘরে ঢুকে এক কোণে দাঁড়ালাম। তারপর শুরু হল জেলার সাহেবের দুর্দান্ত অভিনয়—সবটাই অভিনয়—ঐ ধমক-চমক পর্যন্ত।

লোহার খাটটাকে হুড়হুড় ক'রে টেনে দরজার কাছে নিয়ে এল, মশারির ডাণ্ডাগুলো টেনে বাইরে ঝনঝন ক'রে ফেলল। এর ভিতর দুটো কয়েদী ঢুকল, তারা এসে সাহায্য ক'রে শেষ পর্যন্ত যেটা দাঁড় করাল, তাতে আমার শয্যা রইল—চটের একটা গদি এবং গায়ে দেবারই হোক বা গদির উপর পাতবারই হোক, একখানা কালো কম্বল, আর মাথার তলার জন্য চটের তৈরি সেকেলে কানবালিশের সাইজের একটি বস্তু। এক কোণে আলকাতরা মাখানো একটা টুকরি দেখে মনে হল, মূত্রত্যাগের ব্যবস্থা ঘরেই।

জেলার সাহেব আমার সেই জাঙ্গিয়ার পকেটেও হাত দিয়ে তল্লাশি চালালেন। যাবার বেলায় সেই ইউরোপিয়ান ওআর্ডারটাকে আদেশ হল, রোজ সকালে ও বিকালে দুবার তল্লাশি করবে, কড়া নজর রাখবে এবং সে কাজে সাহায্য করবার জন্য আর একজন ওআর্ডার পাঠাবেন বলে বীরবিক্রমে বেরিয়ে গেলেন।

বেচারীর দোষ ছিল না। দু'একদিন পরে দেখতে পেলাম, ইউরোপিয়ান ওআর্ডারের সামনে যে একখানি খাতা থাকে, তাতে লেখা আছে—কোন্ ওআর্ডার কখন ঢুকল, কে কখন বেরিয়ে গেল, ইআর্ডের ভিতর কে কখন এল বা গেল, দশটা সেলের বন্দীরা কে কখন স্নানের ঘরে গেলেন, কার জন্য এক টুকরো কাপড় কাচা সাবান বা ফল বা হাসপাতাল থেকে ঔষধ বা আত্মীয়-স্বজনের চিঠি এল। সেই খাতার একটি পাতায় তখনকার দিনের অ্যাডিশনাল পলিটিক্যাল সেক্রেটারী কামিং সাহেবের একখানি টাইপ করা চিঠি আঁটা

রয়েছে। তাতে আমার নাম ইত্যাদি দিয়ে লেখা আছে, বেজায় বিপজ্জনক বন্দী, আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিল, ইউরোপিয়ান ওআর্ডের ৩নং সেলে সার্জেণ্টের সামনে তাকে রাখবে, অত্যন্ত কড়া নজরে রাখবে এবং তেমন নজর রাখার জন্য এর সামনে আর একজন বিশেষ ওআর্ডার নিযুক্ত করবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। ঐ কাগজখানার তলায় সব ইউরোপিয়ান ওআর্ডারদের সই করতে হয়েছে।

জেলার সাহেব বেরিয়ে যেতে যেন ঝড় থেমে গেল—সারা বাড়িটা নিঝুম। সামনে সেই ইউরোপিয়ান ওআর্ডারটি চুপচাপ বসে নীল কাগজে চিঠি লিখছে। এর মধ্যে দেশী একটি ওয়ার্ডার এল। এই ওআর্ডারটিই বিখ্যাত ফতে বাহাদুর খাঁ, প্রেসিডেন্সি জেলের বড় জমাদার রূপে অনেক রাজনৈতিক বন্দীর কাছে পরে 'দুর্দান্ত' বলে সুপরিচিত হয়েছিল। আমার বিশেষ পাহারাদার রূপে এ কিন্তু দেড়মাস আমার সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করেছিল। অত কড়াকড়ি পাহারা এবং আমার বেশ দেখে ওআর্ডাররা এবং জেলের কয়েদীরা সবাই বলাবলি করত, আমার ফাঁসি হবে। কাজেই সকলের কাছে সকরুণ ব্যবহার পেতাম।

বেলা তিনটে বাজল। একটি কয়েদী এসে সাহেবের টেবিল থেকে চাবি নিয়ে উপরে গেল। একটি ফিটফাট ভদ্রলোক কোথা থেকে সামনের মাঠের ভিতর এসে নিঃশব্দে জোড় হাত ক'রে নমস্কার করলেন। আমিও প্রতি-নমস্কার করলাম তাঁকে। কিন্তু মনে কেমন খটকা লাগল। এ কে? কোথা থেকে এল? পুলিশের লোক নয় তো? মিনিট পনেরো ভদ্রলোক বাইরে ঘুরলেন, তারপর আবার আমায় একটি নমস্কার ক'রে পাশের দিকে কোথায় চলে গেলেন। আবার অমনি আর একটি ভদ্রলোক এলেন। তিনিও মাঠে ঐ পনেরো মিনিটের জন্য ঘুরলেন, কিন্তু তিনি আমার ঘরের দিকে ফিরেও তাকালেন না। পরে শুনেছিলাম, অজয় নদের তীরে যে বিপ্লবের আয়োজন হয়েছিল, সেই সম্পর্কে এক মামলার কল্পনা ছিল। সেই মামলায় রাজসাক্ষী হবার জন্য তৈরি হয়ে তিনি ওখানে ছিলেন। ইনি চলে গেলে পনেরো মিনিট পর পর এক-একটি ভদ্রলোক দেখে আবিষ্কার করলাম, আমার আশপাশে এবং উপরে আর যে নয়টি সেল, তার প্রত্যেকটিতেই একজন ক'রে রাজবন্দী আছেন। কিন্তু প্রেসিডেন্সি জেলের তখন এমনি অবস্থা যে, ঐ যে সাড়ে বারোটা থেকে তিনটা পর্যন্ত আমি ওখানে কাটালাম এবং তার ভিতর জেলারের ঐ যে সশব্দ অভিনয় হয়ে গেল তার ভিতর টেরও পাইনি যে সবগুলি সেলই ভর্তি। ঐ আড়াই ঘণ্টা ধরে আমার ধারণা ছিল ঐ বাড়িখানিতে আমিই একমাত্র বন্দী।

ওর ভিতরও সব দিন, সব সকাল, সব সন্ধ্যা একরকম যায়নি, সব ওআর্ডারও একরকম নয়। সবাই একরকম হলে মানুষকে প্রায় দম বন্ধ হয়েই মরতে হতো। বৈচিত্র্য যে ওর ভিতরেও আছে, একটু বাদেই তা টের পেলাম। একটি কয়েদী, সে জেলের মেথর, ঘরের প্রস্রাবের টুকরি পরিষ্কার করতে এল—সাহেব ভালো, মেথর নিজের হাতেই চাবি খুলে ঘরে ঢুকলো। কানের কাছে মুখ এনে একরকম শব্দবিহীন আওয়াজে—এ যে কি বস্তু তা জেলের বন্দী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না—বলল, পায়খানার নাম ক'রে বাথরুমে যান, সেখানে দেয়ালে কি লেখা আছে পড়বেন।

একটু পরে সাহেবকে বললাম, পায়খানায় যাব। দরজা খুলে আমার স্পেশ্যাল ওআর্ডার পেছন পেছন চলল। বাথরুম বটে, কিন্তু প্রায় সবই খোলা। স্পেশ্যাল ওআর্ডার নজর রাখবার জন্য আর ভিতরে এল না, এইটুকু কৃপা করল। দেখি, দেওয়ালে কয়লা দিয়ে লেখা—ডাক্তার কোথায়, কেমন আছেন? রাসবিহারী-বাবু কোথায়? অতুল ঘোষ ধরা পড়েননি তো? এখনও বিদেশ থেকে অস্ত্র-পাতি আসার কোনোও সম্ভাবনা আছে কি? এমনি, দেওয়ালভরা আরও অনেক প্রশ্ন।

মেথরটি ঝুপ ক'রে কোথা থেকে এসে এক টুকরো কয়লা হাতে দিয়ে চট্ ক'রে সরে পড়ল। প্রশ্নগুলো সব জল দিয়ে ধুয়ে ফেললাম। কে কোথায় আছেন, তা আর লিখলাম না, সবাই যে ভালো আছেন, তাই লিখলাম, এবং আর কিছু আশা করবার নেই, সে কথাও। পরে জেনেছিলাম, প্রশ্নগুলো লিখেছিলেন সিলেটের দেবেন চৌধুরী। আমার ঠিক পাশেই চার নম্বর সেলে ছিলেন।

রাজবন্দীদের বিকেলের খাবার এল—এনামেলের প্লেটে সাজানো ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ, ডিম সেদ্ধ ইত্যাদি। আমারও খাবার এল—সে আলাদা—বিচারাধীন বন্দীর খাদ্য, একটা বালতিতে ক'রে ভাত, আর একটা বালতিতে ডাল এবং একখানা বড় বাক্সের ডালার মতো একটা পাত্রে তরকারি নামধারী এক-একটা শাকের ডেলা। সে কি শাক জানি না, চিবুলে জলের মতো একটা কিছু ছাড়া আর কিছু গলার তলায় যায় না। আমার জন্য এক লোহার থালায় খাবার তুলল।

খাবার যখন এসেছে, বর্তমান সিমলা ব্যায়াম সমিতির অমর বোস তখন বেড়াচ্ছেন। নিঃশব্দে খাবারের থালাগুলোর কাছে এসে তিনি দাঁড়ালেন—ইউরোপিয়ান ওআর্ডার না দেখার ভান ক'রে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল।

ফতে বাহাদুর দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, কিছু বলল না। অমরবাবু কোনো থেকে কিছু ভাত, কোনো থালা থেকে কিছু তরকারি, বোধ হয় নিজের থালা থেকেই মাছ-ডিম সবটা আমার লোহার থালায় তুলে দিতে কয়েদীটিকে ইঙ্গিত করলেন। দেওয়া হয়ে গেল দেখে আবার বেড়াতে লাগলেন। মনে হল, এঁদের ভালো কাপড়-চোপড় থেকে সন্দেহ করবার কিছু নেই। তখনও তো কারও নাম বা পরিচয় জানিনে।

পরদিন থেকে দেখতাম, হয় অমরবাবু, না হয় ময়মনসিংয়ের মণি চৌধুরী (বর্তমানে কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের সেক্রেটারী) ক্যারিক বা ডিসেণ্ট বলে যে দুটো নামকরা শয়তান ওআর্ডার ছিল, তাদের ডিউটি না থাকলে রোজই এই কাজটি করতেন।

ঐ বেলায় আমার খাবার নমুনা দেখে ফতে বাহাদুর বুঝে নিল, বেশ খেতে পারি। সে ডিউটিতে থাকলে লপসিই হোক, ডালই হোক, প্রচুর পরিমাণে নিয়ে আসত।

ফলে, ঐ বিচারাধীন এক মাসে ১২২ থেকে আমার ওজন দাঁড়াল ১৪০ পাউণ্ড। অফিসার মহলে বেশ একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। এটা ব্রিটিশ আমলের জেলের ছিল একটি সনাতন চাতুরি। পুলিশের হাজতে প্রায়শ প্রথম দুই সপ্তাহ কাটাতে হয়। তখন লালবাজারে যা খাদ্য পেতাম, সে কথা আগে বলেছি। এরপর পেটপুরে খাদ্য পেলে ওজন বাড়বেই। আর বাইরে থেকে জেলের বন্দীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যখন প্রশ্ন হতো তখনই সরকারী জবাব আসত, জেলে প্রবেশের সময় বন্দীর ওজন ছিল এত, বর্তমান ওজন এত

সন্ধ্যাবেলা ৬টায় ওআর্ডার বদলি হল। যে এল তার নাম রবার্টসন, বুড়ো-মানুষ, রসিক লোক, কিন্তু বদরসিক। তবে একে মাঝে রেখে, এর সঙ্গে আলাপের উপলক্ষ্য ক'রে আশপাশের রাজবন্দীদের পরস্পরের এবং আমার সঙ্গে আলাপ চললো। নামে জানতামও অনেককে। এখন পরিচয় হল। এমন কি উপরের ঘরগুলোতে কে কে আছেন পাশের বন্ধুরা তাঁদের পরিচয় দিলেন।

পরদিন অন্ধকার থাকতে ঘরের দরজা খুলল, একজন ক'রে বাথরুমে, আর একজন ক'রে ভোরের এক্সারসাইজের জন্য বের হতে লাগলেন। সকাল সাড়ে আটটা আন্দাজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এল—মেজর টমসন, ভারতবাসীর প্রতি ঘৃণা ও ঔদ্ধত্য এবং অসৎ ও অত্যাচারী স্বভাবের জন্য লোকটি খ্যাতি অর্জন করেছিল। একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন ইয়ার্ডের মধ্যে ঢুকবে,

দরজার কাছ থেকে একটি কয়েদী মেট বা পাহারাওয়ালা চিৎকার ক'রে বলবে 'সরকার সেলাম'। আর যে যেখানেই থাকুক, সবাইকে দুখানা হাত কনুই ভেঙে বুকের পাশে আঙুল ছড়িয়ে তুলে ধরতে হবে।

আমি ব্যাপারটা জানিনে। লক্ষ্য করলাম, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঢুকবার বেলায় যিনিই সামনের মাঠে বেড়ান, তিনিই ঐ রকম করেন। তখন বুঝলাম, ঐটিই রেওয়াজ। আমি ঘরে বন্ধ, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাপারগুলো দেখি। হাত যেমন থাকবার থাকে, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এসে দু'একটা কথা বলে যায়, কোনোদিন কিছু বলে না, জেলার ছিলও না। একদিন কোনো এক ইউরোপিয়ান ওআর্ডার এসে বলে, হাত তুলে দাঁড়াও। মনে মনে বলি, দায় পড়েছে!

আমার ঘরে সারারাত আলো জ্বলে, বেজায় পোকা ঢোকে। ঘুমের ব্যাঘাত আমার বিশেষ কিছুতে কোনো কালেই হয় না। তবু সেদিন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এসে যখন বলে, কিছু চাই? আমি বলি, হয় রাতে আলো নিভিয়ে দাও, নয়তো মশারি দাও।

ও বলে, You can have neither.

আমি পেছন ফিরে নিজের জায়গায় এসে বসি, ও চলে যায়।

কিন্তু মজা এমন, সেই দিন থেকে আলোটা হঠাৎ এমন নিস্তেজ হয়ে গেল যে ঘরে আর পোকা ঢোকে না।

দু-একদিন যায়, আবার একদিন এসে টমসন জিজ্ঞাসা করে, Do you want anything?

সোজা বলি, No.

টমসন চলে যাবার পর সেই রবার্টসন হৈ চৈ শুরু করল। দেবেনবাবুকে বলে, —দেখলে, সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে কি রকম অপমান করল? কিছু নেই, অথচ সাহেব জিজ্ঞাসা করল, কিছু চাই? বলল, না।

আমি বলি, অপমান আবার কিসে করলাম?

দেবেনবাবু বললেন, আপনি বরং মাঠে বেড়াবার অনুমতি চান। তিনিই রবার্টসনকে বললেন, তুমি লিখে পাঠাও যে, উনি বেড়াতে চান।

তাই লেখা হল। আধ ঘণ্টাখানেক বাদে জবাব এল, পুলিশকে জানানো হয়েছে।

আশপাশের বন্ধুরা একটু আশ্চর্য হলেন, তবে কিছুই আশ্চর্য নয় এমন ভাবও দেখালেন।

একদিন বাদে হুকুম এল, হুকুমখানা সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে লেখা। বার্বার বলে একজন ওআর্ডার ছিল তখন ডিউটিতে। সে পড়ল। মর্ম এই—সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যতক্ষণ জেলে হাজির থাকবে, ততক্ষণের মধ্যে দেওয়ালের পাশে এবং দরজায় বিশেষ কড়া পাহারার ব্যবস্থা রেখে পনেরো মিনিটের জন্য আমায় বের করা যেতে পারে বেড়াবার জন্যে। হিল এল। বার্বারকে নিয়ে চারদিক ঘুরে দেখে কি পরামর্শ করল, কি ব্যবস্থা ক'রে গেল।

হিল চলে গেলে ফতে বাহাদুরকে দাঁড় করাল ইয়ার্ডের ফটকে, একটা মেটকে বাথরুমের কাছে, আর একটা কয়েদীকে দেওয়ালের কাছে এক জায়গায় একটা রান্নাঘর ও কাঁঠালগাছ আছে যেখানে, আর মেথরটিকে দাঁড় করাল আর একপাশের দেওয়ালের কাছে, তার পর এসে আমায় ঘর খুলে বের ক'রে হেসে জিজ্ঞেস করে, Do you think you can scale over that wall ? আমিও হেসে জবাব দিই, Why not ?

বেচারী চেয়ার ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। ঐ পনেরো মিনিট আমি একটি প্রদর্শনীর বস্তু হয়ে ঘুরলাম। এর পর বোধহয় ২০।২২ দিন ইউরোপিয়ান ওআর্ডে ছিলাম। রোজই ঐ ব্যবস্থা।

জেল লাইব্রেরী থেকে বই আসে। আজেবাজে বই যা পাই, তাই পড়ি। 'লা মিজারেবল্'খানা আগে পড়েছি, বায়োস্কোপেও দেখেছি। কিন্তু এখন পড়ে যত ভালো লাগল, তেমন আগে লাগেনি।

আশপাশের বন্ধুদের মধ্যে দেখি, এক অমর বোস আর ময়মনসিংয়ের সুধীন রায় ছাড়া আর সবাই কৌপীনবন্ত এবং কাপড় অর্ধেক ক'রে ছিঁড়ে কাছা না দিয়ে পরেন, কেউ কেউ গেরুয়া রংয়ে ছুপিয়ে। দেবেনবাবু লম্বা চুলও রেখেছেন। প্রথম যখন বুঝলাম যে এঁরাও বন্দী, তখন মনে হয়েছিল কোনো আশ্রমের ব্রহ্মচারীদেরই বুঝি ধরে এনে রেখেছে। এঁরা প্রায় সেই রকমই জীবনযাপন করতেন। দেবেনবাবু তো একটা গ্রহণের দিন সমস্তটা ক্ষণ গীতা আর চণ্ডী বেশ উচ্চ রবে পড়ে কাটিয়ে দিলেন। এঁদের সবারই মুখের উপর যেন কেমন একটা ম্লান ছায়া এসে পড়েছে। তবে কাপড় ছিঁড়ে পরার একটা কারণ পরে আবিষ্কার করলাম। প্রেসিডেন্সি জেলে রাজবন্দীদের তখন কাপড় ইত্যাদি দেয় না। চিঠিপত্রও একান্ত বিরল এবং অনিয়মিত। রাজবন্দী হয়ে বাড়ি থেকে কাপড় আনিয়ে পরাও অনেকে অন্যায় মনে করেন।

কেবল অমরবাবুকে আর সুধীনবাবুকে দেখি, ওর মধ্যেও মোটামুটি ফিটফাট,

প্রফুল্ল। সুধীনবাবু মাঝে মাঝে মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে, বোধ হয় আমার তখনকার দিনের পালোয়ানী চেহারা দেখে, বুকের উপর বাঁ হাত রেখে ডান হাত দিয়ে ঠুকে আমায় চ্যালেঞ্জ জানান। আমি নিঃশব্দে হেসে সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করি।

একদিন দুপুরের পরে আমার ডাক পড়ল জেলের ফটকে। দেখি, দশ-বারোজন বন্ধুবান্ধবকে জেলের বিভিন্ন স্থান থেকে ও অন্যত্র থেকে নিয়ে এসেছে সনাক্ত করণের জন্যে। তার মধ্যে আছেন অধ্যাপক শরৎ ঘোষ, অধ্যাপক বিপিন দে, সাংবাদিক সুরেন সিংহ এবং আরও কয়েকজন। চোখ-মুখের অবস্থা প্রায় কারও সুবিধার নয়। গোল্ডি, হিল ছাড়া জনকতক বাঙালী অফিসারও আছে এক পাশে। আমরা যখন সবাই একত্র জড় হয়েছি, একজনকে ধরলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'সব স্বীকার করেছ কেন?'

'কি করব? দেখুন, অ—বাবু সব বলে দিয়েছেন।'

এই অ—বাবুও সেখানে হাজির ছিলেন।

'অ—বাবু বলে দিয়েছে বলে তোমাকেও বলতে হবে? দালান্দা হাউজে গিয়ে কাগজ চেয়ে নিয়ে আজই লিখে পাঠাবে, যা কিছু বলেছ, পুলিশের তাড়নায় বলেছ, সব মিছে কথা। আজই লিখবে, তা নইলে মরবে।'

'নিশ্চয় লিখব।'

বন্ধুরা সবাই নীরব। আমি একাই কথা বলছি। কাজেই হিল-এর নজর সহজেই পড়েছে আমার দিকে। গটমট ক'রে এসে জিজ্ঞেস করল, 'You are talking to him?'

'Why should I not?'

তখন এক হাতে আমায় ধরল, আর এক হাতে বন্ধুটিকে ধরল, টেনে নিয়ে গোল্ডির কাছে হাজির করল।

'Mr. Goldie, he was talking to him.'

গোল্ডি একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নিচু ক'রে বলল, 'All right, I take note of it.'

আমরা যত জন, ততজন উড়িয়াকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এল। আমাদের এক-একজনের পাশে পাশে ওদের এক-একজনকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ২০।২৫ জনের এক লাইন করল। এ রকম বাইরের লোক মেশানোর কি অর্থ হয় বুঝলাম না। বাঙালী ভদ্রলোকের আর উড়িয়া ঠাকুর চাকরের তো চেহারা থেকেই আলাদা ক'রে ফেলা যায়। আমার কিন্তু জাঙ্গিয়াটা ঢেকে দেবার জন্য

কোথা থেকে একটা ধুতি আর একটা বোতামহীন শার্ট এনে পরিয়ে দিল। জাঙ্গিয়াও ধুতির ভিতর দিয়ে দেখা যায় আর জামা-কাপড় দেখলেই বোঝা যায়, এসব আমার নয়, অত্যন্ত অস্বাভাবিক রকমে সাজানো হয়েছে।

সাক্ষী যাদের একে একে আনল, সবাই আমার দিকে বিশেষভাবে তাকাল, কিন্তু কেউই সনাক্ত করল না। কাউকেই করল না। কেবল একটি বিহারী ছোকরা কনস্টেবল বিপিনবাবুকে দেখিয়ে বলল, 'আমি এই বাবুকে গুলি ছুঁড়তে দেখেছি।'

গোল্ডি বলল, 'ভালো ক'রে দেখ।'

কনস্টেবলটি জোর দিয়ে বলল, 'আমি নিশ্চয় দেখেছি।'

মামলা কিন্তু কারো নামেই হল না।

দু সপ্তাহ জেলে কাটাবার পর আবার একদিন সকাল সকাল খাইয়ে কোর্টে নেবার জন্য জেল-গেটে নিয়ে গেল। পুলিশের ব্ল্যাক মেরিয়া আসতে দেরি হচ্ছে দেখে এক ঘোড়ার গাড়িতে তুলে দিল। সেই গাড়িতে আর একজনকেও তুলল। তাঁকে নিয়ে যাবে জোড়াসাঁকো কোর্টে, আমায় নেবে বাঙ্কশাল স্ট্রীটে। ভদ্রলোককে আমি চিনতাম। ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে দুখানা হাজার টাকার নোট ভাঙাতে গিয়ে, কাঁটাপুকুর ডাকাতির নোট সনাক্ত হয়ে ধরা পড়েছেন।

গাড়ির ভিতরে ও উপরে পুলিশ পাহারা ছিল। তা গ্রাহ্য না ক'রে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, 'সব স্বীকার করেছেন কেন?'

তিনি অত্যাচারের এক লম্বা-চওড়া কাহিনী ফেঁদে বসলেন। বললেন যে, গোরলে সাহেবের বাড়িতে নিয়ে ব্যাটারি লাগিয়েছে, আরও অনেক কিছু।

বললাম, 'অত্যাচার করবে, এ কি জানা ছিল না? অত্যাচার করলেই স্বীকার করতে হবে?' স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতে বললাম। তা তিনি করেননি। ফলে, কারাদণ্ড ভোগ করেন।

খানিক দূর যেতে সামনে থেকে এক ব্ল্যাক মেরিয়া এসে গাড়ি থামাল। দু'জন সার্জেন্ট ছিল। একজন বলল, 'প্রেসিডেন্সি জেলের কাণ্ড দেখ! এই বন্দী সম্বন্ধে আমাদের লালবাজারে এত সাবধান-বাণী শোনাল, আর একটু দেরি না ক'রে প্রেসিডেন্সি জেল একে এই ছ্যাকড়া গাড়ি ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছে! পাঠিয়েছে কিন্তু হাতকড়ি লাগিয়েই।'

কোর্টে নিয়ে গেল। সেদিনও ঐ অবস্থা। অনেকক্ষণ বাদে যখন গাড়ির

দরজা খুলল, সেই প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, আর সরকারী উকিল সামনে। সরকারী উকিল বললেন, 'আমি এক মাসের সময় চাই।'

ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, 'কেন, সাধারণ এক অস্ত্র আইনের মামলা, বার বার কেন মুলতবী রাখবে ?'

উকিল বলেন, 'বন্দী আমাদের হাতে নেই (অর্থাৎ আমি পুলিশের হেপাজতে না থেকে জেল হেপাজতে), কাজেই অনুসন্ধানে দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, 'না, আমি দুই সপ্তাহের সময় দিচ্ছি।'

আবার গাড়ি বন্ধ, আবার জেল। কোর্টে যাবার আগেই জেলের বন্ধুরা বলেছিলেন; মামলা হবে না, স্টেট-প্রিজনার করবে। এবারে তাঁরা আরও জোর করেই বললেন, স্টেট-প্রিজনারই হবে। চার নম্বর সেলের দেবেনবাবুও মশার পিস্তলসহ ধরা পড়েও স্টেট-প্রিজনার হয়েছেন। ও-যুগে ওরকম অনেকের বেলায় হয়েছিল। ওরা আশা করেছিল এবং আমাদের অনেকবার বলেওছিল, স্টেট-প্রিজনার যাদের করা হয়েছে, তাদের সারা জীবন রাখা হবে।

কথাবার্তা বলা নিষেধ সত্ত্বেও এবং তার সুযোগও বিশেষ না থাকা সত্ত্বেও নানাভাবে কথাবার্তা বলে, বই পড়ে আগের মতোই আরও পনেরো দিন কাটিয়ে দেওয়া গেল। বর্ষা এসে পড়ল। দরজার গোড়ায় বসে মেঘ দেখি, আর আমার গলাতেও গাই—

মেঘের পরে মেঘ জমেছে
আঁধার করে আসে
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।
কাজের দিনে নানা কাজে
থাকি নানা লোকের মাঝে
আজ আমি যে বসে আছি
তোমারই আশ্বাসে।

এর ভিতর দু'দিন দুটো ছোটখাটো ঘটনা ঘটল। দু'টি ইউরোপিয়ান ওয়াডার সংক্রান্ত। দু'টিরই নাম পূর্বে বলেছি। ক্যারিক ছিল সব রাজবন্দী কয়েদী সম্পর্কে অত্যন্ত কড়া, কেবল নিজের সম্পর্কে নয়। অশিক্ষিত মনের এইটি শ্রেষ্ঠ পরিচয়। যেদিনই কয়েদীদের জন্য পাটনাই মটরের ডাল হতো, ও রান্নাঘর থেকে আটার রুটি আর ডাল আনিয়ে খেত। মাইনে যেদিন পেত,

সেদিন যদি আমাদের ওআর্ডে ওর রাতের বেলায় ডিউটি থাকত, নিচের তলায় কারও আর ঘুমোবার উপায় থাকত না। মদ খেয়ে এসে বারান্দায় নেচে বেড়াত আর গান গাইত।

একদিন সন্ধ্যায় বন্ধ করবার বেলায় আমার ঘরে ঢুকল তল্লাশি করতে। আমার জাঙ্গিয়ার পকেটে হাত ঢুকিয়ে, আমার তখনকার দিনের চেহারা সত্ত্বেও, ওর বোধ হয় মদের ঝোঁকে একটু বদরসিকতার খেয়াল জেগে উঠল। আমি ঘরভাঙা চিৎকার দিয়ে বলে উঠলাম, 'What's that?' এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি তালা বন্ধ ক'রে দিল। আর কোনো দিন আমার ঘর তল্লাশি করতে ও আসেনি।

আর একটি ওআডার ডিসেণ্ট। ফতে বাহাদুর ছাড়া আমার আর একজন স্পেশাল ওআডার জুটেছিল কেদাররাম। কাজ-কর্ম তো কিছুই নেই। সে বসে বসে ঝিমুত। একদিন ডিসেণ্ট তাকে বলে, 'তুমি বসতে পাবে না, দাঁড়িয়ে ডিউটি দেবে।'

কেদাররাম বলে, তুমিও ওআডার, আমিও ওআডার। তুমি আমায় হুকুম করবার কে?

ডিসেণ্ট চিৎকার ছেড়ে বলে, আমি হুকুম দিচ্ছি, তুমি দাঁড়িয়ে ডিউটি দেবে। কেদাররাম কথার ঝোঁকে একবার উঠে পড়েছিল। এখন সে সমানই চিৎকার ক'রে বলল, আমি বসে ডিউটি দেব, তুমি যা করবার কর।

সে বসে পড়ল।

এ নিয়ে অফিসে কি হয়েছিল জানি না। কিন্তু সে ডিউটি থেকেও সরল না, দাঁড়িয়েও প্রায় কোনোদিন ডিউটি দিল না, ডিসেণ্ট আর কোনো দিন ওকে ঘাঁটাল না।

একদিন বাথরুমে যাবার পথে কেদাররাম আমায় বলে, আপনার যদি কারও কাছে চিঠিপত্র দেবার থাকে দেবেন।

কুন্তল, চারু, অমর চ্যাটার্জি—ওঁদের খবরের জন্য আমি ব্যস্ত ছিলাম। চিঠিও দিয়েছিলাম, জবাবও পেয়েছিলাম, কোনো গোলমালও তা নিয়ে হয়নি। কুন্তলের জবাবের সংকেতে বুঝলাম, অমরদা তখন নিরাপদে গৌহাটিতে পৌঁছে গেছেন।

কেদাররাম অতি কৃতজ্ঞভাবে জানাল, যাঁর কাছে চিঠি নিয়ে গিয়েছিল তিনি ওকে খুব খাতির-যত্ন ক'রে খাইয়েছেন, এবং দু'টি টাকা দিয়েছেন। দরকার

মতো আবার খবর নিয়ে যেতে বলেছেন। বার বার পাঠানো তখনকার দিনে সুবিধার ব্যাপার নয় বলে আর পাঠাইনি।

এর পরে যেদিন কোর্টে নিল, সেদিন কিন্তু ব্ল্যাক মেরিয়ার দরজা খুলে আমায় কোর্টের ভিতর নিয়ে গেল। কোথা থেকে যে ছয়টি সার্জেণ্ট বাছাই ক'রে এনেছিল জানিনে—ইংরেজের চেহারা নয়, জার্মান চেহারা, সাড়ে ছয় ফুট ক'রে লম্বা—সবগুলোই প্রায় সমান। দু'জন আগে, আর চারজন পেছনে। আসামীর কাঠগড়ায় আমায় ঢোকাল না, জীবন্ত কাঠগড়া হয়ে ওরাই দাঁড়াল। ওদের ফাঁক দিয়ে দেখলাম; আমার নাম ডাকতে, উকিলদের মাঝখানে বাবা উঠে দাঁড়ালেন, আমায় দূর থেকে দেখতে চেষ্টা করছেন।

কিন্তু দু'মিনিটের বেশি আমার কোর্টে থাকা হল না। এই কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেটটি বাঙালী, তবে তাঁকে বিশেষ কিছু করতে হয়নি। সরকারী উকিলই এসে বললেন, 'You are discharged.' হাতের হাতকড়ি খুলে দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুকের উপর একটি চাপড় দিয়ে বললেন, But you are re-arrested under the Defence of India Act.

সেই সার্জেণ্টরা আবার আমায় ফিরিয়ে নিয়ে এসে ব্ল্যাক মেরিয়াতে ঢোকাল। নতুনের মধ্যে হল হাতকড়িটি খসে গেল।

এবারে নিয়ে গেল আবার সেই ইলিশিয়াম রোতে (বর্তমান লর্ড সিংহ রোড)। কয়েকজন অফিসারের মাঝখানে একখানা খালি চেয়ারে বসতে দিল। ইসমাইল বলে একটি অফিসার কয়েকখানি ফটো নিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, এঁদের চেনেন ?

আমি বললাম, একবারই তো বলে দিয়েছি, আমি কোনো প্রশ্নের জবাব দেব না।

সামনের একটা চেয়ারে বসে নলিনী মজুমদার মোটা একটা খাতার পাতা উলটাচ্ছিল। বলে উঠল, There are more than 50 statements against Bhupen Datta. সাহেবকে বলে দিল 'regulate' ক'রে দিতে। এই ছিল ওদের তখনকার দিনের ভাঁওতা ও ভাষা। More than 50 statements বললে ঘাবড়ে যাব, আর 'regulate' করা মানে Regulation III-তে সারা জীবন স্টেট-প্রিজনার ক'রে রাখবে।

একটি মারাঠী অফিসার ঘরে ঢুকল। আমার দিকে দেখিয়ে পাশের একটি লোককে জিজ্ঞেস করল, Why has he been arrested ?

সে জবাব দিল, ওঁকেই জিজ্ঞেস কর, he speaks English perhaps better than you do.

তখন ন্যাকামি ক'রে আমায় জিজ্ঞেস করে, Why have you been arrested? What's the charge against you?

আমি বলি, You know that better than I do.

আর কথা না বলে সে সরে পড়ল। এর পর ফটো তুলল, আঙুলের টিপসই নিল। তারপর উপরে নিয়ে গেল গোল্ডির কাছে। সে বলে, You still refuse to answer questions by a foreign Government's officers?

Yes.

এর পর বোধ হয় আমার নামে Defence Act-এর অর্ডার সই করতে করতে বলে—'Will you tell me where is Nawab Habiulla Saheb?'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

নবাব হবিউল্লা সাহেব আমাদের ভিতর কারও নামই ছিল না। দালান্দা হাউজে তখন ছিলেন এক বন্ধু, টাকি-সৈদপুরে বাড়ি, শ্রীআশুতোষ রায়চৌধুরী। তিনি পুলিশের এবং অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ ক'রে ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জি সম্পর্কে পুলিশ যত রকম খবর পেয়েছে, সব সংগ্রহ ক'রে গোপনে আমায় পাঠিয়েছিলেন—যাদুদার নামের বদলে নবাব হবিউল্লা সাহেব নামটি ব্যবহার করেছিলেন। যে-বৃহস্পতিবার আমি ধরা পড়ি, তার পরের শনিবার আমার গৌহাটিতে যাবার কথা ছিল, সেখানে যাদুদার সঙ্গে দেখা হবে, চিঠিটা তাঁকে দেখাব বলে নষ্ট না ক'রে পকেটেই রেখে দিয়েছিলাম, ধরা পড়ার সময় চিঠিটাও ধরা পড়ে। তবে তাতে অন্য অনিষ্ট হবার মতো কিছু ছিল না।

নিচে নিয়ে এল। গাড়ি তৈরি করছে, আমি দাঁড়িয়ে আছি। ইন্‌স্পেক্টার কালিসদয় ঘোষাল বলল, ভূপেনবাবু, রোদে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? এখানে ছায়ায় এসে দাঁড়ান। কাছে গেলে বলল, অনিষ্ট হয় এমন কিছু আমি বলতে বলছিনে, দু'-একটা প্রশ্ন আপনাকে করবো?

আমি বললাম, Have you been asked to interrogate me?

ও বলল, আমার authority কিছু আছে কি না যদি জানতে চান, তা হলে বলি, আছে।

তারপর একটু ঢোক গিলে মৃদু স্বরে বলল, জিজ্ঞেস করতে পারি?

You may not.

আচ্ছা, থাক, থাক।

আবার জেল। বন্ধুরা উৎফুল্ল, কারণ মামলা গেল, এখন থেকে হয়তো স্বদলে পাবেন।

একটু বাদে কিন্তু জেলার এল। আমায় নিয়ে চলল অন্য কোথায়। এই যে কথা প্রায় না বলেও বন্ধুত্ব, সেই বন্ধুত্বের মায়া ছেড়ে যেতে একটু কেমন লাগল। যে দু'টো ঘরের দিকে একটু দৃষ্টি দিতে পারি, তার অধিবাসীদের সঙ্গে চোখে চোখে বিদায় নিলাম।

এসে ঢুকলাম বিখ্যাত ৪৪ ডিগ্রীতে। দেখলাম, আমার আগে আগে একটা মেট সব সেলের সামনের কাঠের দরজাগুলো বন্ধ ক'রে দিতে দিতে চলেছে। ওখানকার ঐ রেওয়াজ—কথা তো বলতে পাবেই না, কেউ কারও মুখও দেখতে পাবে না। আমায় নিয়ে যে-ঘরটায় ঢোকাল. সেটা ২১নং সেল, ফাঁসির কামরা। সেলে ঢোকবার পর আধ মিনিটখানেকের জন্য আমার সেলেরও দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বুঝলাম, আমার এই ঘরে আর কেউ ছিলেন, আমাকে ঢোকাবার আগে তাঁকে ২২নং-এ ঢুকিয়েছে। তারপর তাঁকে আমার ঘরের সামনে দিয়ে অন্যত্র চালান করেছে। আমার ঘরের সামনে দিয়ে যেতে যে-সময়টা লেগেছে, সেই সময়টা আমার ঘরেরও দরজা বন্ধ হল। পরে শুনলাম, তাঁকে নিয়ে গেল ইউরোপিয়ান ওআর্ডে আমি যে-সেলে ছিলাম সেই সেলে। এবং তিনি ছিলেন আমাদের কিরণ দা—কিরণ মুখার্জি।

আরও শুনলাম, মেদিনীপুর জেলে একটা ছয় দিনের হাঙ্গার স্ট্রাইক হয়ে গেছে। তখন অনেককে সেখান থেকে অন্যান্য জেলে সরিয়ে দিয়েছে। তার ভিতর কিরণদা এসেছেন প্রেসিডেন্সিতে।

একটু বাদে সেই ইউরোপিয়ান ওআর্ডার রবার্টসন এল। এসে বল্লে, 'দেখুন, এই যে ভদ্রলোক ছিলেন এখানে, বয়স্ক লোক, হাত ভাঙা, পা ভাঙা। ওঁর যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সর্বপ্রকারে আমরা সেই চেষ্টা করতাম, আর উনি করতেন কি জানেন ?' সেলের তালা বন্ধ করার জায়গায় যে একটা ঘুল-ঘুলি মতো থাকে, সেইটে দেখিয়ে বল্লে, 'উনি এখানে পা দিয়ে ঐ অ্যান্টিসেলের দেওয়ালের ওপর দিয়ে ওপাশের সেলের লোকের সঙ্গে কথা বলতেন। আপনি যেন আবার ঐরকম দুষ্টুমি করবেন না।'

মনে মনে বললাম, পাগলা সাঁকো নাড়িসনে। বেশ পন্থাটা দেখিয়ে দিল !

এইবারে সত্যি সত্যি সেলে এলাম। বোধ হয় হাত সাতেক লম্বা, হাত পাঁচেক পাশে এক একটা ঘর। সামনে লোহার গরাদে দেওয়া দরজা, তার সামনে অতটা সাইজেরই একটা দেওয়ালে ঘেরা জায়গা, তার উপরে ছাদ নেই। এইটেরই নাম অ্যান্টিসেল। তারই সামনে ঐ কাঠের দরজা—যা অপর রাজনৈতিক বন্দী যাবার আসবার সময় দিনে পঞ্চাশবার বন্ধ হয় আর খোলে।

আমার স্পেশাল ওআর্ডার থাকাতে সুবিধা ছিল—আমার সেলের দরজা নেহাত ডিসেণ্ট বা ক্যারিক থাকলেই বন্ধ করত।

সেলের মেঝেতে যুগযুগান্তের স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টায় অথবা বড় সাহেব আর জেনারেল সাহেবকে দেখাবার আগ্রহে এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি পুরু ক'রে চুনের পোঁচ পড়েছে। হাওয়া প্রবেশের জন্য সামনের ঐ দরজাই যতটা সাহায্য করে—তারও সমান্তরাল কোনো জানালা নেই, আবার অ্যান্টিসেলের একটু পরেই জেলের বাইরের উঁচু দেওয়াল। কাজেই হাওয়ার বালাই সেলে প্রায় নেই। যা আছে, তাতে বরং অসোয়াস্তিই সৃষ্টি হয় বেশি। কারণ, এখানে আলাদা বাথরুম না থাকাতে ঘরের টুকরিই সম্বল—হাওয়া যেটুকু ঢুকতে পারুক বা না পারুক, ওরই সুবাস বহন ক'রে আনে। এই হাওয়ার অবস্থা। আর আকাশ দেখতে হলে খাটখানাকে টেনে দরজার সামনে নিয়ে আসতে হবে। তাই নিয়ে আসতাম, কারণ, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের গরম। একখানা হাতপাখা অবশ্য দিয়েছিল।

রাত্রে পড়বারও এখানে উপায় ছিল না। কারণ, হ্যারিকেন থাকত ঘরের বাইরে। দরজার কাছে খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে সেই আলোতেই পড়াশোনা যা করবার করতে হতো।

ঘরে খাবার জলের একটা কুঁজো ছিল। কিন্তু সারা দিনের স্নানের, কাপড় কাচার, বাসন মাজার জন্য এক বালতি জল ঐ অ্যান্টিসেলে দিয়ে যেত। আমার আরও একটা সুবিধা ছিল। বাসন মাজার কাজটা আমার নিজের করতে হতো না—স্পেশাল ওআর্ডার ওটা কোনো কয়েদীকে দিয়ে করিয়ে নিত। কাপড়ের বালাই তো ছিলই না। জাঙ্গিয়া ছাড়া একটা তোয়ালে দিয়েছিল।

সেইদিন সন্ধ্যাতেই বাবা এলেন দেখা করতে। জেল গেটে ডাক পড়ল। বাবা জালের দরজার ওপাশে, আমি এপাশে, আর আমার পাশে দাঁড়িয়ে বনবিহারী মুখার্জি—তখন বোধ হয় সাব-ইন্‌স্পেক্টর।

অন্য কথার ভিতর বাবা বললেন, ওঁরা বলছেন, তুমি যা জান, সব যদি স্বীকার কর, তা হলে তোমায় স্বগৃহে আবদ্ধ রাখবেন।

বনবিহারী মাথা নিচু ক'রে বলছে, হাঁ সেরকম আমরা ক'রে থাকি।

ওর এই মাথা নিচু ক'রে থাকার সুযোগ নিয়ে বাবা সঙ্গে সঙ্গে সজোরে মাথা ও চোখ নেড়ে সাবধান ক'রে দিলেন, খবরদার, কিছু যেন না স্বীকার কর।

আমি বললাম, আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

সেইদিন আমার সম্পত্তি হল। বাবা একটা ট্রাঙ্কে ক'রে কিছু কাপড় জামা জুতো বাসনপত্র এবং রামায়ণ মহাভারত ও অন্যান্য কিছু বই দিয়ে গেলেন।

থালা বাটি এল, বই গেল সেন্সারে, এবং এখন আমি কাপড় পরতে পারি কি না, তার অনুমতি সাপেক্ষে কাপড়গুলো গেটে জমা হল। পরদিন পুলিশের অনুমতি নিয়ে সেগুলো আমায় পাঠিয়ে দিল।

৪৪ ডিগ্রির ব্যাপার সব আলাদা। প্রথম এগারোটা সেলে তখন থাকে দলের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ছিল, কিন্তু স্বীকারোক্তি করেছে, তেমন সব লোক। সিপাই কয়েদীর কাছে জানলাম, এদের কয়েকজনকে মাঝে মাঝে দুপুরবেলা জেল-গেটে ডেকে নিয়ে যায়—সি. আই. ডি অফিসাররা খাবার, কাপড়-জামা সব নিয়ে আসে—আর এদের কাছ থেকে জেলের অন্যান্য বন্দীদের সম্পর্কে সব খবর সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যায়। সিপাই কয়েদীরা এদের অত্যন্ত ঘৃণা করে। অন্য ইয়ার্ডে যে সব ইউরোপিয়ান ওআর্ডারের ব্যবহার ভালো, এদের ভয়ে এখানে তাদের ব্যবহারও খারাপ।

এর ভিতর একজন ছাড়া আর সবাই ছিল একটা ভিন্ন দলের লোক। কাজেই নাম শুনেও কাউকে চিনতে পারলাম না।

এদের এগারোটা সেল বাদ দিয়ে ২১নং-এর দিকে ছিলেন প্রথম চারজন মুসলমান রাজবন্দী। এঁরা সবাই মৌলানা আজাদের পরিচিত কর্মী—দু'জনের বাড়ি বোধ হয় ছিল রাজসাহীতে।

তার পরের সেলগুলিতে ছিলেন সঞ্জীব ব্যানার্জি—রাসবিহারী মনে ক'রে এঁকে পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে কোনো জাহাজে ধরেছিল। ধরে রেঙ্গুন জেলে দশমাস আটক রাখে, তারপর এখানে পাঠিয়ে দেয়। বেশ শিক্ষিত, সদাচঞ্চল, হাসি-খুশি, সুপুরুষ ভদ্রলোক। আর ছিলেন রাধাকান্ত বোস, আমার পূর্বপরিচিত, রাসবিহারীবাবুর আত্মীয়, এবং চন্দননগরে এঁরা এক বাড়িতেই থাকতেন। আমি প্রেসিডেন্সি জেলে থাকতেই ওঁকে কোন্ দ্বীপে অন্তরীণ করবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। শিয়ালদ' স্টেশনে পুলিশের অমনোযোগের সুযোগ নিয়ে এক ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে বরাবর চন্দননগরে পৌঁছে যান। এবং শেষ পর্যন্ত চন্দননগরেই

থাকেন। আর ছিলেন সুরেশ দাসের সম্পর্কিত দুই ভাই। সুরেশবাবু মাকে ও স্ত্রীকে নিয়ে চন্দননগরে এক বাড়ি ভাড়া ক'রে ছিলেন পলাতকদের আশ্রয় দেবার উদ্দেশ্যে, আর ভাই দু'টি ঘিয়ের ব্যবসা করতেন। এঁরা রাজনীতির কিছুই জানতেন না। কাজেই অত্যন্ত ম্রিয়মাণ থাকতেন। এঁরা চারজন ছিলেন Ingress into India Act-এর বন্দী ; কারণ, এঁরা ব্রিটিশ ভারতের বাইরের লোক, অথবা বাইরে ধরা পড়েছেন।

আমার ঠিক পাশের সেলে থাকত রানাঘাটের একটি ছেলে, ভারতরক্ষা আইনের বন্দী, এক মাস জেলে থাকবে, তারপর বাইরে অন্তরীণ হয়ে যাবে। প্রথম রাত্রে সে দেওয়ালে পাথার ডাঁটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে জিজ্ঞেস করল আমার নাম কি, কোথায় ধরা পড়েছি ইত্যাদি।

আমিও ঐ উপায়ে জবাব দিলাম, সে সব বোধহয় ধরতে পারল না। শেষ রাত্রে দরজা খুলে দিতে শুনি গান গাইবার অছিলায় ঐ সব প্রশ্নই জিজ্ঞেস করছে। আমার স্পেশাল ওআর্ডার থাকায় সেভাবে জবাব দেবার সুযোগ হল না। পাথার এক অংশ ভেঙে নিয়ে, আগের দিন সন্ধ্যায় একটি ছোট পেরেক কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, তাই দিয়ে সব লিখে এক ফাঁকে দেওয়ালের উপর দিয়ে ফেলে দিলাম।

এখানে বেড়াবার ধরন দেখলাম স্বতন্ত্র। তখন স্টেট-প্রিজনারদের দু'টো শ্রেণীতে ভাগ করেছে—X Class আর Y Class, অধিক আর অল্প বিপজ্জনক। X Class-এ ঐ ইউরোপিয়ান ওআর্ডের ওঁরা—কারও সাথে কারও বাক্যালাপ নিষেধ। আর Y Class-এ ৪৪ ডিগ্রিতে যাঁরা আছেন* তাঁরা। এঁরা সকাল বিকাল যখন বেড়াতে বের হতেন তখন কথা বলতে পেতেন, কিন্তু সবার সঙ্গে সবাই নয়। ঐ প্রথম দিককার সেলে যে ১০।১১ জন ছিলেন, তাঁদের সেল-গুলো যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে সামনের দেওয়ালে মোটা ক'রে একটা চুনের দাগ দেওয়া। ওঁরা ঐ অতটা জায়গা ধরে বেড়াতে পারবেন, আর পরস্পরে কথা বলতে পারবেন। তার পরের মুসলমান চারজনের জন্য ঐ রকম ভিন্ন ব্যবস্থা এবং তারপরের চারজন Ingress into India Act-এর বন্দী—তাঁরাও ভিন্ন। এঁরা দুই দল পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না, কিন্তু ঐ চুনের দাগ মেনে বেড়াতে ও নিজেরা কথা বলতে পারবেন। আর আমি আর ঐ রানাঘাটের ছেলেটি ভারত রক্ষা আইনের বন্দী। আমরা ঐ যার যার অ্যান্টিসেলটুকুর বাইরে যেতে বা কথা বলতে পাব না। একদিকে ১ থেকে

২২নং পর্যন্ত সেল, অপর দিকে ২৩ থেকে ৪৪নং পর্যন্ত। মাঝখানে বসে আছে ইউরোপিয়ান ওআর্ডার। আইন ভেঙে কথা বলতে দেখলেই কয়েদী মেটকে বলে—আর সে চিৎকার করে, "অ্যাই, বাত মাৎ করো।" আর রাজবন্দীরা সব যে যার মুখ ঘুরিয়ে বেড়াতে থাকে।

আমাদের অ্যান্টিসেলের দরজা বন্ধ থাকবার কথা। কিন্তু স্পেশাল ওআর্ডার আমার সেল খুলেই রাখত। আর সেই সুযোগে সঞ্জীববাবু, রাধাকান্তবাবু, মহেন্দ্র ও বিমল (সুরেশবাবুর দুই ভাই) আমার দরজা পর্যন্ত এসে ফাঁকে ফাঁকে কথা বলে যেতেন। মহেন্দ্র ও বিমল যেন আমায় ওখানে পেয়ে খুব একটা বল পেল। রাধাকান্তবাবুও ভারি খুশি। সঞ্জীববাবু বেশ স্বাস্থ্যবান লোক, আমার চেহারা দেখে সেই ইউরোপিয়ান ওআর্ডের সুধীনবাবুর মতো কুস্তির চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যান। ভদ্রলোকের নিজের কতকগুলো ভালো ভালো বই ছিল। লাভ্‌রি বলে একজন নতুন ইউরোপিয়ান ওআর্ডার এসেছে। সে ওখানকার কর্তৃপক্ষের কাছে ভালো ব্যবহার পেত না। আমার কাছে এসে সুখ-দুঃখের কথা কইত। সে-ই আইন ভঙ্গ ক'রে সঞ্জীববাবুর কাছ থেকে বই এনে আমায় পড়তে দিত। রাজবন্দীরা পরস্পরের বই পড়তে পাবে না, এই ছিল টমসন সাহেবের অথবা আই. বি-র হুকুম। খবরের কাগজ তখন রাজবন্দীর পক্ষে বিষ। লাভ্‌রি মাঝে মাঝে স্টেট্‌সম্যান এনে দিত।

আমার স্পেশাল ওআর্ডার কেদাররাম হঠাৎ একদিন বদলী হয়ে গেল। তার জায়গায় এল এক সাঁই পালোয়ান—নাম জগদেও তেওয়ারি। এ লোকটিও দরজা খুলে রাখত, কিন্তু বেশ নজর রাখত, আমি কার সঙ্গে কথা বলি সেই দিকে। বিমল আর মহেন্দ্র আমার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ খুঁজে নিত। আর জগদেও জিজ্ঞেস করতে শুরু করল, এরা নিশ্চয়ই আপনার চেনা। আমি যত বলি, এখানেই চেনা হয়েছে, ও তত আমায় জেরা করে। আমার কাছ থেকে জবাব পেয়েও শেষ পর্যন্ত যখন খুশি হল না, তখন বেড়াবার সময় হলেই ও বাইরে থেকে দরজাটি বন্ধ ক'রে দিত। এই লোকটির বোধ হয় জেল-বিভাগ ও গুপ্ত পুলিশ বিভাগ দুইদিক থেকে অর্থাগম হতো।

ভারতরক্ষা আইনে সপ্তাহখানেক থাকবার পর একদিন গোল্ডি এল আমার সেলে। একখানা কাগজ বের ক'রে হাতে দিল। তাতে পনেরো বিশটা নাম আছে যাদের সঙ্গে আমি রাজ্যধ্বংসের ষড়যন্ত্র করেছি, আর এ করেছি, তা করেছি এই রকম পাঁচ-সাতটা চার্জ। আমি বললাম, I refuse

to answer these charges. বলল, তাই লিখে দিন। লিখে দিলাম, ও চলে গেল।

পঁচিশ দিন ভারতরক্ষা আইনে থাকবার পর একদিন জেলার এসে জানাল, আমি ১৮১৮ সালের ৩নং আইনে স্টেট-প্রিজনার হয়েছি। তখনই আমায় ঐ ৪৪ ডিগ্রিরই অপর দিকে ২৩নং সেলে নিয়ে গেল। সন্ধ্যার আগে, অপরেরা তখনও বেড়াচ্ছেন। একটা অসাবধানতার ব্যাপার হয়ে গেল। তাঁদের বন্ধ না করেই আমায় বের ক'রে ফেলল।

বিমল আর মহেন্দ্র করুণভাবে চেয়ে রইল, রাধাকান্ত আগেই চলে গেছেন এবং সরে পড়েছেন। সঞ্জীববাবু নমস্কার জানালেন, আমি সবার প্রতি একটি ক্ষুদ্র নমস্কার জানিয়ে অপর পাশে নির্বাসিত হলাম। শুনলাম, সেদিকে অপর কোন রাজবন্দী ছিল না। সেইদিনই সকালে যাঁকে এনেছে, তাঁর নাম অমৃত সরকার। পরদিন ভোরে এলেন অন্নদা মজুমদার (বর্তমানে অমৃতবাজার পত্রিকায় কাজ করেন)—আমার পূর্বপরিচিত।

পরদিন সকালে ওঁদের সঙ্গে আলাপের সুযোগ হল না, ওঁদের বেড়াবার সময়ই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এসে পড়ল। আমার ঘরে এসে জিজ্ঞেস করল, Suppose, you are kept in this cell for the rest of your life, what will you be doing ?

'I shall be praying for the downfall of this Empire.'

সেইদিন বিকেলেই আমাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে চালান ক'রে দিল।

আলিপুর জেলে

আলিপুর জেলের ভিতরের চেহারাটাই আলাদা। মাঝখানে চওড়া লাল রাস্তা জেলের ফটক থেকে অপর প্রান্তে গোশালা পর্যন্ত গিয়েছে, দুই পাশে লাল রঙের ব্যারাকগুলো, মাঝখানে ফুলের কেয়ারি করা বাগান।

দুপুরবেলা। অফিসে জেলার বা রাজবন্দীদের ভার যে ইউরোপিয়ান সার্জেন্টের উপর, তারা কেউ উপস্থিত নেই। আর একজন সার্জেন্ট আমায় নিয়ে গেল ম্যাজিস্টেরিয়াল সেলে। বলে গেল, আপাতত এখানে থাকুন, তার-পর জেলার বা সার্জেন্ট-ইন্‌-চার্জ এসে যেখানে নিয়ে যাবার নিয়ে যাবে।

একটা গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা লনে শুয়ে বসে কয়েকজন কয়েদী গল্প করছে, দু'একজন ভিজে ছোলা-গুড় দিয়ে খাচ্ছে। প্রেসিডেন্সি জেলে ঐ দুই মাস কাটাবার পর এদের এই নিশ্চিন্ত আরাম দেখে একটু আশ্চর্য হচ্ছি। একজন দেশী সিপাই এসে কাছে দাঁড়াল। কয়েদীরা অপর জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে এক বিশেষ কুটুম্বে পরিণত ক'রে ব্যাখ্যা করল, টমসনের রাজত্বের চেয়ে এখানে আমরা অনেক সুখে আছি। মুলভেনি সাহেব বেজায় কড়া সাহেব, কিন্তু অমন সাহেব হয় না। এটা কি জেল বাপু? এটা আমাদের শ্বশুরবাড়ি। ঘণ্টা দুই এদের সঙ্গে গল্পে বেশ সময় কাটলো।

চারটের সময় রায়ান সাহেব এলেন। অল্প কথার মানুষ, বললেন, Please come with me, Babu.

কাছেই Misdeamnant Yard—এখন সেটার নাম হয়েছে বোমা ডিগ্রি। দরজা খুলতেই যে দৃশ্য দেখলাম, সে আমার কল্পনার অতীত। একটা মোটা-সোটা ষোল-সতেরো বছরের ছেলে চিৎকার ক'রে লাফিয়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরল, টানতে টানতে বারান্দায় তুলল। পরে জানলাম, এ আমাদের হরিদার ভাই মাখন চক্রবর্তী। হারি এও সঙ্গে ধরা পড়েছে।

বারান্দায় উঠতে একজন বৃদ্ধ শিখ (হাওড়া গুরদোয়ারার দেওয়ান সিং)* কতকটা যেন আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে কাঁধে হাত দিয়ে ধরলেন। আর একজন দীর্ঘাকৃতি শিখ (কর্পোরেশন স্ট্রীট ডাকাতির চেৎসিং) ভজন গাইছিলেন আর চুলের জটা ছাড়াচ্ছিলেন—একটা প্রাণখোলা হাসি দিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

ইতিমধ্যে বারান্দার অপর প্রান্ত থেকে খড়ম পায়ে, শুধু গা, মাঝারি-রকমের ভুঁড়ি আর কাঁচা-পাকা গোঁফ নিয়ে সিগারেট টানতে টানতে হেসে আর চিৎকার ক'রে একজন মাখনকে ধমকাচ্ছিলেন, এদিকে নিয়ে আয় না! তিনি সেদিক ছেড়ে আসতে পারেন না—সামনে বড় এক ঝুড়ি লুচি, একখানা খোরায় ভরা রাবড়ি, আর সব বিভিন্ন পাত্রে কাটা পাঁউরুটি, ভাত, তরকারি, মাংস। ইনি খিদিরপুরের শিক্ষক দুর্গাচরণ বোস*। রাজবন্দীদের খাওয়া-দাওয়া দেখা-শোনা করার ভার নিয়েছেন, সম্প্রতি রাতের খাবার বণ্টনে ব্যস্ত।

পাশে আরও দু'জন বসে। এর মধ্যে একজন হাওড়া শিবপুরের ননী গুপ্ত।* এঁর কথা পরে বলব, এখন বলার সময় নেই।—ওদিকে পেছনের দু'টো দোতলার বারান্দা থেকে সমবেত কণ্ঠে ভীষণ চিৎকার চলছে।

পেছনের দরজার দিকে মাখনই নিয়ে গেলেন; রায়ান সাহেব মাঝের দরজাটি খুলে ধরলেন। এই বেআইনী কাজটি এই অত্যন্ত ধর্মভীরু আইরিশ রোম্যান-ক্যাথলিক কর্মচারিটি প্রায়ই করেন। সবার সঙ্গে পরিচয় হল, কোলাকুলি হল। কয়েকজন সুপরিচিত নামের বয়োজ্যেষ্ঠ—তাঁদের পায়ের ধুলো নিলাম। এঁদের ভিতর ছিলেন ময়মনসিং-এর হেমেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরী—পায়ের ধুলো নিতে দিতে এঁর ভীষণ আপত্তি এবং সে-আপত্তি লাফ দিয়ে পেছনে সরে গিয়ে বজায় রাখলেন, তার বদলে দিলেন বুকজোড়া আলিঙ্গন। আর ছিলেন যশোরের বিজয় রায়, বা সে-যুগের বিখ্যাত কবিরাজ মশায় এবং সিমলার অতীন বোস—এঁরই ছেলে অমরকে দেখে এসেছি প্রেসিডেন্সি জেলে। বাপ-বেটা দু'জন দু' জেলে আটক আছেন—অথচ মুখভরা সে কি আনন্দ!

ওদিকে ও-পাশের দোতলা থেকে চিৎকার করছেন আর কয়েকজন। তাঁরা স্টেট প্রিজনার নন—Ingress into India Act and Foreigners Ordinance-এর বন্দী! সবাই চন্দননগরের লোক। তাঁরা রাজবন্দীদের সঙ্গে মিশতে পারেন না। তাঁদের আমার সঙ্গে দেখা করাতে হলে একটা ইয়ার্ডের ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে হয়। রায়ান সাহেব ঠিক অতটা সাহস পান না।

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

এঁদের ভিতর ছিলেন সুরেশ দাস। পলাতকদের আশ্রয় দেবার জন্য তিনি সপরিবারে চন্দননগরে থেকে, এক ব্যবসা শুরু করেছিলেন। তাই রাজবন্দী না হয়ে Foreigners' Ordinance-এ বন্দী হয়েছেন। তিনি চিৎকার করছিলেন, "ভূপেন, ভূপেন, কবে ধরা পড়লা? কুন্তল কই (কোথায়)?"

এঁর ঠিক বিপরীত—আমার পুরানো সহপাঠী সৌরীন (সুপরিচিত নির্যাতিত বিপ্লবী নেতা অবিনাশ চক্রবর্তী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র), স্টেট প্রিজনারদের দ্বারা অধিকৃত দোতলার বারান্দায় শ্রীরামপুরের জিতেন লাহিড়ী ও ঢাকার প্রতুল গাঙ্গুলীর পেছনে দাঁড়িয়ে চোখমুখ ও হাত সমানে নেড়ে ক্রমাগত ইশারা করছেন, তিনি যে আমার পরিচিত, তা যেন আমি কাউকে না জানতে দিই। গুপ্ত সমিতির সংস্কার!

আমি তাঁর ইঙ্গিতের নিষেধ না মেনে জিজ্ঞেস করলাম, সৌরীন, কেমন আছ?

মুখের ভাব পরিবর্তনে বুঝিয়ে দিলেন যেন সর্বনাশ হয়ে গেল।

বাইরের সংবাদে বহুকাল বঞ্চিত বন্দীরা আমায় প্রশ্নের পর প্রশ্নে জর্জরিত ক'রে তুললেন। অধিকাংশ প্রশ্নই করলেন জিতেনবাবু, তিনি আমার বন্ধুবান্ধব অনেককেই চেনেন। সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সমীচীন মনে হল না। সেগুলো পাশ কাটিয়ে গিয়ে অনেকেরই সংবাদের ক্ষুধা যথাসম্ভব মিটালাম।

রায়ান সাহেব ইতিমধ্যে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে চলে গেছেন। দেয়ালের উপর দিয়ে পরস্পরকে দেখা এবং কথাবার্তা চলছে।

অনেকের প্রশ্ন ফুরিয়ে গেছে, অনেকে মনে করলেন, এখন তো আমি থাকবই, পরে নিভৃতে সব জেনে নেবেন। গুর্খা সিপাই সঙ্গে নিয়ে প্রায় সবাই সামনের সেই রাস্তাটা দিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লেন। প্রেসিডেন্সি জেলের অবস্থা ও ব্যবস্থা থেকে সবই পৃথক। এবং প্রেসিডেন্সি জেল থকে আসছি বলেই দুর্গাবাবু আর মাখন আদর ক'রে ডেকে কিছু খাওয়ালেন। খেতে খেতেও কতো সংবাদের আদান-প্রদান হল।

তারপর দরজায় কাকে ডাক পড়ল। মাখন এসে বলল, মনোরঞ্জনদা (গুপ্ত) ডাকছেন। দলের নেতৃস্থানীয় এঁর কথা আগেই জানতাম। কে কোথায় আছেন এটা বলা আমাদের তখনকার দিনের স্বভাবের বাইরে ছিল। সে কথা মনোরঞ্জনদা জিজ্ঞাসাও করেননি। আর সব কথাই তিনি আমার কাছে সবিস্তারে জেনে নিলেন।

যাঁরা বেড়াতে বেরিয়েছিলেন তাঁরা ফিরলেন, হাত-মুখ ধুয়ে সবাই যাঁর যাঁর সেলে রাত্রের মতো বন্ধ হলেন। রায়ান সাহেব ঘরে ঘরে তালা লাগিয়ে সবাইকে 'Good-night' জানিয়ে সে দিনের মতো বিদায় হলেন।

ঘরের ভিতর ডেক-চেয়ার যার যার দরজার কাছে টেনে নিয়ে মাখনের সঙ্গে অনেক রাত অবধি গল্প চলল। এই গল্পের ভিতর দিয়েই জেনে নিলাম—হরিদা, পাটনার ভগবান দাশগুপ্ত, খিদিরপুরের শিক্ষক আশুতোষ ঘোষ,* শ্রমজীবী সমবায়ের রামচন্দ্র মজুমদার এবং বালেশ্বর ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়মের শৈলেশ্বর বসুর ভাই শ্যাম দু'তিনদিন আগেই ওখান থেকে বদলী হয়ে ঢাকা জেলে গেছেন। শৈলেশ্বরবাবু কটক জেলে থাইসিসে ভুগছেন।

আরও জানলাম, হরিদা, মাখন, যশোরের বিজয় রায়, শ্রমজীবী সমবায়ের সুধাংশু মুখার্জি, মনোরঞ্জন গুপ্ত এবং উপরে আর যাঁদের নাম বলেছি—যাঁরা সব ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র সম্পর্কে গোড়ার দিকেই ধরা পড়েছেন—এঁরা সব কিছুদিন আগেও কঠোর নির্জন কারাবাসে নানাভাবে এতকাল ধরে বারাকপুরে এবং প্রেসিডেন্সি জেলে অত্যন্ত দুর্গতির জীবন যাপন করেছেন। এঁদের ভিতর বিজয়বাবু ও সুধাংশুবাবু ছিলেন আলিপুর জেলে। তাঁদের সম্পর্কে মুলভেনি সাহেব রিপোর্ট করেন, এভাবে মানুষ বেশী দিন থাকলে পাগল হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী।

এই রিপোর্টের পরে জেলবিভাগের কর্তার সঙ্গে মুলভেনি সাহেবের বেশ বিবাদ হয়। পরে কিন্তু বাংলা সরকার স্যার সামশুল হুদাকে পাঠান কলকাতার জেল দু'টিতে রাজবন্দীদের অবস্থা দেখতে। ফলে অল্পদিনের মধ্যে আলিপুর জেলে রাজবন্দীদের অবস্থা অনেকটা বদলায়। রাজবন্দীদের পরস্পর কথা বলা তখনও আইনবিরুদ্ধ। কিন্তু সরকারের অনুমোদন নিয়ে মুলভেনি সাহেব ব্যবস্থা করেছেন, স্টেট প্রিজনাররা ম্যাজিস্টেরিয়াল সেলে থাকবেন না, ইউরোপিয়ান সেলে থাকবেন—দুপুরে তিন ঘণ্টা এবং রাত্রে ছাড়া অন্য সময় বারান্দায় ডেক-চেয়ারে বসে পড়াশোনো করতে পারবেন। জেলারকে বলে দিয়েছেন, পরস্পর কথা ওঁরা বলবেনই, শুধু বলে দিও, আমার সামনে বা কোনো বাইরের ভিজিটরের সামনে যেন কখনও পরস্পর কথা না বলেন। এ ছাড়া ইয়ার্ডের বাইরে রাস্তায় বেড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে, খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্বাবধানের ভারও নিজেরা পেয়েছেন।

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

মাখনের মুখে আরও শুনলাম ননীবাবুর কথা। ঢাকা জেলে একবার, আলিপুরে আর একবার নিজের সিগারেট খাবার ম্যাচ দিয়ে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। কোনো গতিকে বাঁচানো হয়েছে। প্রায়শঃ চারপাঁচদিন ধরে কিছু খান না। তারপর একদিন হয়তো তিনচার মগ চা, একখানা দু'খানা বড় পাঁউরুটি খেয়ে নিলেন। এইভাবেই বছরখানেক ধরে কাটাচ্ছেন। বন্ধু-বান্ধবরা খাবার জন্য সাধাসাধি করেন। আমি আলিপুর জেলে যাবার কিছুদিন পরে ননীবাবু ভারত সরকারকে ছয়সাত পাতা জুড়ে এক দরখাস্ত লিখলেন। তার মধ্যে অনেক বিদ্যার পরিচয় আছে, কিন্তু আমি তার অর্থ সব বুঝলাম না। এক জায়গায় লিখেছেন, মুসলমান ধর্মের উদ্ভব অথর্ব বেদ থেকে—অথর্ব বেদের অললা স্তোত্র থেকে 'আল্লা' শব্দের উৎপত্তি। এই সব বাদ দিয়ে দরখাস্তের মর্ম কথা এই—তাঁর বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, যাতে ক'রে ইংরেজ সরকার যেন যুদ্ধে হেরে যায়। তিনি যদি নিয়মিত খেতে আরম্ভ করেন, তা হলেই ইংরেজ হেরে যাবে। তিনি তা চান না, তাই ইংরেজ যদি জিততে চায়, তা হলে ভারত গবর্নমেণ্ট যেন দেখে যে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি না করেন।

ইতিপূর্বেই মুলভেনি সাহেব গবর্নমেণ্টকে জানিয়েছেন, ননীবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে—খালাস দিয়ে দিলে ভালও হয়ে যেতে পারেন। তাঁকে যেন খালাস দেওয়া হয়।

সরকার ননীবাবুকে ছাড়তে চায় না, তাই—বুকানন সাহেব ছিল ইনসপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্স্—তাকে পাঠাল ননীবাবুকে দেখতে। মুলভেনি সাহেব সঙ্গে এলেন। ননীবাবু সাধারণভাবে যা আলাপ করতেন তাতে তাঁকে পাগল বলে মনে হতো না। বুকাননও দেখেশুনে বলল—এ তো বেশ ভালো আছে।

ভালো আছে তো তুমি এসে চার্জ নাও, আমি পারব না।—মুলভেনি সাহেব বলে বসলেন আমাদের সামনেই।

কয়দিন পরে ননীবাবুর খালাসের হুকুম এল।

আলিপুর জেলে ঢুকবার পরদিন থেকে আমার নিয়মিত জেল-জীবন শুরু হল। যে ইয়াডটায় থাকি, সেখানকার সাতটা সেল Y class, অর্থাৎ, কম বিপজ্জনক রাজবন্দীদের জন্যে। বন্ধুরা বলেন, আমাকে ওখানে রাখবে না।

কয়েকদিনের মধ্যে ভারত গবর্নমেণ্টের হোম মেম্বার স্যার উইলিয়াম ভিন্‌সেণ্ট এল আমাদের দেখতে। সঙ্গে এল তখনকার বাংলা গবর্নমেণ্টের অ্যাডিশনাল

সেক্রেটারি কামিং, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মুলভেনি এবং আরও কে কে দু'একজন। আমরা সব যার যার সেলে বন্ধ। ভিন্সেণ্ট আমার নাম জিজ্ঞেস করল। নাম বলতে জিজ্ঞাসা করল, কবে ধরা পড়েছিলেন? তারিখ বলতে পুনরায় বলে, Repeat your name please.

ঘোড়ার মতো মুখে হ হ করে হাসতে হাসতে বলে, Ah, you were arrested somewhere near the Esplanade! You tried to kill the men who arrested you!

আমি বলি, না।

You tried to commit suicide! হ হ ক'রে বিজয়ের হাসি হাসে, আর আমার এ-কীর্তি ও-কীর্তির উল্লেখ করে।

ওর হাসির ফাঁকে ফাঁকে শুনি, কামিং মুলভেনিকে জিজ্ঞেস করছে, Why is this man here?

মুলভেনি বলেন, কি করব? X class-এর ওসব cell তো ভর্তি।

ওরা সবার সাথে দু'এক কথা আলাপ ক'রে চলে গেল। দু'তিনদিন বাদে হুকুম এল সাতুদা (২৪-পরগনা মাহিনগরের সাতকড়ি ব্যানার্জি) অনেকদিন থেকে অসুস্থ হয়ে জেল হাসপাতালে আছেন, তাকে Y class ক'রে আমার এই ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, আর আমায় তাঁর ঘরে পাঠাতে হবে। সেই দিনই পেছনের বাড়ির পাঁচ নম্বর সেলে আমায় নিয়ে যাওয়া হল। মাখন বেচারী একটু দমে গেল। তার হৈ-চৈ করার সাথী রইল না।

এ-বাড়িতে এসে পাশের ঘরে পেলাম সত্যেনদাকে। যাগুরার সত্যেন সেন পিংলেকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকা থেকে ফেরেন। কিছুকাল বাদে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় এঁদের বিচারের জন্য নিয়ে যায়। আমেরিকা-ফেরত রাজসাক্ষী পিংলেকে সনাক্ত করে, পিংলের ফাঁসি হয়ে যায়। কিন্তু নানা ব্যক্তিগত ঋণে আবদ্ধ ছিল বলে সত্যেনদাকে সনাক্ত করেনি, তিনি মামলায় ছাড়া পেয়ে রাজবন্দী হন। দৃঢ়তায় কোমলতায় মেশানো সত্যেনদার মতো মানুষ হয় না। যেমন ভীমকায় তাঁর দেহ, তেমনি বিশাল তাঁর হৃদয়। যে সর্বক্ষণ তাঁর বিরোধিতা করছে তার সম্বন্ধেও তাঁর মুখে একটি নিন্দার কথা নেই। শত্রু-মিত্র সবারই হীনতাকে উপেক্ষা ক'রে তিনি এদিক দিয়ে যেন তাঁর নেতা যতীন মুখার্জির গুণটিকে আয়ত্ত ক'রে নিয়েছেন।

দিনরাত সত্যেনদার সঙ্গে দুষ্টুমি করি। সন্ধ্যা বেলা প্রায় ঘণ্টাখানেক তিনি

নিজের সেলে বসে ধ্যান করেন। তারপর খেয়েদেয়ে ঘর অন্ধকার ক'রে ডেক-চেয়ারটা টেনে সেলের দরজার সামনে বসেন। রাত্রে খাবার জন্য পঁচিশখানা ক'রে লুচি দেয়, অত কে খায়? ওর এক-একটা নিয়ে ড্যালা ক'রে ওঁর ঘরের ভিতর ছুঁড়ে মারি, সত্যেনদা বলেন, দাঁড়া, সকাল বেলা দেখাব'খন।

গায়ের জোরে ওঁর সঙ্গে পারিনে। হয়তো মাঠে বসে আছেন, হঠাৎ পা দুটো ধরে ঘাসের উপর দিয়ে খুব খানিকটা হড় হড় ক'রে টেনে ছেড়ে দি। তাড়া ক'রে ধরে এক-একদিন খা মার লাগান!

বিজয়বাবু, অতীনবাবু, জিতেনবাবু, সত্যেনদা—এঁরা এক কোণে এক কুস্তির জায়গা ক'রে নিয়েছেন—মাঝে মাঝে রায়ান সাহেবকে দিয়ে দরজা খুলিয়ে সুরেশবাবুও এসে জোটেন। সবাই এঁরা পাকা কুস্তিগির। হেমেনদারও কুস্তিতে খুব উৎসাহ, কিন্তু তখন হাঁপানিতে ভুগছেন। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন। আমায় নিয়ে এঁরা টানাটানি করেন। কিন্তু কুস্তিতে চিরদিন আমার একটা বিতৃষ্ণা। আমি যাই না।

ভোরে উঠে ঘণ্টাখানেক ব্যায়াম করি, দু'বেলা বেড়াই, ইয়ার্ডের রাস্তায় মাঝে মাঝে দৌড়াই। শরীর তখন বেশ ভালো হয়ে উঠছে।

আলিপুরে দেখি, পড়াশুনোর খুব উৎসাহ। এর কেন্দ্র ছিলেন হেমেনদা। সকালে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসতেন আটটা আন্দাজ। সবাইকে জিজ্ঞেস করতেন, Are you all right? Are you happy? যদি কেউ বলত যে সে happy নয়, তাহলে নানা কথাবার্তায় তার সঙ্গে খানিকটা সময় কাটিয়ে যেতেন। কিছু চাইতে হলে, চিঠিপত্র লিখতে হলে এই সময় বলতে হতো। মূলভেনি ছিলেন রসিক লোক। সাতুদার মাথায় ছিল মস্ত টাক। একদিন তিনি জবাকুসুম তেল চেয়েছেন, মূলভেনি জিজ্ঞেস করেন, King Edward VII-এর ছবি দেখেছেন? (এখানে বলে রাখি, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও টাকের জন্য বাইরে আমাদের কর্মীদের মধ্যে সাতুদার নাম ছিল Edward)। কোনো তেল মাখলে যদি টাক যেত তাহলে Edward VII অনেক রকম তেল লাগাতে পারতেন, তা তো স্বীকার করেন?

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট চলে যাবার পর হেমেনদার ঘরের সামনে একখানা কম্বল বিছানো হতো, আশপাশে তিন-চারখানা চেয়ার জড়ো হতো। জিতেনবাবু সীজারের ইকনমিক্স্ পড়াতে শুরু করলেন।

হেমেনদা আগে যা-ই থাকুন, ইদানীং হয়ে উঠেছেন ইউরোপীয় ন্যাশনা-

লিজমের গোঁড়া ভক্ত। ভগবান ও ধর্ম-প্রবণতার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহী। আমরা এ পর্যন্ত ধর্ম-প্রবণতার মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছি, হেমেনদার কথাগুলো সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে আঘাত দেয়, কিন্তু তিনি যা বলেন, খোলা মনে বুঝতে চেষ্টা করি। লেকি, বাক্‌ল্—এই সব পড়া হয়। তাছাড়া হেমেনদার কাছে আছে ডারুইন, হাক্‌সলি প্রভৃতির বই, এবং রাজনীতির ও রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে লেকক, ব্লুণ্ট্‌শ্লি, লাওয়েল, উড্রো উইলসন ইত্যাদি। নিজেকে দেখি, কলেজে লেখাপড়া কিছুই শিখিনি। সবই পড়তে ইচ্ছে করে।

ওদিকে মেজদা (চন্দননগরের বসন্ত ব্যানার্জি) আছেন অন্য ইয়ার্ডে। তিনি প্রায় ধর্মপ্রচারকের উৎসাহ নিয়ে ফরাসী ভাষা শেখাতে চান সবাইকে। তাঁর কাছ থেকে শার্দেনাল নকল ক'রে ইংরাজী থেকে ফরাসীতে অনুবাদ শুরু করি।

আমি আলিপুরে এসে দেখি, এই পড়াশোনাকে উপলক্ষ ক'রে এক দলাদলি শুরু হয়ে গেছে। আলিপুর জেলে তখন আমরা যে বাইশজন ছিলাম, তার ভিতর অপর দলের লোক মাত্র দু'জন। কিন্তু এদিকে সেই দু'জনাই দু'শো। এঁর একজনের সাথে আমি পরে আরও অনেকবার জেলে কাটিয়েছি। প্রতি-বারেই জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পড়াশোনার ভিতর এঁরা দু'জনেই থাকেন। কিন্তু কয়েক দিনেই দেখলাম, পড়াশোনাটা এঁদের উপলক্ষ মাত্র। আসল লক্ষ্য—আমাদের নিজেদের ভিতর দ্বন্দ্ব লাগিয়ে একদলকে তাঁদের দিকে টানা যায় কি না। এটা ওঁদের একটা চিরকেলে পদ্ধতি।

বিজয়বাবু, মনোরঞ্জনদা, সত্যেনদা, সাতুদা আমাদের এই পড়াশুনো-সার্কেলের র‍্যাশানালিজ্‌মের উগ্রতা পছন্দ করেন না। তাঁরা ধ্যান-ধারণা করেন। এবং যাঁর যাঁর ঘরে বসে পড়াশোনা করেন।

কিন্তু দলাদলিটা এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পরস্পর পরস্পরের ঘরে যায় না। অথবা এক সার্কেলের লোক আর এক সার্কেলের লোকের ঘরে যান না।

দুই পক্ষে সবাই এঁরা আমাদের আপনার লোক। 'দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্'—নবাগত আমার অবস্থা কতকটা কুরুক্ষেত্রের অর্জুনের মতো। তেমনি বিপন্ন বোধ করেন অতীনবাবু। তিনি কোনো পক্ষেরই কোনো কথার ভিতর থাকেন না, দুই পক্ষের সবার সঙ্গেই আত্মীয়তা বজায় রেখে চলেন।

তখন আমাদের খবরের কাগজের ভিতর দেওয়া হয় বাংলা সরকারের ছাপা অপাঠ্য বাংলায় লেখা "সাপ্তাহিক যুদ্ধবার্তা" বলে একখানি বেনেতি পুঁটুলি বাঁধা

কাগজ। অন্যভাবে কাগজ সংগ্রহ করতে হয়। এ কাজ আমাদের জন্যে করেন অনুশীলনের বিখ্যাত কর্মী বীরেন চ্যাটার্জি। তিনি তখন কয়েদ ভোগ করছেন। জেলের ছাপাখানায় কাজ করেন। সেখান থেকে 'দৈনিক বসুমতী' সংগ্রহ ক'রে বিকালে হাতমুখ ধোবার জায়গায় যান। আমরা তখন বেড়াতে বের হই। নিয়ম, একজনের পেছনে আর একজন থাকবে, সবার পেছনে থাকবে গুর্খা সিপাই। রাস্তার পাশে লোহার শিক দেওয়া বেড়া, অপর দিকে কয়েদীরা বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখে, বীরেনবাবুও সেইভাবে দেখতে দেখতে এক ফাঁকে কাগজখানা আমাদের কাউকে দিয়ে দেন, প্রায়ই সেটা সত্যেনদার লেঙ্গোটের তলায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

এই কাগজ থেকে ক্রমে আবিষ্কার হল, অ্যানি বেসাণ্ট ধরা পড়ে অন্তরীণ হলেন, তা নিয়ে খুব হৈ চৈ হল। আরও জানা গেল, সেক্রেটারী অব স্টেট মিঃ মণ্টেগু ভারতে আসছেন। দু'টো নিয়েই বাইরে তখন খুব উত্তেজনা। অ্যানি বেসাণ্ট অল্পদিনে খালাসও হলেন। তাঁকে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট করা নিয়ে কংগ্রেসের নরমদলে গরমদলে হাঙ্গামার কাহিনী পাওয়া গেল।

প্রায় এমনি সময় বোধহয় একই সংখ্যা প্রবাসীতে পাওয়া গেল রবীন্দ্রনাথের "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যে রুশ বিদ্রোহের পর হাজার হাজার বিপ্লবী কর্মীদের নির্বাসন থেকে দেশে ফেরার কাহিনী ও সঙ্গে সঙ্গে সাফ্রেজিস্ট বন্দীদের অনশন ব্রতের কথা। রবীন্দ্রনাথের লেখায় পেলাম, "সহ্য না করিলেও যখন চলে এবং সহ্য না করিলেই যখন ভালো চলে, তখন সহ্য করি কেন?"

মনে পড়ে, সেই রাত্রিটির কথা। প্রথম রাত্রে চিরকালই আমায় ঘুমে অবশ করে আনে। কিন্তু সেদিন দরজার সামনে ডেক-চেয়ারটিতে বসে অন্ধকার ঘরে নানা কথা মনের ভিতর তোলপাড় করছিল, অনেক রাত হয়ে গেল, ঘুম আসছিল না।

মনে হচ্ছিল, এখানে তো আমরা মুলভেনি সাহেবের কল্যাণে খেয়েদেয়ে গল্প-গুজবে আনন্দেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। অথচ ওখানে প্রেসিডেন্সি জেলে দেখে এলাম, রাজবন্দীরা কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। শুনেছি, বহরমপুর জেলে, ফরিদপুর জেলে, হুগলি জেলে, রাজসাহী জেলে জীবন আরও দুর্বহ, নির্জন কারাবাস আরও কঠোর—রাজসাহী জেলে দু'মাস, ছ'মাসেও একজন আর একজনের মুখ দেখতে পান না।

এর উপর আছে অপমান। নিজেও নানারকম দেখে এসেছি। আর শুনেছি,

প্রেসিডেন্সি জেলে ৪৪ ডিগ্রীতে কয়েদী মেট রাজবন্দীর ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায় সাহেবের (ইউরোপিয়ান ওআর্ডার) সামনে ওজন নেবার জন্য। রাজসাহী জেলে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সামনে জমাদার রাজবন্দীকে বলে, 'বাবুগিরি ছুটিয়ে দেব।' অপরাধ—সিপাই রিপোর্ট দিয়েছে, তাকে অগ্রাহ্য ক'রে স্টেট প্রিজনার রাতের অন্ধকারে এক সেল থেকে ডেকে আর এক সেলের স্টেট প্রিজনারের সঙ্গে কথা বলেছেন। এমনি সব ব্যবহারের ফলে অধ্যাপক মণি শেঠ, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ এবং আরও কতজন পাগল হয়ে গেছেন।

মনে হল, সহ্য করি কেন?

শুনেছিলাম দালান্দা হাউজের কথা। এক বন্ধুকে শীতের রাতে জলে চুবিয়ে রেখেছিল স্বীকারোক্তি করাবার জন্য। কত বন্ধুকে—অমর ঘোষ, অন্নদা মজুমদার, অরুণ গুহ, জীবন চ্যাটার্জি—আরও কত জনকে কীড স্ট্রীট পুলিশ অফিসে অমানুষিক মার মেরেছে, দিনের পর দিন না খেতে দিয়ে সর্বক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছে, তার উপর হাতে-পায়ে বেঁধে রাতের পর রাত রুল দিয়ে পিটিয়েছে। জীবন ১০৪ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে ধরা পড়েছেন। সেই অবস্থায় তাঁকে নিয়ে, তিনচারজনে মদ খেয়ে এসে শেষ রাত অবধি ঘরের এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে ঠেলে ঠেলে ফেলে টেনিস খেলেছে। আরও যা করেছে ভদ্রলোকের মুখের ভাষায় তা বেরোয় না। জীবন টেগার্ট অথবা লোম্যান—কার কাছে নালিশ করেছিলেন। জবাব পেয়েছেন, 'No, they couldn't beat you, there's no such law.' মুখের এই জবাবের সঙ্গে পেয়েছেন বুটজুতো পরা পায়ের লাথিও!

মনে হল, সহ্য করি কেন?

আরও কত বন্ধুর কথা শুনেছি—গ্রামে, জঙ্গলে, সমুদ্রের চরে—সাপে, বিছায় ভরা ঘরে একা একা নির্জন জীবন যাপন করছেন—গ্রামের লোক একটা সহানুভূতির কথা পর্যন্ত তাঁদের বলতে পাবে না, অসুখে-বিসুখে একবার কাছে পর্যন্ত আসতে পাবে না। অশিক্ষিত কনস্টেবলরা আঠারো-বিশ বছরের ছেলেদের অসৎ জীবন যাপন করতে প্ররোচিত করছে—তাদের ইচ্ছায় সায় বা সাড়া না দিলে সত্য মিথ্যা রিপোর্টে, আরও নানাভাবে জীবন দুর্বহ করে তুলছে। এর উপর আছে দু'চারদিনব্যাপী আই. বি অফিসারদের বহুরূপী মোলাকাত—প্রলোভন, শাসানি, ধমকানি, পরিবার পরিজনকে নিঃস্ব, নিঃশেষ ক'রে দেবার হুমকি—আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা। ফলে কতজনের আত্মহত্যার খবর

তখন কানে আসছে—বন্ধু স্বরেন কর আগেই মারা গেছেন, শচীন দাশগুপ্তের করুণ কাহিনী তখনই শুনলাম।

বসে বসে ভাবি, সহ্য করি কেন?

কি করতে পারি? মনে হয়, সাফ্রেজিস্টদের মতো আমরাও কেন প্রায়োপবেশন করি না? দু'টি বাধার কথা মনে আসে। প্রথমতঃ, দুর্ব্যবহার হচ্ছে অন্য জেলে, আলিপুরেই আমরা সবচেয়ে ভাল ব্যবহার পাই। এখানেই যদি আমরা প্রায়োপবেশন করি, ভালো ব্যবহার করাই যে ভুল, এইটেই আমরা প্রমাণ করব, এবং যে মুলভেনি সাহেব রাজবন্দীদের প্রতি ভালো ব্যবহারের চেষ্টা করছেন, তাঁরই দুর্নাম হবে। একটি উপায় মনে এল—একসঙ্গেই তো সব জেলে না হোক, অন্ততঃ অনেকগুলো জেলে হাঙ্গার স্ট্রাইক করা চলে। হাঙ্গার স্ট্রাইক করতে হলে মণ্টেগু যখন বাংলায় আসবেন, তখন করতে হবে। তার এখনও কয়েক মাস দেরি। ইতিমধ্যে অন্যান্য জেলে খবর পাঠিয়ে সর্বত্র একই দিনে হাঙ্গার স্ট্রাইক করলে ওদের যে অত নির্জন কারাবাসের ব্যবস্থা, তার গুমরও ভাঙবে, তদুপরি আলিপুর জেলের অবস্থা, ব্যবস্থা ও তার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মুলভেনির সুনামের উপরেও অকারণ আঘাত পড়বে না। ভেবে দেখা গেল, আলিপুরে যাঁরা আছেন, তাঁদের অনেকের ভাই বা ছেলে বা অন্য নিকট আত্মীয় অপরাপর জেলে আছেন, দেখা-সাক্ষাতের জন্য বাড়ির মহিলাদের ডেকে পাঠিয়ে, তাঁদের মারফত বিভিন্ন জেলে খবর দিয়ে মণ্টেগুর আসার সময় একই দিনে অন্ততঃ অনেক জেলে হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু করা চলে।

দ্বিতীয় বাধা মনে হল, বয়োবৃদ্ধ এবং রুগ্ন রাজবন্দীরা। মানা করলে বৃদ্ধ দেওয়ান সিং, বিজয় রায়, হেমেন্দ্র আচার্য, অতীন বোস, দুর্গাচরণ বোস, সাতকড়ি ব্যানার্জি শুনবেন এমন ভরসা হল না—আমরা সবাই না খেয়ে থাকব, আর তাঁরা খাবেন—এ প্রকৃতির লোক এঁরা কেউ নন। অথচ এরকম উপবাসের ভিতর এঁদের টেনে নেওয়া অত্যন্ত অন্যায় কাজ হবে। তবু ঠিক করলাম, অনুরোধ, মিনতি ক'রে বলা যাবে ওঁরা যেন যোগ না দেন।

পরদিন সকালের আসরে কথাটা পাড়লাম। বয়সে প্রৌঢ় কিন্তু প্রকৃতিতে তরুণ হেমেনদা উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, বললেন, যে-জিনিস সম্পর্কে ওদের আতঙ্ক এমন তীক্ষ্ণ, সেই ওদের প্রেষ্টিজে ভীষণ ঘা পড়বে, তিনি সবাইকে ডেকে আলোচনা শুরু করলেন।

বললাম, আপনারা করতে পাবেন না।

হেমেনদা হেসেই উড়িয়ে দিলেন—বললেন, 'আপনাদের চেয়ে আমার গায়ে চর্বি বেশী, আমার কষ্ট কম হবে। আর, আমরা তো বুড়ো হয়েছি, বরং আপনারা বেঁচে থাকলে কাজ হবে।'

বৃদ্ধ দেওয়ান সিং তো চটেই আগুন। অতীনবাবু তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ প্রাণ-খোলা হাসি হেসে বললেন, 'সে হয় না বাবা, তোমরা সব কালকের ছেলে, তোমরা না-খেয়ে থাকবে, আর আমি খাব?' কবিরাজ মহাশয়ের মৃদু হাসি, দুর্গাবাবুর শ্লেষভরা হাসি আর রুগ্ন সাতুদার শান্ত নম্র দৃঢ়তা বেশ স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিল—তাঁদের অনুরোধ করা বৃথা।

দেখা গেল, বৃদ্ধদের উৎসাহ যুবকদের চেয়ে বেশী। কয়েক দিন রাতদিন তুমুল আলোচনা চলল। তার পর, দু'টো বাধারই গুরুত্ব এত বেশি মনে হল যে, কিছু দিনের মতো কথাটা চাপা পড়ে গেল।

ইতিমধ্যে মুলভেনি সাহেব এক মাসের ছুটিতে গেলেন। গ্রে বলে জেলের ফ্যাক্টরি ম্যানেজার—সে হল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

মুলভেনি কখনও পুলিশের লোককে, এমন কি, পুলিশ কমিশনারকে পর্যন্ত রাজবন্দীদের ইয়ার্ডে ঢুকতে দিতেন না। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে একদিন এসে উপস্থিত কর্বেট, গোল্ডি ও লোম্যান।

পুলিশের হাজতে থাকতে এদের যেসব কথা শুনিয়েছি, যেন তাই নিয়ে চিমটি কাটতেই দল বেঁধে এরা এসেছে। বেশির ভাগই আমার বন্ধুবান্ধব কে কোথায় কি দুর্বলতা দেখিয়েছেন, তাই নিয়ে আমায় কথা শোনাতে শুরু করল, আর তাঁদের কার কাছ থেকে খবর পেয়েছে আমি কোথায় ম্যাটসিনির ক্লাস করতাম, কোথায় অস্ত্র রাখতাম ইত্যাদি। দু'এক কথা বলতে না বলতে শুরু হল আমার গর্জন। কথা যে খুব বেশি বলবার ছিল, তা নয়। আমার গলার আওয়াজ আর চোখ-মুখের ভঙ্গী বোধহয় ছিল প্রচণ্ড। দু'এক কথার পরই রণে ভঙ্গ দিয়ে তারা সরে পড়ল। জেলকর্মচারী যারা সঙ্গে ছিল, তারা পরে বলল, আমার রকমসকম দেখে ভয় পেয়েই গিয়েছিল।

হেমেনদাকেও দমে যাবার মতো দু'একটা কথা শুনাল। সত্যেনদাকে ও জিতেন লাহিড়ীকে বলল, বার্লিন পর্যন্ত তাঁদের ক্রিয়াকলাপের সন্ধান তারা পেয়েছে।

মুলভেনি সাহেবের অনুপস্থিতিতে জেলের অন্য কর্মচারীদের সঙ্গে আমাদের খিটিমিটি লেগে গেল। X class এবং Y class-এর রাজবন্দী আর Ingress

Into India Act-এর বন্দী আমরা পাশাপাশি তিনটি ইয়ার্ডে থাকি। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসবার আগে এবং পরে আমাদের দরজার ফাঁকে ফাঁকে কথা চলে। মাঝখানের সেলগুলোর দোতলার বারান্দায় একজন কেউ পাহারায় থাকেন—শিস দিলে বা পায়ে দমাদম আওয়াজ করলে বোঝা যায় কেউ আসছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে সরে পড়ি।

গ্রাণ্ট বলে একটা ওয়ার্ডার আমাদের পেছনে লেগে গেল। কথা বলতে দেখলেই সে গিয়ে জেলারকে রিপোর্ট দিত। জেলার এসে হৈ হৈ লাগিয়ে দিত। দু'একদিন সহ্য করার পর আমরাও কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিতাম। বেশির ভাগ দিনই ঝগড়া হতো মনোরঞ্জনদার সঙ্গে। জেলে ঝগড়া করতে তখনকার দিনে মনোরঞ্জনদার জুড়ি ছিল না। আর কথা বলতে গিয়ে তিনি শিস বা পায়ের আওয়াজ প্রায়ই শুনতে পেতেন না। তারপর জেলার যখন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আসত, মনোরঞ্জনদাও রুখে দাঁড়াতেন। যা বলতেন, তার মর্মকথা এই —'কথা বলি, বেশ করি, তুমি যা করবার কর গিয়ে।'

এই সব বিবাদের ফলে পরে আর গ্রাণ্টের দরকার হতো না। ইয়ার্ডে যে গুর্খা সিপাই সর্বক্ষণ থাকত, সে-ই কথা বলায় বাধা দিতে শুরু করল। মন ক্রমে বিষিয়ে উঠছে।

ইতিমধ্যে মুলভেনি ফিরে এলেন। চন্দননগরের আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা একে একে বাইরে অন্তরীণ হয়ে গেলেন, রয়ে গেলেন মাত্র বসন্তবাবু আর সুরেশবাবু। Y class রাজবন্দীদের তখন সেই ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সামনের সাতটি সেলে তখন নতুন এসেছেন শৈলেশ্বর বসুর আর এক ভাই কানাই। এঁদের ভিতর এখন আর কেউ বেঁচে নেই—একে একে তিনটি ভাই-ই খালাসের পর থাইসিসে মারা গেছেন।

কানাই বেচারী রাতদিন একলা থাকে। আমি যখনই সুযোগ পাই গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলি।

একদিন কথা বলছি—দূর থেকে গুর্খা সিপাই কখন আপত্তি করেছে, আমি খেয়াল করিনি, তখন সে তেড়ে এসেছে আমায় ধরবে বলে।

বিকেল বেলা—সবাই বারান্দায় বসে আছেন—সিপাইকে ঐ ভাবে আসতে দেখে সামনে থেকে হেমেনদা, সত্যেনদা, উপর থেকে জিতেনবাবু, অতীনবাবু, বিজয়বাবু, এমনকি পাশের বাড়ি থেকে সুরেশবাবু প্রভৃতি 'হাই সিপাই' বলে এমন চিৎকার দিয়ে উঠেছেন যে, বেচারী ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

আমিও ফিরে দাঁড়িয়েছি। তখনকার আমার চেহারায় ঐ রকম দাঁড়ানোই যথেষ্ট। ইতিমধ্যে তাবাও দু'একজন একটু ওদিক থেকে প্রয়োগ করেছেন।

পরদিন সকালে বেড়িয়ে ফিরছি, ইউরোপিয়ান ওআর্ডার দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে···দেখি দরজার সামনে একসঙ্গে তিনচারজন গুর্খা দাঁড়িয়ে, তাদের হাওয়ালদার সঙ্গে, তাদের খাপে কুকরি ঝুলছে।

রকম দেখে আমরা সবাই দরজার সামনে দাঁড়িয়েছি। হাওয়ালদার কুকরি বের করতে করতে তার সিপাইকে বলছে, 'শালা' কৌন্ বোলা থা?

কেউ কোনো কথা বলার আগেই সত্যেনদা হাওয়ালদারের হাতের কবজিটা এমন মুচড়ে ধরেছেন যে, কুকরি তার হাত থেকে খসে পড়ে গেল— অতীনবাবু কুকরিখানা তুলে নিয়ে এমন এক ধমক লাগালেন যে, গুর্খারা পালাতে পারলে বাঁচে। আমাদের সবাই তখন আক্রমণ-মুখো, সত্যেনদা ততক্ষণে কুকরিখানা অতীনবাবুর হাত থেকে নিয়ে নিয়েছেন। ইউরোপিয়ান ওআর্ডার মাঝখানে পড়ে গুর্খাদের বের ক'রে দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। তারপর কাকুতি-মিনতি ক'রে কুকরি নিয়ে অফিসে চলে গেল।

জেলার অ্যাটকিন্‌সন মুলভেনি সাহেব ফিরে আসার পর থেকে একেবারে ভালো মানুষটি। আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে, 'বড় অন্যায়, বড় অন্যায়' বলতে বলতে অফিসে চলে গেল।

দু' মিনিট যেতে না যেতে জেলারকে আর ইউরোপিয়ান ওআর্ডারকে নিয়ে মুলভেনি এসে হাজির। যেমন জেলার বলেছে, কুকরি নিয়ে আক্রমণ করেছিল—

'Kukri ? Who allowed him inside with Kukri ?' বলতে বলতে মুলভেনি সাহেবের রাগে গোঁফগুলো খাড়া হয়ে উঠল। আমাদের কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রে বেরিয়ে চলে গেলেন।

গুর্খারা দলশুদ্ধ সেইদিনই সাসপেণ্ড হল, এবং তাদের মিলিটারী আইনে বন্দী ক'রে বিচারের জন্য ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।

এতেও কিন্তু আমাদের মনটা যে এতদিন ধরে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল, তা' শান্ত হল না।

এই উত্তেজনায় বরং ইন্ধন দিল ভিতরের যে দলাদলির কথা আগে বলেছি, সেই দলাদলি।

দিনের পর দিন এক দলকে আর এক দলের বিরুদ্ধে উসকানো চলছে। অনাবশ্যক সকলের মন তিক্ত হয়ে উঠছে।

ইতিমধ্যে ব্যারিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জি এলেন একদিন অপর দলের দু'জন নেতার ভিতর একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। মণ্টেগুর আসা উপলক্ষে মডারেট দল তখন তৈরি হচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে কি কি বিষয় নিয়ে আলাপ করবেন তারই সব মালমশলা সংগ্রহ করছেন। বি. সি. চ্যাটার্জি বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় এই ভদ্রলোকের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। সেই উপলক্ষেই এঁদের পরিচয়।

জেল অফিসে দেখা হয়ে যাবার পর বীড্‌ল্‌ নামে যে ইউরোপিয়ান ওআর্ডারটি এই রাজবন্দী বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিল, সে গোপনে এসে সত্যেনদাকে জিজ্ঞেস করল, 'ওঁর সঙ্গে কি আপনার আর লাহিড়ীর বিবাদ আছে?'

সত্যেনদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, বিবাদ থাকবে কেন?'

'তা না হলে আপনারা যাঁরা জার্মানীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তাঁরা খালাস না হন, এমন কথা উনি বললেন কেন?'

ঐ জেলে তখন সত্যেনদা আর জিতেন লাহিড়ীই মাত্র ছিলেন বিদেশ-প্রত্যাগত। তাই বীড্‌ল্‌ মনে করেছিল, ওঁরা দু'জনই মাত্র ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

সত্যেনদা বললেন, 'দূর! তুমি কি বুঝতে কি বুঝেছ!'

'তা নয়, আমি সামান্য যা শুনেছি, তা'তে তাই বুঝেছি, তারপর পুলিশের লোকও তো তাই বলল।'

সত্যেনদা বীড্‌ল্‌কে বললেন, 'না, একথা সত্যি হতে পারে না।' আমায়ও বললেন, 'এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করিস্‌নে! ও কি বুঝতে কি বুঝেছে।'

আমিও তখন তাই মনে করেছিলাম। কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে মণ্টেগু তাঁর Indian Diary-তে বি. সি. চ্যাটার্জির সঙ্গে Interview-এর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে যা লিখেছেন তা পড়ে মনে হল বীড্‌ল্‌-এর কথাটা হয়তো সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়!

রাজবন্দীদের মুক্তি দেবার জন্য অনুরোধ জানাতে গিয়ে বি. সি. চ্যাটার্জি যা বলেছিলেন তার উল্লেখ করেছেন মণ্টেগু এইভাবে: 'He is not now talking of those brought with German gold, but his friends are friends who want, he says, not to destroy the British connection, but to get rid of this administration… …'

কথাটা ভাবি, আর সত্যেনদার মহত্ত্বের কথা মনে পড়ে। সত্যেনদা আর তাঁর

বন্ধুদের বিরুদ্ধে প্রচারেই এই ভদ্রলোক আমাদের সকলের জীবন নিরানন্দ ক'রে তুলেছিলেন। অথচ আমি কাছে ছিলাম বলে, তা না হলে বীড্‌ল্‌-এর কথা বোধহয় তাঁর কোনো নিকট বন্ধুকেও বলেননি। দলাদলির ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এমন এক জঘন্য স্তরে গিয়ে দাঁড়াল যে, একদিন হেমেনদার চোখ খুলে গেল। সেইদিনই এই দলাদলির জড় মারবার উদ্দেশ্যে যে সব ঘরে এতকাল তিনি যেতেন না—সাধারণতঃ জেলের আইন মেনে নিজের তীক্ষ্ণ আত্মসম্মান বজায় রাখতেন এবং কারও ঘরেই সচরাচর যেতেন না—এখন সেই সব ঘর একবার ক'রে ঘুরে এলেন ও এতদিনের দলাদলির জন্য সকলের কাছেই দুঃখ প্রকাশ করলেন।

সেদিন আমাদের আনন্দের সীমা রইল না।

কিন্তু এতদিন ধরে বিবিধ কারণে আমাদের মনটা যে তিক্ত হয়ে উঠেছিল, তার জের মিটল না। এবং তারই জের স্বরূপ সেই স্ট্রাইকের প্রস্তাবটার আবার জোর আলোচনা চলল।

প্রথম হাঙ্গার স্ট্রাইক

এখন মণ্টেগুর আসবার সময় এসে গেছে। বিভিন্ন জেলে খবর পাঠিয়ে হাঙ্গার স্ট্রাইক করবার আর সুযোগ নেই। অথচ সবাই যেন একটা কিছু করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

দিনরাত আলোচনা চলল। রাতের বেলায় তেমন সুযোগ হয় না। কথাটা গোপন রাখতে হবে—রাতের বেলায় ভিন্ন ভিন্ন সেলে বন্ধ থাকি, ডাকাডাকি ক'রে কথা বললে পাছে জানাজানি হয়ে যায়, তবু ইশারায় ইঙ্গিতে কথা চলে। দিনের বেলায় তিনবার চারবার ক'রে যতজন পারি, একত্র হই। তাছাড়া, এখানে-ওখানে দু'তিনজনের কমিটি মিটিংও চলে।

এর আগে অবশ্য একটা ছয়দিনের হাঙ্গার স্ট্রাইক হয়ে গেছে মেদিনীপুর জেলে—হেমেনদা তার পরই মেদিনীপুর থেকে এসেছেন। কিন্তু আমরা যে হাঙ্গার স্ট্রাইকের আলোচনা করছি, তার হেতু বহু ব্যাপক। আমাদের কথা—বিনাবিচারে আটক রাখা চলবে না; আর, আটক রাখলে ব্যবহার সব দিক দিয়ে ভদ্র করতে হবে জেলে বিনাবিচারে আটক সকল বন্দীদের প্রতি।

এরকম হাঙ্গার স্ট্রাইকে গবর্নমেণ্ট সহজে নতি স্বীকার করবে না, কাজেই দু'-পাঁচজনের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তার দায়িত্ব তো সহজ নয়। সবাই অবশ্য নিজের দায়িত্বেই উপবাসের পণ করবেন। কিন্তু শুধু হঠকারিতার বশে কোনো সহকর্মী বন্ধুর নিষ্ফল মৃত্যু হবে, তার গ্লানি তো সমস্ত জীবনেও নিজের মন থেকে মুছে ফেলতে পারব না।

তাছাড়া সবাইকে এক সঙ্গে ওরা রাখবে না—বিভিন্ন জেলে একা একা হয়তো পাঠিয়ে দেবে। তখনও সংকল্প বজায় রাখতে হবে। কত মিথ্যা খবর ওরা বলবে—হয়তো জানাবে, অপর সবাই ছেড়ে দিয়েছে, তুমি একাই না-খেয়ে মরছ। এই ধরনের খবর পেয়ে, অথবা নিজের মনে দুর্বলতা এসে বিভিন্ন জেলে যদি

দু'পাঁচজন ছেড়ে দেয়, যারা তখনও টিকে থাকবে, তাদের দুঃখভোগ আরও দীর্ঘতর হয়ে উঠবে। এই সব নিয়ে মনে মনে আশা-নিরাশার অনেক কথাই হল। নিরাশার দিকেই পাল্লা ভারী।

পরের কথা—বয়স্ক ও রুগ্ন বন্ধুরা কি করবেন? তাঁরা পিছ-পাও কিছুতেই হবেন না। অনেক সাধ্যসাধনার পর স্থির হল, দেওয়ান সিং তিনদিন না খেয়ে থাকবেন, তারপর খেতে শুরু করবেন। অন্য যে চারপাঁচজন ছিলেন, তাঁরা যখন খুশি স্ট্রাইক ছেড়ে দিতে পারেন।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মুলভেনি সম্পর্কে আমাদের যে সংকোচ ছিল, সে-সম্বন্ধে কথা হল, আমাদের জিজ্ঞেস করলে আমরা সবাই বলব, বিশেষ ক'রে আলিপুর জেলের ব্যবহার নিয়ে আমাদের কোনো নালিশ নেই।

১লা ডিসেম্বর মণ্টেগু কলকাতায় আসবেন। ৩০শে নবেম্বর থেকে আমাদের হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু হবে। স্থির হল হাঙ্গার স্ট্রাইক আরম্ভ হবার পূর্বে বাইরে যত লোককে পারি, আমাদের সংকল্প ও রাজবন্দীদের সমস্ত অবস্থা জানিয়ে দেওয়া হবে। বাংলার নরম-গরম দলের নেতৃস্থানীয় তখন রবীন্দ্রনাথ, সুরেন ব্যানার্জি, বিপিন পাল, সি. আর. দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, মতিলাল ঘোষ, ফজলুল হক, আবুল কাশেম, হীরেন দত্ত, রামানন্দ চ্যাটার্জি, বি. সি. চ্যাটার্জি, অশ্বিনী দত্ত, অম্বিকা মজুমদার, অনাথবন্ধু গুহ, যাত্রামোহন সেন, বৈকুণ্ঠ সেন, শ্রীশ চ্যাটার্জি—এঁদের সবাইকে, এবং আমাদের আত্মীয়স্বজন—যাঁদের খবর দিলে একটু লোক জানাজানি হতে পারে, স্থানীয় আন্দোলন হতে পারে—তাঁদের সবাইকে চিঠি দেওয়া স্থির হল।

দীর্ঘ চিঠি—বিনাবিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, দালান্দা হাউজে, কীড্ স্ট্রীটে ও অন্যত্র অমানুষিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, রাজবন্দীদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—প্রায় আট পাতা চিঠি। লিখলেন জিতেন লাহিড়ী। আমরা চারপাঁচজন রাত্রে রাত্রে ঘরে বসে, আমাদের হাতের লেখা ধরতে না পারে, এমন ক'রে নকল করলাম।

বিয়াল্লিশখানা চিঠি। ২০শে তারিখে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ডাকে দেবার ব্যবস্থা করলেন বীরেন চ্যাটার্জি। ৩০শে বেলা দশটা আন্দাজ দোতলায় বারান্দায় সৌরীন ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিলেন। যেমন জানা গেল, চিঠিগুলো ডাকে দেওয়া হয়েছে, অমনি আমাদের উপবাস শুরু হল। জেল-অফিসে জানিয়ে দেওয়া হল, আমরা সেই মুহূর্ত থেকে হাঙ্গার স্ট্রাইক করছি।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এলেন—জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জেনে গেলেন, কেন স্ট্রাইক করছি। তাঁর জেলের বা ব্যবহারের বিরুদ্ধে আমাদের নালিশ নেই যখন জানলেন, তখন আমাদের বলবার তাঁর বিশেষ কিছু ছিল না। তবু ঘরে ঘরে গিয়ে বললেন, 'এতে লাভ কি হবে? তোমরা খাও।'

আমরা বললাম, 'না।'

আমাদের দৃঢ়তা বুঝে আর বেশী পীড়াপীড়ি করলেন না। রায়ান সাহেবকে পাঠিয়ে দিলেন। রায়ান পাচকদের ডেকে ঘরে ঘরে খাবার পরিবেশন করালেন। আমাদের দুর্গাবাবু রোজ এ-কাজটি করতেন। তাঁর সঙ্গে রায়ানের একটা হৃদ্যতা ছিল, খুব হাসিঠাট্টাও চলত। তিনি যখন বাংলায় বললেন, ওগুলো নষ্ট করবে কেন সাহেব, কয়েদীদের ডেকে দিয়ে দাও, রায়ান মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর যখন আমাদের ঘরে ঘরে তালা লাগিয়ে যাচ্ছেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। আমার ঘরের সামনে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন অমন করছেন?' শিশুর মতো কেঁদে ফেললেন। রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে চলে গেলেন। সত্যেনদা অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

পরের দিন। আলিপুর জেলের মাঝখানে একটা গীর্জা আছে। তার ভিতর টেবিল-চেয়ার সাজিয়ে বসেছেন তখনকার বাংলা সরকারের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী ষ্টিফেনসন, টেবিলের দুই পাশে বসেছেন ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্‌স্ বুকানন এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মুলভেনি।

একে একে আমাদের ডাক পড়ল। সবাইকেই প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন—কেন হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছি? আমাদের নালিশ কি, ইত্যাদি?

আমাকে বিশেষ প্রশ্ন করল, তুমি তো সেদিন এসেছ, তোমার কি নালিশ থাকতে পারে?

আমি বললাম, আমার ব্যক্তিগত নালিশ আর কি থাকতে পারে? তোমরা বিনাবিচারে ধরে রাখবেই বা কেন? আর প্রেসিডেন্সি জেলে যা দেখে এলাম, রাজবন্দীদের সঙ্গে সে রকম ব্যবহারই বা করবে কেন?

আমার যখন জবানবন্দী চলছে, তখনই দুর্গ থেকে গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজে জানিয়ে দিল, মণ্টেগু আর চেম্‌স্‌ফোর্ড এসে হাওড়ায় পৌঁছাল। ষ্টিফেনসন আমায় জিজ্ঞাসা করে, 'এই দিনেই হাঙ্গার স্ট্রাইক করার পরামর্শ তোমাদের কে দিল?'

আমি বলি, 'পরামর্শ আবার কে দেবে?' বেচারীর তো ধারণা, আমরা খবরের কাগজ পড়তে পাই না!

মনোরঞ্জনদা খুব কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন। মেজদাকে (চন্দননগরের বসন্ত ব্যানার্জি) যেমন বলেছে, 'তুমি কি মনে কর, তুমি আত্মহত্যার ভয় দেখাবে, আর সেই জবরদস্তিতে গবর্নমেণ্ট তোমায় ছেড়ে দেবে ?' মেজদা জলে উঠলেন; বললেন, 'না যদি দেয় তো বুঝব, Government have committed nothing but murder, murder,murder on me.'

বাগ্‌বিতণ্ডা শেষ হল। নিজেদের জায়গায় ফিরে এসে পরস্পরের নোট মিলিয়ে বোঝা গেল, কপালে দুঃখ আছে। হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ছড়িয়ে পড়তে হবে। তখন কি করা হবে, না হবে—আর একবার ক'রে সবার সংকল্প দৃঢ় ক'রে নেওয়া হল।

পরে শুনেছি, ঐ দিন রাত্রে লাটভবনে এক কনফারেন্স হয়। তখন বাংলার নতুন গবর্নর লর্ড রোনল্ড্‌শে। তিনি বলেন, রাজবন্দীরা যখন জেলেই বন্ধ থাকবে, তখন জেলে তাদের সব কিছু সুযোগ-সুবিধা কেন দেওয়া হবে না ? জেলে যেখানে খুশি কেন ঘুরে বেড়াতে পারবে না ? ইনস্পেক্টর জেনারেল বুকানন বলে, তা যদি করা হয়, তা হলে আর আমি জেলের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারব না। এর পর স্থির হয়, আমাদের অনেককে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলে একা একা পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে আমরা আমাদের পূর্বসংকল্প অনুযায়ী কুঁজো থেকে জল গড়াই আর খাই। আর, ওরা ওদের কর্তব্যের ধারা অনুযায়ী সকাল-সন্ধ্যা ঘরে ঘরে খাবার যেমন দেবার দিয়ে যায়। সকালেরটা বিকেলে, সন্ধ্যারটা সকালে যেমনকার তেমন তুলে নিয়ে যায়। যে কয়েদীরা তুলে নিয়ে যায়, তারাও চোখের জল ফেলে, হা-হুতাশ করে।

২রা ডিসেম্বর। দুপুর বেলা হঠাৎ হেমেনদা আর মনোরঞ্জনদার ডাক পড়ল মালপত্রসহ জেল অফিসে যাবার। বিকেলে শুনলাম, তাঁদের পাঠানো হল যথাক্রমে দার্জিলিং ও বর্ধমান জেলে। যুগান্তর দলের শ্রেষ্ঠ নেতাদের মধ্যে এঁরা দু'জনই তখন ছিলেন ঐ জেলে। তাছাড়া হেমেনদা মেদিনীপুর থেকে প্রথম হাঙ্গার স্ট্রাইকের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলেন, এবং মনোরঞ্জনদা পদে পদে রাজবন্দীদের অধিকার নিয়ে জেলকর্তৃপক্ষের সঙ্গে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রেন্টিসের সঙ্গে ঝগড়া করতেন। প্রথমেই এঁদের বিদায় করবার অর্থ একরকম বোঝা গেল।

বিপদের দিনে এই বিচ্ছেদে সকলেই একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন।

সেইদিন বিকেলে একটি ঘটনা ঘটল। উপবাসে আছি, কিন্তু আমরা সকাল বিকালের বেড়ানোটা বন্ধ করিনি। এর স্বাস্থ্যের দিকও ছিল—তাছাড়া বের হলে অন্য রাজনৈতিক কয়েদীদের সঙ্গে দেখা হয়, খবরাখবরও আদান-প্রদান করা যায়। তাঁদের মুখেই শুনলাম, আমাদের চিঠি সব কাগজে কাগজে বেরিয়ে গেছে।

বেড়িয়ে ফিরছি—গেটের সামনে দেখা ইউরোপিয়ান কয়েদীদের সঙ্গে। তাদের ভিতর টপ্স্ নামে একটা ওস্তাদ কয়েদী ছিল। লোকটি একটি আন্তর্জাতিক ঠগ। আটটি বিভিন্ন ভাষায় পড়তে লিখতে ও কথা কইতে পারে। সে জার্মান ভাষায় জিতেনবাবুকে আমাদের হাঙ্গার স্ট্রাইক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল ও সহানুভূতি জানাল। জিতেনবাবুও যা বলবার বললেন।

সেদিন ওআর্ডার ছিল সেই শয়তান গ্রান্ট। সে জিতেনবাবুকে বলে, 'কথা বলছ কেন ?'

'বলছি, বেশ করেছি, তোর যা করবার কর্ গিয়ে যা।'

গিয়ে সেই জেলার অ্যাটকিন্সনকে ডেকে নিয়ে এল। তার কথা বলার রকমই ছিল যেন ধমকানি। জিতেনবাবু বললেন, 'না খেয়ে তিলে তিলে মরতে যাচ্ছি। তুই কি ভয় দেখাতে এসেছিস রে ? যা খুশি কর্ গিয়ে।'

জেলার গিয়ে মুলভেনিকে ডেকে নিয়ে এল।

মুলভেনি কথা পাড়তেই যেন বারুদ-স্তূপে আগুন পড়ল। জিতেনবাবু জেলারকে দেখিয়ে বললেন, 'তুমি কি জান না, বরাবর এই কুকুরের বাচ্চা আমাদের পেছনে লেগে রয়েছে ?'

শুনে মুলভেনি আর দাঁড়ালেন না। যেতে যেতে জেলারকে ধমক দিয়ে বললেন, অন্য ঘরের বন্ধুদের কানে গেল, 'এ সময়ে এদের মেজাজ স্বভাবতঃই খারাপ থাকবে। কেন এখন এইসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে কথা তোল ?'

পরদিন ভোরে অন্য ব্যাপার। আমার ঘরটা এক পাশে। অন্ধকার থাকতেই ঘর খোলে, আমি বেরিয়ে ইয়ার্ডে বেড়াই। রায়ান সাহেব ডাকলেন, 'Mr. Datta, please come with me.'

ইয়ার্ডের দরজা খুলে অফিসে নেবে, কি হাসপাতালে নেবে—প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি। শেষে দেখি ম্যাজিস্টেরিয়াল সেল্ যেগুলো আছে, অর্থাৎ সামনে ঘেরা—সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে বিশেষ অপরাধী যারা তাদের রাখবার জন্য খারাপ সেল—সেইদিকে নিয়ে চলেছে। আগে আমাদের নিজেদের

মধ্যে একবার কথা হয়েছিল, ঐ সেলে আমাদের নিতে চাইলে, আমরা বিনা বাধায় যাব না, বলপ্রয়োগ করলে যাব—বলপ্রয়োগ অবশ্য ঠিক ধস্তাধস্তি পর্যন্ত নেব না—গায়ে হাত দেওয়া অর্থই বলপ্রয়োগ ধরে নেব।

কথাটা মনে পড়তে দাঁড়িয়ে গেলাম, জিজ্ঞেস করলাম, 'ওখানে নিয়ে চলেছ কেন?'

রায়ান বললেন, 'Order.'

আমি বললাম, 'জোর না করলে যাব না।'

রায়ান সাহেব একটু বিপদে পড়লেন। ইতস্তত: ক'রে, একটু দূরে গীর্জার কাছে বসে জেলার গনতি মিলাচ্ছিল, তাকে গিয়ে রিপোর্ট দিলেন।

জেলার ভুঁড়ি দোলাতে দোলাতে ছুটে এল, পেছনে জমাদার। বলল, 'ও-সেলে যাবে না?'

'Not, unless I am forced.'

আগের দিনের রাগটা সর্বাঙ্গে গরগর করছে। তারপর ভোরবেলা একটু বোধহয় টেনেও এসেছে। কিন্তু রাগ বেশি প্রকাশ করার সাহস আর নেই। শুধু হাত-পা চোখের ভঙ্গীতে বিক্রম প্রকাশ ক'রে বলল, 'জমাদার, লে যাও পাকড়কে।'

জমাদার আমার পাশে এসে একখানা হাতে আস্তে হাত লাগিয়ে বলল, 'চলিয়ে বাবুজী!'—সেলে ঢুকলাম।

একে একে অনেককেই ওখানে নিয়ে আসা হল। এই সেলে আনবার বেলায় এই রকম প্রতিবাদের যে একটা কথা ছিল, তা বোধহয় আর কারও খেয়াল ছিল না।

সকাল বেলায় যখন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এলেন, বন্ধুদের পরামর্শক্রমে নালিশ করলাম জেলারের বদ মেজাজ ও অসদ্ব্যবহারের (bad temper and manners) জন্য। কি ঘটনা ঘটেছিল মুলভেনি জানতে চাইলেন। সমস্তটা শুনে বললেন, 'But you had no business to disobey orders.'

তারপর শুনতে পেলাম, জেলারকে বলতে বলতে যাচ্ছেন, 'এদের এ সেলে নিয়ে আসার কোনো প্রয়োজন ছিল না।' জেলার জবাব দিচ্ছে, 'স্যর, আমার আশঙ্কা হয়েছিল, এরা যদি violent হয়ে ওঠে, আমি জেলের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারব না।'

এর জবাবে মুলভেনি কি বলেছিলেন জানি না। কিন্তু খানিকটা বাদে জেলার

আমার সেলে এসে বললে, 'আমি যদি আপনাকে কোনো আঘাত দিয়ে থাকি, আমি তার জন্য দুঃখিত, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই।'

ঐ সেলেও সারা দিন-রাত সেল থেকে সেলে ডাকাডাকি ক'রে হৈচৈ ক'রে দু'টো দিন আমাদের কেটে গেল। বেছে বেছে আমাদের জনকতককে নিয়ে এসেছে। মনে খুব লাগল। কিন্তু যাঁরা আগেকার সেলে পড়ে রইলেন, তাঁরা বয়োবৃদ্ধ। তাঁদের লাগল আরও অনেক বেশি। কয়েদীরা চারবার ক'রে খাবার আর চা নিয়ে আসে, তাদের মারফত খবরাখবর চলে।

পরদিন এল আই. জি বুকানন। হাউ হাউ ক'রে কথা বলে। আমরা ওকে বলতাম, 'বোকানন্দ'। সব ঘরের সামনে খাবার পড়ে রয়েছে। সবার কাছে গিয়ে একই প্রশ্ন করে, 'Why are you spoiling all this good food ?'

একে তো সরকারী দফতরের ফাইল-মাফিক কাজ, তার উপর মণ্টেগু এসেছে। হাঙ্গার স্ট্রাইকের ভিতর নতুন লোক এসে পড়ে তার হিসাব নেই। পাছে কোথাও থেকে কিছু জানাজানি হয়ে যায়—ওরা দালান্দা হাউজ খালি ক'রে দীর্ঘকাল সেখানে যে সব বিনাবিচারের বন্দীদের রেখেছিল—সব এ-জেলে ও-জেলে পাঠিয়ে দিল। দালান্দা হাউজের কথা গোড়াতেই বলেছি। তার কুখ্যাতির কথা তখন আর কারও অজানা নেই। আমাদের যেদিন হাঙ্গার স্ট্রাইক আরম্ভ, তার আগের দিন রাত্রে এলেন অনুশীলনের কর্মী সিরাজগঞ্জের সতীশ দে, আর যেদিন হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু হয়ে গেছে, সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় ইয়ার্ডের সামনে রাস্তায় বেড়াচ্ছি, এমন সময় এলেন অনুশীলনের নেতৃস্থানীয় পালং-এর আশু কাহালি।

দুইজনই হাঙ্গার স্ট্রাইকে যোগ দিলেন। সতীশ দে রাত্রে এসে শুনলেন, পরদিন থেকে আমাদের হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু। খুব উৎসাহ, বেশ বীরত্বের ব্যঞ্জনা দিয়ে আমাদের গান শোনালেন—

সভা যখন ভাঙবে

তখন শেষের গান কি যাব গেয়ে ?

একটু একটু শীত পড়েছে, সতীশবাবু নতুন এসেছেন, শীতের কাপড় পাননি, তাঁকে গায়ে দেবার জন্য আমার আলোয়ানখানা দিয়ে দিলাম। বাবার দেওয়া আমার একখানা এণ্ডি চাদর ছিল, আমি সেইখানা গায়ে দিয়েছি।

ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল সেল থেকে বুকানন যখন আমাদের সাথে দেখা ক'রে ফিরে

যায়, সামনের দরজার একটু ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল, বুকাননের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার আলোয়ানখানাও চলে গেল।

ওরা চলে যেতে আমার দুই পাশের দুই সেলে অনুশীলনের দুই নেতা প্রতুল গাঙ্গুলী আর রমেশ চৌধুরী, ওঁদের ডেকে জিজ্ঞেস করি, 'কে ? সতীশ দে চলে গেল না ?' ওঁরা বললেন, 'তাইতো মনে হল।' পরে কয়েদী ও সিপাইদের মুখে শুনলাম, 'ও-বাবু খেতে রাজী হয়েছেন, তাই ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল।' ভদ্রলোকের কিন্তু আমাদের চেয়েও কম বয়স, বেশ জোয়ান চেহারা।

ওদিকে ইউরোপিয়ান ইয়ার্ড থেকে সাতুদা (২৪ পরগনা মাহিনগরের সাতকড়ি ব্যানার্জি) ও দুর্গাচরণবাবু খবর পাঠাচ্ছেন, তিন দিন হয়ে গেছে, তবু বৃদ্ধ দেওয়ান সিংহকে কিছুতে খাওয়ানো যাচ্ছে না। অথচ তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বলছেন, 'আমার বাচ্চার মতো সব সোনার চাঁদ ছেলে—ওরা না খেয়ে থাকবে, আর আমি খাব ?'

আমরা সকলে মিলে অনুরোধ ক'রে পাঠালাম, পরদিন থেকে খেতে আরম্ভ করলেন।

রাত্তির বেলায় পেছনের সেল থেকে কয়েদীরা কেউ-বা দুঃখ করে, কেউ-বা খোদার কাছে আমাদের জন্য দোয়া মাগে, কেউ-বা বলে, আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

পরদিন সকালবেলা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এলেন, আমার নাড়ী পরীক্ষা করলেন, বুকে চোঙা একবার লাগালেন, তারপর আমার টিকেটে লিখলেন, Fit for travel. জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় পাঠাচ্ছেন ?'

বললেন, 'তা জানিনে। তবে এইটুকু বলতে পারি, কাল এমন সময় আপনি বাংলার সীমানা থেকে বহু দূরে।' সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট চলে গেলে জানা গেল, আমরা ছয় ব্যক্তি একসঙ্গে অপর কোথাও যাচ্ছি—প্রতুলবাবু, রমেশবাবু, সত্যেনদা, জিতেন লাহিড়ী, বসন্ত ব্যানার্জি ও আমি।

দুপুরবেলা অফিসে ডাক পড়ল। আর এক নম্বর করুণ বিদায়ের পালা—দুই ইয়ার্ডেরই যতজনের কাছ থেকে সম্ভব হল বিদায় নিলাম।

অফিসে যেতে মুলভেনি বললেন, 'শুনছি, আপনাদের সব চিঠি কাগজে কাগজে ছাপা হয়েছে। এ সব চিঠি নিশ্চয় আমার জেল থেকে যায়নি।'

কথার ইঙ্গিতটি বুঝলাম ; বললাম, 'তা কি ক'রে সম্ভব ?'

সত্যেনদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি মতলবে চালান ক'রে দিলেন ?'

'জানি না, হয়তো জোর ক'রে নল চালিয়ে খাওয়াবে।'

'এ ক'রে কতদিন বাঁচিয়ে রাখবে ?'

'বহু মাস।'

হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখি, দু'দিকে দু'গাছা দড়ি ধরে জনকতক পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে—যে পথ দিয়ে আমরা ট্রেন পর্যন্ত যাব, তার সীমানার ভিতর কোনো লোক ঢুকতে দিচ্ছে না।

দূর থেকে বহু লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল—আমরা ছয়জন তিনখানা ইণ্টার ক্লাসের গাড়িতে উঠলাম। গাড়িটা বোধহয় নাগপুর প্যাসেঞ্জার। আমাদের এক-একটা গাড়িতে চারজন ক'রে পুলিশ। একজন বুড়ো মতো ইউরোপিয়ান ইনস্পেক্টর ওদের দলপতি, আর রইল আই. বি-র একজন সাব-ইনস্পেক্টর।

স্টেশনে স্টেশনে নামি—পরস্পরকে জিজ্ঞেস করি, 'কোথায় যাব ?' হদিশ পাইনে। এই অনিশ্চয়তাটাই পীড়া দিচ্ছে। জিতেনবাবু আই. বি-টার সাথে খাতির জমান—কোনো লাভ হয় না।

আমরা গল্প করি, বুড়ো কোনো আপত্তি করে না। বরং চা খাব কি না, অন্য কিছু খাব কি না জিজ্ঞেস করে। কিন্তু একটা স্টেশনে—বোধহয় খড়্গপুরে—প্রতুলবাবু যখন বলেন, তার চেয়ে বরং একখানা কাগজ কিনে দাও, ও বলে, কাগজ তো তোমরা পড়তে পাবে না।

দীর্ঘ পথ, প্যাসেঞ্জার গাড়ি, ছ্যাকড়া গাড়ির মতো চলছে, পাঁচদিনের উপোস—অনেকেই একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। বিশেষ ক'রে জিতেনবাবু ও মেজদা (বসন্তবাবু), আমি আর সত্যেনদা প্রায় শেষ পর্যন্তই নামি আর গল্প করি।

পরদিন বিকেলের দিকে। বুড়ো ইনস্পেক্টর পকেট থেকে একখানা স্লিপ কাগজ বের করে। আমাদের কয়জনের নাম লেখা। প্রথম নামটাই আমার। জিজ্ঞেস করল—'Who is Mr. Bhupendra Kumar Datta ?' বললাম, 'আমি।' ও বললে, 'আর এক ঘণ্টা বাদে আপনাকে নামতে হবে, তৈরি থাকবেন।'

ও-পথে তখনও অতদূর যাওয়া আসা করিনি। কেউই ধারণা করতে পারলেন না, আমায় কোথায় নামাবে।

বিলাসপুর স্টেশন, আসন্ন সন্ধ্যা। আবার সবার কাছ থেকে বিদায়ের পালা। এ বিদায়ের অর্থ কি, ভুক্তভোগীরা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। শিশু—মা নয়,

বাবা নয়—সর্বক্ষণ যার সঙ্গে থাকে, যার উপর নির্ভর করে, যে ভালোবাসে, তারই কাছ-ছাড়া হতে হু হু ক'রে কেঁদে ওঠে। দিন-রাতের, সুখ-দুঃখের আপদ-বিপদের সব সঙ্গী—যাদের আপনার বলতে আর কেউ নেই, আছে হয়তো, কিন্তু আর কখনও কাছে পাব কি না অনিশ্চিত—একত্র এই আজ যারা আছে, তারাই আমাদের আপনার। তারা পরস্পরকে ফেলে যাচ্ছে—হয়তো এ-জীবনে এই শেষ দেখা।

সন্ধ্যার অন্ধকারে একখানা ছ্যাকড়া গাড়ি ক'রে ঢুকলাম বিলাসপুর শহরে।

পরে জেনেছি, স্টেট প্রিজনারদের বেলায়, সর্বদা যেমন করে—নাম, ওয়ারেণ্ট প্রভৃতি—যে জেলে বদলী করবে, আগে থাকতে সেই জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে পাঠায়, আমাদের ক্ষেত্রে সে সব কিছুই করেনি। ভারত গবর্নমেণ্টের হোম মেম্বার, হোম সেক্রেটারী—সব তখন মণ্টেগুর সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায়। ওরা মধ্যপ্রদেশ গবর্নমেণ্টকে তার ক'রে দিয়েছে, তোমাদের ছয়টি জেলে ছয়জন বাঙালী রাজবন্দী রাখতে হবে। সেই অনুযায়ী ওখানকার ইনস্পেক্টর জেনারেল অব প্রিজনস্, বিলাসপুর, রায়পুর, নাগপুর, অমরাবতী, জব্বলপুর ও সাগর জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদের প্রত্যেককে তার ক'রে দিয়েছে, একজন বাঙালী স্টেট প্রিজনার আসছে, তাকে রাখবে। যথাক্রমে এই কয়টি জেলে আমরা গেলাম—আমি, প্রতুলবাবু, রমেশবাবু, সত্যেনদা, জিতেন লাহিড়ী ও মেজদা। সাহেব ইনস্পেক্টরটি যেমন নামের লিস্ট করেছে, বা পেয়েছে, তেমনি ভাবে পর-পর এক-এক জায়গায় নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সব জায়গা ঘুরতে ঘুরতে মেজদার সাগর পৌঁছাতে ছয় দিন লেগে গেল।

ঐ ব্যবস্থা যুক্তপ্রদেশের ছয়টি জেলেও করা হল।

আমাদের পরদিন সেখানে গেলেন সাতকড়ি ব্যানার্জি, সুরেশ দাশ, যশোরের বিজয় রায়, সৌরীন, হরিদার ভাই মাখন ও আশু কাহালি।

জেলে যখন পৌঁছালাম, তখন রাত হয়ে গেছে, জেল বন্ধ হয়ে গেছে। খানিক বাদে জেলার তার বাসা থেকে এল। নাম জিজ্ঞেস করল। বললাম। সঙ্গের বাক্স, বিছানা দেখে জিজ্ঞেস করে—'এ কি আপনার সঙ্গেই থাকত, না অফিসে থাকত?'

আমি বললাম, 'সঙ্গেই থাকত।'

জিজ্ঞেস করে, 'কোন্ ধারায় আপনার শাস্তি হয়েছে?'

'কোনো ধারায় নয়।'

'তবে ?'

'বিনাবিচারে আটক ক'রে রেখেছে।'

'কোন্ আইনে ?'

'Regulation III of 1818.'

'1818 ? What is that ?'

যা বলবার বললাম। জিজ্ঞেস করল, 'যে জেল থেকে আসছেন, সেখানে আপনাকে কোথায় রাখত ?'

বললাম, 'ইউরোপিয়ান সেলে।'

ও বলল, 'আমাদের তো ইউরোপিয়ান সেল বলে কিছু নেই, সাধারণ সেল যা আছে তারই একটি খালি ক'রে দিই। সেখানে আপনার বিছানা দিচ্ছি, কিন্তু বাক্স আপনি পাবেন না।'

'কেন ?'

'জেলের আইনে নেই। তবে কাল সকালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসুন—তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রে যা দরকার করব। এখন আপনি কি খাবেন ?'

'জল ছাড়া আর কিছু না।'

'খেয়ে এসেছেন ?'

'না, হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছি।'

'সে আবার কি ?'

'অনশন ব্রত নিয়েছি, বিনাবিচারে বন্দী ক'রে রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে।'

ও যা বুঝবার বুঝল। খানিকটা বাদে একটি সেলে ঢুকিয়ে দিল। যেমন ছোট, তেমনি কদর্য, তেমনি আলো-বাতাসের প্রবেশপথ-শূন্য। প্রেসিডেন্সি জেলের ৪৪ ডিগ্রীর কথা আগেই বলেছি। তার ভীষণতা আছে, কিন্তু আশপাশে মানুষ আছে এই অনুভূতিটা থাকে—এখানকার এই ছমছমে ভাবটা সেখানে নেই।

ছোট্ট জেল, মাত্র ১২০ জন কয়েদীর থাকবার জায়গা, জেলে দু'টি মাত্র সেল। তা-ও এক জায়গায় নয়, একটি ইয়ার্ডের দুই পাশে দু'টি। মানুষের স্পর্শ থেকে মানুষকে যতখানি দূরে রাখা যায়, তারই ব্যবস্থা।

পরদিন সকালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এল। আমার কাছ থেকে জেরা ক'রে যা যা জানবার জেনে নিল। তারপর গেল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাসায়। আলাপ-আলোচনা ক'রে ফিরে এল—বেলা দু'টো আন্দাজ দেখি, এক কয়েদীর

মাথায় আমার বাক্স নিয়ে অ্যাসিস্টাণ্ট জেলার এল। কয়েদীটি রয়ে গেল, আমার কাজকর্ম যা থাকবে, করবে।

একখানি ডেক-চেয়ার এল। তাতেই বসে বসে দিন কাটে। বাক্সে বই ছিল—গীতাঞ্জলি, রামায়ণ, অন্যান্য রামায়ণ, Imitation of Christ, Trine-এর In Tune with the Infinite, Mill-এর Liberty and Representative Government, এমনি আর দু'একখানা পড়া বই ও দু'তিনখানা খাতা।

হাতে নিয়ে বসতাম প্রায়ই গীতাঞ্জলিখানা, কিন্তু আকাশের দিকে চেয়েই দিন কাটত। আকাশের দিকে চাইবার অবকাশ পর দিন থেকে হল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কি ভেবে-চিন্তে পর দিন সেল থেকে আমায় মুক্ত করলেন। পাশের ওয়ার্ডটায় প্রায় চল্লিশজন কয়েদী থাকত, তাদের অন্যত্র সরিয়ে দিলেন। ওয়ার্ডের ভিতর কয়েদীদের শোবার জন্য যে মাটির ঢিবিগুলো, তার মাঝখানে একটা জানালার সামনে আমার লোহার চৌকিখানা পড়ল। দিনের বেলায় ওয়ার্ডের তিনদিক ঘেরা বারান্দার কোনো-না-কোনো দিকে ডেক-চেয়ারে বসে কাটত।

রাতের বেলায় দু'পাশের দু'টো সেলে দু'জন কয়েদী থাকত। সারাদিন সমস্ত জায়গাটা নিয়ে থাকতাম আমি, আমার কাজকর্ম করবার সেই কয়েদীটি—যার করবার কিছুই ছিল না, সারাদিনে এক কুঁজো ক'রে জল ভরা, ডেক-চেয়ারখানা পেতে বা সরিয়ে দেওয়া, আর স্নানের পর কাপড় আর তোয়ালেখানা ধুয়ে শুখানো ছাড়া। আর থাকত আমার উপর নজর রাখবার জন্য এক সিপাই। এদের সঙ্গে গল্পে আর কতটুকু সময় কাটে? তাও গল্প করার নিয়ম ছিল না। জেলার বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে পড়তে পারে। এমন সময়গুলো বাদ দিয়ে ওরা তবু ওরই ভিতর সময় সময় গল্প করতে চাইত।

আর খুব ভোরে জেলের গুনতি নিতে এসে অ্যাসিস্টাণ্ট জেলার চন্দ্রিকা-প্রসাদ এক মিনিট আধ মিনিটের জন্য দু'একটা কথা বলে যেতেন। লোকটির প্রথম দিন থেকেই আমার প্রতি একটা সহানুভূতি এসে গিয়েছিল। কিন্তু মারাঠী জেলার ভেঙ্কট রাও ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ পরঞ্জপে যুক্তপ্রদেশের এই লোকটিকে বিশ্বাস করত না। কাজেই ইনি ভয়ে ভয়ে থাকতেন। সারাদিনের খাটুনির পর সন্ধ্যেবেলায় একটু ছুটি পেতেন। তখন এক ক্লাবে যেতেন। সেখানে স্থানীয় বাঙালীদের সঙ্গে দেখা হতো। বাঙালীরা ওঁর কাছে আমার খোঁজ-খবর নিতেন। আমি যে ঐ জেলে প্রায়োবেশনে আছি সে-খবরও কাগজে বের ক'রে দেন ওঁরাই।

ভোরবেলাটা ইয়ার্ডের কাঁকরের উপর দিয়ে একটু বেড়াতাম। সেই সময়েই চন্দ্রিকাপ্রসাদ আসতেন। যা খবর থাকত দু'এক কথায় বলে চলে যেতেন। বেশী সময় থাকতেন না, পাছে সিপাই জেলারকে বলে দেয়।

একলা বসে আকাশ-পাতাল কত কথা ভাবি। মনে পড়ে, একদিন মরতে চেয়েছিলাম—ক্ষুদিরামের মতো, কানাইয়ের মতো ফাঁসির কাঠে। ছেলেবেলা থেকে মালা গাঁথতে ভালোবাসতাম। কত যত্নে এঁদের ছবিগুলিকে মালা দিয়ে সাজাতাম, অন্যের অলক্ষ্যে ছবি খুলে নিয়ে বুকে চেপে রাখতাম—জিজ্ঞেস করতাম, তোমাদেরই মতো কি জীবনকে সার্থক করতে পারব না?

আর এক দিনের কথা মনে পড়ে। যতীনদা বসেছেন উদার আকাশের নীচে দৌলৎপুর কলেজ হোস্টেলের দোতলার খোলা বারান্দায়। গভীর রাত। আমি একলা ওঁর দিকে চেয়ে বসে। যতীনদার ঐ মুখখানা, ঐ চোখ দুটো, ঐ বুক-খানার সঙ্গে ঐ আকাশখানার কোথায় যেন যোগ আছে, কোথায় যেন মিল আছে; আকাশের রবিকে রবীন্দ্রনাথ মিতা বলে ডেকেছেন, ঐ আকাশখানাও যেন যতীন্দ্রনাথের মিতা।

চোখ নামিয়ে বললেন, প্রফুল্ল, ক্ষুদিরাম, সত্যেন, কানাই—একে একে মরে দেশকে জাগিয়ে গেছে। এখন আর একে একে নয়, আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে যুদ্ধ ক'রে মরে দেশকে জাগাব।

বারো বছর বয়সে 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' পড়ে রঘুনাথজী হাবিলদারকে করেছিলাম জীবনের আদর্শ। ভোরের দিকে যতীনদা চলে গেলেন। রাস্তায় তুলে দিয়ে ফিরতে ফিরতে নিজেকে প্রশ্ন করলাম, রঘুনাথজীর মতোই তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পাব তো; যুদ্ধে মরে জীবন সার্থক করতে পারব তো?

মনে পড়ে, যতীনদার কথাগুলোয় মনটা তখনও ভরপুর। বেলা প্রায় দুপুর; মেসে সহপাঠীদের খাবার জন্য তরকারির বাগান করেছি। তাই ঘেরার জন্য জিওল গাছের ডাল কাটতে যাচ্ছি। কাঁধে গামছা, হাতে একখানা কাটারি; সমস্ত কথাগুলো যেন নিজের ভিতর ওলটপালট করছে, নিজেকে যেন আর ধরে রাখতে পারছি না। ভৈরবের ধারে একটা গাছের ছায়ায় বসলাম। একে একে জীবনে প্রিয় সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। শুধু মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে চোখের জল সামাল দিতে পারলাম না। সে চোখের জল আমার কালে কালে শুকিয়ে গেল।

মনে পড়ল, আরও একদিন মরতে গিয়েছিলাম—এই সেদিন, নিজের গলায় নিজে ফাঁসি পরে—পাছে নিজের অজ্ঞাতেও নিজেকে দিয়ে দেশের কোনো ক্ষতি হয়।

মরা হয়নি। আজ আবার এক মরার দিন এসেছে সামনে—একটা গুলিতে বা ফাঁসির দড়িতে, এক মুহূর্তে নয়—তিলে তিলে দীর্ঘ দিন ধরে শুকিয়ে শুকিয়ে। পারব তো—আমার জন্মে বন্ধুদের যন্ত্রণা বাড়বে না তো—কলঙ্ক বইতে হবে না তো?

স্বপ্নের বিলাসের মধ্যেই বাস্তব তার কঠোর রূপে এসে দেখা দেয়। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এসে বলে, 'রায়পুর জেলে আপনার যে বন্ধু আছেন, তাঁর ঘরে জল না রেখে দুধ রাখা হতো। তিনি দুধ খেতে শুরু করেছেন।'

'বেশ।'

'আপনার ঘরেও জল রাখা হবে না, দুধ থাকবে।'

'ভালো কথা। অসহ্য হলে নিজে মূত্রত্যাগ করেও খেতে পারব।'

কি ভেবে চিন্তে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জল ও দুধ দুইই রাখতে হুকুম দিয়ে গেলেন।

আরও একদিন বাদে। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এসে শোনালেন, আই. জি হুকুম দিয়েছেন, যদি আপনি না খান আপনাকে যা যা সুবিধে দেওয়া হয়েছে, সব কেড়ে নেওয়া হবে।

সুবিধে কি কি, জানতাম না। দেখলাম, রাত্রে আমায় আবার ওয়ার্ড থেকে সেল সেলে নিয়ে যাওয়া হল, এবং ট্রাঙ্ক, কাপড়, জামা,—এমন কি পায়খানার মগটি পর্যন্ত নিয়ে গেল। রেখে গেল শুধু বিছানা, তোয়ালে, আর খাবার জলের কুঁজো ও গ্লাসটি। কাপড় স্নানের সময় এনে দিত, আর শুখালে নিয়ে যেত। পায়খানার জন্য জল দিত কয়েদীদের খাবার একটা লোহার বাটিতে।

দু'দিন এইভাবে কাটল। তার পরদিন ভোরে চন্দ্রিকাপ্রসাদ খবর দিয়ে গেলেন, গত কাল ভোরে অমৃতবাজার পত্রিকায় বেরিয়েছে আপনার এই অবস্থার কথা, আর রাত্রে টেলিগ্রাম এসেছে; আপনার সমস্ত জিনিস ফিরিয়ে দেবার হুকুম হয়েছে।

জেল খোলবার পর আধ ঘণ্টাও যায়নি, দেখি, বড় জমাদার পেছনে, আর তার আগে আগে এক কয়েদীর মাথায় ট্রাঙ্ক, হাতে আমার কাপড় ইত্যাদি ফিরে এল। কিন্তু রাত্রের বাসস্থান আমার সেই সেলেই রয়ে গেল। দিনের বেলায়

ডেক-চেয়ার ওআর্ডের বারান্দায় পড়ত, সারাদিন সেইখানেই কাটাতাম। এটা বোধহয় স্বাস্থ্যের খাতিরে।

আর একদিন গেল। উপবাসের সেটা তেরো দিন। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট একটা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে এল। আই. জি টেলিগ্রাম করেছে, 'If persuasion fails resort forced feeding'। বললে, 'আপনাকে আজ দিনটা ভাববার সময় দিচ্ছি। সন্ধ্যার মধ্যে যদি না খান, আমাকে হুকুম তামিল করতে হবে।'

'ভালো।'

সন্ধ্যার পরে সেলে তালা বন্ধ হয়ে গেছে, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি স্থির করলেন?'

বললাম, 'নতুন কিছু স্থির করিনি।'

চলে গেল। খানিক বাদে আবার এল, সঙ্গে জেলার, ডাক্তার, বড় জমাদার, হাওয়ালদার, আর বাছা বাছা জোয়ান সেপাই ছয়জন। ডাক্তারের হাতে একটি কাঁচের ফ্লাস্ক, তাতে নল লাগানো। দুধ তো পিতলের হাঁড়িতে করেই ধরা আছে।

হুকুম হল, জমাদার পাকড়ো।

হাত ধরতেই, একটা ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিলাম। তখন সিপাই, হাওয়ালদার সবাই মিলে লেগে গেল। আন্দাজে বলি, বোধ হয় পনেরো মিনিট ঝাপটাঝাপটি চলল, এর ভেতর আমার কনুইয়ের ধাক্কায় দু'বার দু'জন সিপাই আন্টিসেলের দুই দেওয়ালে পড়ে গেল। আমারও গা-হাত-পা-মাথা অনেক জায়গা ছড়ে গেল। তবু একথাও বলি, ওরা আমায় কেউ মারেনি, বরং আমি ব্যথা না পাই তারই চেষ্টা করেছে।

তখন আমায় বেশ চেপে ধরেছে। আমি দাঁত চেপে আছি, ডাক্তার নলটি মুখের সামনে ধরে আছেন। ওরা চোয়াল চাপাচাপি করতে চোয়াল কেটে মুখ দিয়ে রক্ত গড়াতে থাকল।

ততক্ষণে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, জেলার চেঁচামেচি ক'রে হুকুম শোনাতে শোনাতে, আর আমার দুর্বার অবাধ্যতায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

আমার দাঁত খুলতে না পেরে হাওয়ালদার বলে উঠল, 'দাঁত নেহি খুলতা।'

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলে বসল, 'মারো দু লপ্পট, খোল্ দেগা।'

আমি এক ঝাঁকানি দিয়ে মাথা-মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে চিৎকার ক'রে উঠলাম, 'What!'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দু' পা পিছিয়ে দরজার কাছে চলে গেল। বলল 'আচ্ছা, ছোড় দোও।'

আবার সেলের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে ওরা সদলবলে চলে গেল।

পরদিন সকাল বেলা জমাদারকে বললাম, জেলারকে ডেকে দিতে। জেলার আসতে বললাম, 'চারখানা সাদা কাগজ পাঠিয়ে দাও।'

'কি করবেন ?'

'দরখাস্ত লিখব '

'কি ব্যাপার নিয়ে, কার কাছে ?'

'তাতে তোমার প্রয়োজন নেই, তুমি কাগজ পাঠাবে কি না, তাই আমি জানতে চাই।'

'না, তা নয়, কাগজ কেন পাঠাব না ? আমি অমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম—যদি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানতে চান।'

'India Government-কে দরখাস্ত দেব, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ব্যবহার সম্পর্কে।'

খানিক বাদে কাগজ পাঠিয়ে দিল। আমি যখন লিখছি, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে বলল, 'আমি বড়ই দুঃখিত, কাল আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি। আমার ওরকম কথা বলা অন্যায় হয়েছে। আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।'

'আচ্ছা, বেশ। কর্তব্য যা করবার করবেন, কিন্তু কথাবার্তা ভদ্রভাবে বলবেন।'

স্টেট প্রিজনারদের সম্পর্কে একটা নিয়ম ছিল, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হোক, ডেপুটি কমিশনার হোক, প্রতি মাসে একবার ক'রে দেখে যাবে ; কিন্তু বিলাসপুরে আমি যে পাঁচ মাস ছিলাম, তার ভিতর ইউরোপিয়ান ডেপুটি কমিশনারটি একবারও আসেনি। দু'একবার জেলের অফিস পর্যন্ত এসে ফিরে গেছে, শুনেছি। আমার কাছে আসতেন একজন অ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনার—বাঙালী যুবক—এস. পি. সান্যাল। বেশ ভদ্র এবং শিক্ষিত।

সেদিন সকালের মধ্যেই দ্বিতীয়বার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আবির্ভাব ; সঙ্গে একজন ; ইনি কে, তখনও তা জানিনে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ওঁকে বলল, 'কাল তো বাঘের মতো লড়াই করেছেন ; কিন্তু আমাকে আমার কর্তব্য করতেই হবে।' ভদ্রলোক নীরবে আমার দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থেকে চলে গেলেন।

বেলা বারোটা আন্দাজ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আবার এল—পেছন পেছন জেলার, ডাক্তার, গত রাত্রের সেই সব সিপাই জমাদার, আর তাদের পেছনে একজন কালাপাগড়ি নিয়ে জোড়ায় জোড়ায় মোট পঁচিশটি কয়েদী। কয়েদী চালাবার জন্যে সিপাই জমাদারের নিচে তিন শ্রেণীর কয়েদী অফিসার থাকে। এর ভিতর সর্বনিম্নস্তরে পাহারাওয়ালা, ওরাই কিছু পুরানো হলে হয় মেট, আর বড় পুরানো মেটদের মধ্যে দু'পাচজন হয় কালাপাগড়ি।

বড় ঘরটায় একখানা আলাদা খাট দিয়েছিল, দিনের বেলায় বিছানাটা সেখানে এনে দিত। শুয়ে ছিলাম, জানালা দিয়ে ওদের দেখে শুনে নিলাম, এবং আসন্ন যুদ্ধের জন্য মনে মনে তৈরি হয়ে নিলাম, কিন্তু উঠবার কোনো লক্ষণ দেখালাম না।

আগের রাত্রে ঝটাপটির সময় চশমাটা ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। আজ এসে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রথমেই চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে হুকুম দিল, 'পাকড়ো।' সিপাই জমাদাররা যখন আমার হাত-পা চেপে ধরেছে, কয়েদীরা তখন একে-একে আমার পায়ের ধুলো নিচ্ছে।

দাঁত চেপে ছিলাম। ডাক্তার কি একটা পিতলের যন্ত্র বের ক'রে আমার দাঁতের ফাঁকে ঢোকাতে চেষ্টা করল। তখন হাত-পা-মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে ওদের ছাড়িয়ে উঠে বসলাম। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলল তুলে ডেক-চেয়ারে নিয়ে যেতে। তখন আবার এক ধস্তাধস্তি; ধুতিটা এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ফেঁড়ে বেরিয়ে গেল।

তখন বেশ খানিকটা ক্লান্তও হয়েছি—এটা উপবাসের চৌদ্দ দিন। সর্ব অঙ্গেই প্রায় মানুষের হাত চেপে রয়েছে। ডাক্তার সেই পিতলের যন্ত্রটা দাঁতের ফাঁকে যখন ঢোকাচ্ছে, তখনও মাথা ঘোরানো ফেরানো চলছে। একটা স্ক্রু ঘোরাতে ঘোরাতে দাঁত ফাঁক হয়ে গেল। দাঁতের ফাঁকে একটা কাঠের টুকরো ঢুকিয়ে দিল, তার মাঝখানে একটা ছ্যাঁদা, দু'পাশে দু'টো ফিতে বাঁধা—সে দু'টোকে মাথার পেছনে বেঁধে দিল। এটাকে ওরা বলত 'gag'।

'গ্যাগে'র মাঝখানের ছ্যাঁদা দিয়ে একটা নল চালিয়ে দিল। নলটা যেন বেত দিয়ে বোনা, বেশ শক্ত। গলার ভিতরে না ঢুকে সেটা তালুতে খোঁচা মারতে লাগল; তখন বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নলটা নিয়ে খানিকটা বেঁকিয়ে আবার ঢুকিয়ে দিল, এবারে গলার বদলে নাকে খোঁচা মারতে শুরু করল। আর বেশী দূর ঢুকল না।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলল, 'এইবারে দুধ ঢালো।'

নলের বাইরের মুখে একটা কাঁচের ফানেল ছিল। তা দিয়ে খানিকটা দুধ ঢেলে দিল। বুকের কাছে তখন বেশ ব্যথা করছে।

দুধ খাওয়ানো হয়ে যেতে ছেড়ে দিল। তখন গলার ভিতর আঙ্গুল ঢুকিয়ে দু'-একবার ঘোরাতে রক্ত-দুধে মিশে বেশ খানিকটা দই আর লাল জল যেন পড়ে গেল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খানিকটা তাকিয়ে দেখে সদলবলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। বুকে তখনও বেশ ব্যথা, বমি ক'রে আরও বেড়ে গেল।

একটু বাদে স্বল্পবাক পার্শি ডাক্তার মোড়া ঘুরে এলেন। বৃদ্ধা বিধবার মতো চেহারা, বৃদ্ধা বিধবার মতোই অন্তঃকরণটা সহানুভূতিতে ভরা। বললেন, 'রাসকেলটাকে বললাম, জোর ক'রে খাওয়াবার মতো যে রবারের নল, তা আমাদের নেই, এ-নল দিয়ে খাওয়ানো উচিত হবে না। তবু কথা শুনল না। আপনার বুকে ব্যথা করছে নিশ্চয়ই।'

হেসে বললাম, 'একটু।'

'চেষ্টা করব যাতে কাল আপনাকে খাওয়ানো না হয়। দু'বার খাওয়াবার কথা ছিল, ওবেলা খাওয়ানো হবে না, বলেই গেছে। আর, এরকম ক'রে খাইয়েই বা লাভ কি হবে ? আপনি তো আরও জীর্ণ হয়ে পড়বেন।'

পরদিন সকালে আবার এসে বললেন, 'আপনাকে জোর করেই তো খাওয়ানো হচ্ছে, আপনি নল চালানোতে বাধা দেবেন না। অত ধস্তাধস্তি ক'রে, অত রক্ত পড়ে আপনি আরও তাড়াতাড়ি দুর্বল হবেন।'

হেসে বললাম, 'আমি কি সবল হতে চাইছি ?'

'সে কথা বলছি না। আপনি স্বেচ্ছায় না খেলেই তো হল। আপনি চেয়ারে বসে থাকবেন, আমরা নল চালিয়ে খাইয়ে যাব।'

'সে হয় না।'

ক্ষুণ্ণমনে ডাক্তার চলে গেলেন। ওঁর মুখখানা সর্বদাই যেন বিষাদে ভরা।

ডাক্তারকে বললাম, 'সে হয় না।' কিন্তু নিজের ভিতরটা দেখছিলাম। বিলাসপুরে পৌঁছাবার পর থেকে পরশু পর্যন্ত এই জোর ক'রে খাওয়াবার ঝঞ্ঝাট জোটেনি। নিরিবিলি আপনাকে নিয়ে আপনি থাকতাম। তিলে তিলে শুকিয়ে মরতে কতখানি সয়ে মরতে হবে, তার কল্পনা করতাম। ধীরে ধীরে মনের পর্দার পরে পর্দা সরে গিয়ে কখন যে অন্য কল্পনা এসে পড়েছে, তা টের পাইনি। গবর্নমেন্ট যেন আমাদের দাবি মিটিয়ে দিয়েছে, আমরা আবার খেতে শুরু

করেছি। সেই যে খেতে শুরু করা, তার ভিতর যত রকম লোভনীয় খাদ্য, যত রকম যা কিছু পুষ্টিকর খাদ্য বলে জানতাম, তার ছবি যেন একটার পর একটা আসছে যাচ্ছে। এটা নয়, ওটা; এরকম নয়, ওরকম। একরকম ফর্দ তৈরি করছি, মনঃপুত হচ্ছে না, অন্যরকম ফর্দ করছি।

ঝাঁ ক'রে মনটাকে একটা ঝাঁকানি দিতে গিয়ে দেখছি, এই যে ক্ষুধার দুর্বলতা, এই ভাঙা দরজার পথে মনের যত দৈন্য যত চাপা-পড়া ক্লেদ সব যেন ধরা দিচ্ছে!

নিজের অভিমানে জোর একটা ধাক্কা খেলাম। এই আমি? এই আমার সারা জীবনের সাধনা? কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং।

জীবনে যাদের ভালোবেসেছি, জীবনে মহৎ যা-কিছুর স্বপ্ন দেখেছি, একে একে আবার তাদের মনের পর্দার উপর টেনে নিয়ে আসি। বলি, আজ আমি নিঃস্ব, নিঃসম্বল, নিরলম্ব। আজ আমার কোনো কাজ নেই, খাওয়া-পরাও নেই, আজ আমার অবাধ ছুটি। আজ আমার জীবন ভরে তোমরাই শুধু থাক। তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাকে পেয়েছি—সেই 'কেবল তুমি, কেবল তুমি'।

কিন্তু মানুষের মনটা যে একটা কত বড় দুর্বার স্রোতে ভেসে চলে! কোনো খোঁটায় ওকে এক জায়গায় বেশি সময় বেঁধে রাখা চলে না। ছুটতে ছুটতে কোন্ এক অনবধান মুহূর্তে আবার এসে রক্তমাংসের খোঁটায় আটকে যায়।

এমনি মুহূর্তে এল ডাক্তারের কথাটা: 'আপনি চেয়ারে বসে থাকবেন, আমরা নল চালিয়ে খাইয়ে যাব।' এত দিনের উপোসের পর দু'দিনের এই ধস্তা-ধস্তিতে শরীরের সব গাঁটে ব্যথা হয়েছে। গলা দিয়ে আজ সকালেও রক্ত পড়েছে, বুকে বেশ ব্যথা।

পরক্ষণেই মনে পড়ল, রবীন্দ্রনাথের কথাটা, উপস্থিত মতো মানুষ যা পারে, সেখানেই তার সীমা নয়। তা যদি হতো তা হলে যুগযুগান্তর ধরে মানুষ মৌমাছির মতো একই রকম মৌচাক তৈরি করেই চলত।

যা পারি, তারই সীমার মধ্যে নিজেকে টেনে নামাবার এ চেষ্টা কেন? আমরা না জাতকে গড়ে তুলবার কাজে ব্রতী? মানুষের শক্তিকে রবীন্দ্রনাথ দু'টো ভাগে ভাগ করেছেন—এর একটার নাম 'পারে', আর একটার নাম 'পারবে'। 'পারে'র দিকটা মানুষের সহজ, 'পারবে'র দিকটায় তার তপস্যা।

এই 'পারবে'র দিকটা যখন সইতে পারি না, তখনই আমরা আদর্শকে বলি,

আমি আর তোমার দিকে যাব না, তুমিই আমার দিকে নেমে এস। এখানেই খুলে গেল নরকের দ্বার।

শিউরে উঠি। মন স্থির হয়ে যায়।

পরদিন আবার সেই খাওয়াবার পালা। ঐ দু'দিন ধরেই গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে। ডাক্তার দু'বেলাই রক্ত দেখে যাচ্ছেন।

দুপুরবেলায় আবার সেই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজনের বাহিনী। সেদিন কাপড়টা ছিঁড়ে গিয়েছিল। আজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘরে ঢুকে নিজে চশমা খুলে নিল, জমাদারকে বলল কাপড় খুলে নিতে। নইলে, সরকারী পয়সায় কাপড় কিনে দিতে হবে তো!

অতগুলো লোকের সামনে ঐ উলঙ্গ অবস্থায় ধস্তাধস্তি করছি—যেন একটা বন্য জানোয়ার! পরে কতবার ভেবেছি, কি ক'রে পারতাম?

পূর্বদিনের সেই অভিনয়েরই পুনরভিনয় হল। নলটা আজ প্রথমেই বেঁকিয়ে নিল। কিন্তু তবু রক্ত পড়তে কোনো বাধা হল না। আজও যা খাওয়াল বমি ক'রে ফেললাম।

এইরকম খাওয়ানো, বমি করা আর রক্ত-পড়া আরও তিন-চারদিন চলল।

বুকের ব্যথাটা খুবই বাড়ল। তারপর আর একদিন যখন খাওয়াতে এল, কিসে কি বুদ্ধি জুটল, জানি না। এদিন খাওয়াল নাসদ্বার দিয়ে। নলটা যখন চালিয়ে দেয়, কি অসহ্য ব্যথা! যখন বের করে নিল, আরও বেশি অসহ্য; সেই দিন থেকে যে রক্ত পড়তে শুরু হল, তাতে অনেক বছর ভুগেছি। এই ঘা শুখাবার জন্যে পরে প্রায় এক বছর ধরে প্রতিদিন স্তোলাপ-জাতীয় কিছু না কিছু খাইয়েছে। এখান থেকেই জীবনের এক সঙ্গী জুটল কোষ্ঠবদ্ধতা।

ওরা সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে টেলিগ্রাম করেছিল। এসে পড়ল মধ্যপ্রদেশের ইনস্পেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্‌স্, কর্নেল বেন্‌স্লি।

আমায় বলে, 'আপনি কি মনে করেন, আপনি আত্মহত্যা করার ভয় দেখাবেন, আর গবর্নমেণ্ট আপনাকে ছেড়ে দেবে, বা কোনো রকম সুযোগ-সুবিধা দেবে?'

আস্তে-সুস্থে বলি, 'ওসব বচন হয়ে গেছে, আর নতুন কিছু বলবার আছে?'

ও তখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং অন্যান্যদের নিয়ে বারান্দার অপর পাশে গেল, বুঝলাম, জোর ক'রে খাওয়াবার নতুন কায়দাকানুন শেখাচ্ছে। লোকটি আইরিশ। শুনলাম, ওদেশে অনশনব্রতীদের খাওয়াবার কাজে হাত পাকিয়েছে।

ওদের যা উপদেশ দেবার দিয়ে আবার আমার কাছে ফিরে এল।

অতি নম্র ভাষায় শুরু করল, 'কেন আপনি এই কষ্ট করছেন? আমার এই প্রদেশে আপনার আর যে সব বন্ধুরা এসেছেন, তাঁরা সবাই খেতে শুরু করেছেন। অন্যান্য প্রদেশের খবর আমি যা পেয়েছি, সবাই খাচ্ছেন, আপনিই শুধু কষ্ট পাচ্ছেন। আমার এই প্রদেশে আর যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রত্যেককে আমি প্রতি সপ্তাহে দু'তিন ঝুড়ি ক'রে কমলালেবু পাঠাচ্ছি নাগপুর থেকে; কেউ কেউ জেলে মুরগি পুষছেন···ইত্যাদি।'

চুপ ক'রে শুনলাম। বলল, 'আপনি খাবেন তা হলে?'

বললাম, 'না।'

কিছু সময় দাঁড়িয়ে কয়েদীদের খাওয়া দেখছিল। আই. জি এসেছে বলে সেদিন কয়েদীদের পরিষ্কার চালের ভাত দিয়েছে, বেশ ঘন ডাল দিয়েছে, আলাদা একটা তরকারি দিয়েছে। অন্য দিন দেয় বেশ মোটা মোটা কালো ভাত, এক বেলা তরকারি, এক বেলা ডাল—ডাল মানে ডালের কালো জল, আর তরকারি মানে সর্বদাই শুকনো পাতা সেদ্ধ—তার ভেতর-কফির পাতার মধ্যে পেঁপের পাতা পর্যন্ত মিশে যায়। মাটি মেশানো কালো একরকম নুন দেয়, তাতে ডাল তরকারিতে নুনের স্বাদ লাগে না—এসব কথা কয়েদীদের মুখে শোনা।

সেদিনের খাবার দেখে কিন্তু আই. জি বলল, 'এত ভাল খাবার দিও না—. তা হলে ওরা বার বার জেলে আসবে। ডাল আর তরকারি দু'টোই একবেলায় দিও না, বরং ডালের মধ্যে তরকারি সেদ্ধ দিয়ে দিও।'

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বলল, 'All right, sir.' অন্য দিন যে কি করে, তা আর বলল না।

আই. জি-কে বিদায় ক'রে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আবার এল। সঙ্গে প্রতিদিনের সেই দলবল। কিন্তু আজ ব্যবস্থা ভিন্ন। বারান্দায় ঘরের একটা জানালার গায়ে একখানা লোহার খাট এনে ফেলল। রোজকার মতো চশমা ও ধুতি কেড়ে নেওয়া, ধস্তাধস্তি সবই হল। তারপর আমায় খাটের উপর নিয়ে ফেলল। সেখানে ঝটাপটিতে হাত-পা অনেক জায়গায় কেটে ছিঁড়ে গেল। পরে পা দু'টোকে গোড়ালির ও হাঁটুর উপরে লোহার পাতের সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধল, বুকের কাছটা এবং কনুই ও হাতের কব্জিটা জানালার গরাদের সঙ্গে তেমনি বেঁধে নিল। অন্যদিনের মতো মাথা ঘোরাবার বা ফেরাবার আর প্রায় উপায়

রইল না—জানালার দুটো শিকের মাঝখানে মাথাটা একজন অনায়াসে চেপে ধরে রইল। আজ নল চালাল কিন্তু নাক দিয়ে। আজকের নলও অন্যরকমের—রবারের নরম সরু নল—অনায়াসে বুকের নিচে অবধি চলে গেল, বেশ টের পেলাম। তখন দুধ ঢালল। আজ অনেকটা বেশি পরিমাণেই ঢালতে পারল।

আমারও আজ বমি করতে কম বেগ পেতে হল। রক্ত কিন্তু অন্য দিনের মতোই পড়ল—বোধহয় ভিতরে কোথাও একটু ঘা হয়ে গিয়েছিল।

বিকালে কয়েদীদের খাইয়ে দাইয়ে ঘরে বন্ধ করতে নিয়ে যাবার আগে ঘরের সামনে ইয়ার্ডের ভিতর জোড়ায় জোড়ায় ফাইল ক'রে বসায়। সেখান থেকে গনতি মিলিয়ে ওআর্ডে নিয়ে বন্ধ করে। আবার ভোর বেলায় ওআর্ড থেকে বের করে ও ঐভাবে ঐখানটায় বসায়। সেইদিন থেকে আমায় বাঁধবার জন্যে ওরা কয়েদী নিয়ে আসতে শুরু করল, সেই দিন থেকে সমস্ত কয়েদীরা রোজ সকাল-সন্ধ্যায় ফাইল-বন্ধ আমায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। প্রণাম ক'রে উঠে বসে জোড়হাতে কি কাতর মিনতি জানায়।

সন্ধ্যাবেলা ওরা বন্ধ হতে যাবার পর আর সকালবেলা ঘর খুলে দিতেই আমি ইয়ার্ডের পেঁপে গাছগুলোর তলায় কাঁকরের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে কিছু সময় পায়চারি করি।

আই. জি বলে গেল, আর সবাই খেতে শুরু করেছেন। মনে মনে জানি, এরকম মিথ্যা কথা ওরা বলবেই। কিন্তু কে জানে? সবার খবর পাবারও তো উপায় নেই। চন্দ্রিকাপ্রসাদ রোজকার মতো ওআর্ডটা ঘুরে পেঁপে গাছতলায় এসে বললেন, 'Good morning.'

আমি প্রতি-নমস্কার জানালাম। অন্যদিন যা বলবার উনিই বলেন। আজ জিজ্ঞেস করলাম, 'আই. জি যে বলে গেল, আর সবাই খেতে শুরু করেছে, আপনি কিছু খবর জানেন?'

'আমিও যতদূর শুনেছি, তা-ই সত্যি। শহরে বাঙালীরাও তা-ই বলেন। আমি সঠিক খবর নিয়ে আপনাকে বলব।'

সবাই খেতে শুরু করেছে? কিন্তু কি ক'রে সম্ভব হয়? একে একে সবার কথা মনে পড়ে। বয়স্ক যাঁরা, রুগ্ন যাঁরা—তাঁদের বলে দেওয়া অবিশ্যি আছে যে, তাঁরা যখন খুশি অনশন ছেড়ে দিতে পারেন। কিন্তু আর সবাই? সত্যেনদা, মনোরঞ্জনদা, সুরেশ দাশ—এঁরাও সব ছেড়ে দিয়েছেন? অসম্ভব।

রাতদিন মনটার ভিতর তোলপাড় করতে থাকে। এঁদেরও কারো কারো কথা আজ চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে বসি···মনে পড়ে এই সেদিনের কথা। আলিপুর জেলে দু'একজনের সঙ্গে আমার মিশতে ভালো লাগত না—আজ যাঁদের কথা বেশি ক'রে ভাবছি, তার ভিতর একজন বলতেন, 'না, মেশা প্রয়োজন।'

একটা ছোট কথা। কিন্তু এর ভিতর যেন সেই ভবানী পাঠকের কথা 'দোকানদারী'—এর সঙ্গতি দেখতে পাই। আমার পক্ষে যা প্রয়োজন, আমার সে সম্পর্কে আগ্রহ থাকবে না কেন? আবেগ থাকবে না কেন? আমার যাতে আগ্রহ নেই, আবেগ নেই, আমার পক্ষে তা প্রয়োজন কিসে? I do but sing because I must. মনে হল, এঁরা জীবনে শ্রেয়ের সন্ধান করেছেন, প্রেয়কে তুচ্ছ করেছেন। শ্রেয়ের প্রেয়ের যোগ ঘটেনি এঁদের সবার জীবনে।

হয়তো অসম্ভব নয়—এঁরা আজ অনশন ছেড়ে দিয়েছেন। তবু কয়েকজনের কথা ভাবতে পারিনে।

চন্দ্রিকাপ্রসাদ দু'একদিন পরে বললেন, 'যতদূর খবর পেয়েছি, আপনাদের যে বন্ধু অমরাবতী জেলে আছেন, তাঁর উপবাস এখনও চলছে, আর সবাই ছেড়ে দিয়েছেন।'

অমরাবতী জেলে ছিলেন সত্যেনদা।

বোধহয় গলার আর বুকের ঘা শুখাবার সুযোগ দেবার জন্যই এর পরদিন দুধ খাওয়াল আবার মলদ্বার দিয়ে—যদিও ডাক্তার রোজই রিপোর্ট দিয়ে যাচ্ছিল যে মলদ্বার দিয়েও রক্ত পড়ছে।

যাই হোক, গলার বা বুকের ঘা বোধ হয় শুখিয়ে গেল—এর পর এক একদিন নাক দিয়ে, এক একদিন মুখ দিয়ে খাওয়ায়। রক্ত আর পড়ে না।

খাওয়ায়, আমিও রোজ বমি ক'রে ফেলে দিই। ওজন রোজই কমে—কোনোদিন এক পাউণ্ড, কোনোদিন আধ পাউণ্ড। ফলে দিনে দুইবার খাওয়াবার ব্যবস্থা করল। সঙ্গে ডিম ভেঙে মিশিয়ে দিতে লাগল।

আবার আই. জি-র নির্দেশ এল, খাওয়াবার পর ঐ বাঁধা অবস্থাতে আধঘণ্টা রেখে দেবে, তাতে বমি করতে পারবে না। খুলে দেবার পর চেষ্টা করলেও বমির সঙ্গে বিশেষ কিছু পড়ত না; কিন্তু চেষ্টা প্রতিবারই করতাম।

একমাস হয়ে গেল। সঙ্গী নেই, সাথী নেই—একলা বসে থাকি, নয়তো পেঁপে গাছের তলা দিয়ে একলা একলা ঘুরি। ভোরে যখন খুলে দেয়, তখনও আকাশে

তারা থাকে। আমার জীবনে বন্ধু, সহকর্মী যারা এসেছে গেছে, আজ তারাও যেন ঐ তারার দলের মতোই কত দূরে! এ জীবনের সম্পর্ক যে তাদের সঙ্গে চুকে গেছে। এমনি চলতে চলতে একদিন এখানেই পড়ে যাব—সেই শেষ—আমার যারা আপনার ছিল, তাদের সাথেও সেই আমার শেষ।

কি-ই বা আসে যায়? ঐ অনন্ত কোটি গ্রহ নক্ষত্র—তার ভিতর আমার মতো কত অনন্ত কোটি জীব। প্রতি মুহূর্তে, প্রতিদিন তাদের কত জীব পড়ে যাচ্ছে, খসে যাচ্ছে, নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। কি আসছে যাচ্ছে তাতে এই সৃষ্টির! আমার নিজের মৃত্যুটাকেই বা তাই এত বড় ক'রে দেখবার কি আছে? জন্মেছি যখন, চিরদিন বেঁচে থাকব না—তা হলে নিজেকেই বা সৃষ্টির কেন্দ্র ক'রে দেখছি কেন? সলোমনের কথা, Vanity of vanities, all is vanity.

আমার সহকর্মী বন্ধুদের কথা ভাবছি—আমায় ছাড়া আজও তাদের দুনিয়া তো স্তব্ধ হয়ে যায়নি, সুখে দুঃখে চলে যাচ্ছেই। তারাও হয়তো এতদিনে ধরা পড়ে গেছে। কর্মক্ষেত্রে তারা নেই, তবু কর্মক্ষেত্র যেমন ক'রে হোক চলে যাচ্ছে।

তবু ইচ্ছা হয় জানতে Alexander Selkirk-এর মতো—My friends, do they now or then send a wish or thought after me? হয়তো চিন্তা করে, হয়তো দুঃখ করে, হয়তো দু'ফোঁটা চোখের জলও ফেলে। সেই কল্পনাই আমার কাছে পরম তৃপ্তি বয়ে নিয়ে আসে।

কিন্তু এ তৃপ্তিরও তো আমার তরফ থেকে একটা মূল্য দেবার আছে! সে মূল্য আমার দেওয়া হয় যদি আজকের ব্রতে আমি সফল হই, না হয়তো যদি মরি। তারা দেবে তৃপ্তি, আমি দেব গৌরব। 'আকাশ আমায় ভরল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে।' মানুষ এমনি করেই পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নিজে নিঃশেষ হয়, সৃষ্টি এগিয়ে চলে। এ না হলে সৃষ্টির আর কি অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়?

পঁয়তাল্লিশ দিন হয়ে গেল উপবাসের। বাবা এলেন দেখা করতে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ভোরের দিকে এসে জানিয়ে গেলেন। তারপরই বাবাকে সাথে নিয়ে জেলার ভিতরে এল। আমি তখন শুয়ে ছিলাম। আমার চেহারা দেখে, গায়ে কাটাছেঁড়ার দাগ দেখে বাবা হু হু ক'রে কেঁদে উঠলেন।

বললেন, 'স্টিফেনসন টেলিগ্রাম ক'রে কলকাতায় আসতে বলেছিল, সেক্রেটারিয়েটে দেখা করতে বলেছিল। সেখানে খুব ভদ্র ব্যবহার করেছে, পথ খরচার টাকা দিয়ে বলেছে, যান, আপনার ছেলেকে খাইয়ে আসুন, আর সবাই খেতে শুরু করেছে, আপনার ছেলে মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছেন।'

রাতের বেলায় স্টেশনে পৌঁচেছেন। একজন বাঙালী রেল কর্মচারী তাঁকে নিয়ে যান বাঙালীদের একটা মেসে—তাঁরা সেখানে আলোচনা ক'রে ওখানকার একজন ব্যারিস্টার নগেন্দ্রনাথ দে'র বাসায় তুলে দিয়েছেন। তিনি খুব যত্ন করছেন। তিনিই জেল পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন, কিন্তু দেখা করার অনুমতি নেই বলে তাঁকে অফিসে বসিয়ে রেখেছে।

জেলার কিছু সময় কাছে দাঁড়িয়ে দেখল, আমরা বাংলায় কথা বলি, কাছে থেকে কিছু লাভ নেই, আমি তাকে বসতেও বললাম না, তখন বারান্দায় গিয়ে বসে রইল। কিছু সময় বাদে অফিসে চলে গেল।

বাবা কাঁদতে কাঁদতে গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন। গায়ের দাগগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মারধর করে কি না। আমি বললাম, না। যা যা বলে সান্ত্বনা দেওয়া চলে, বলতে চেষ্টা করলাম।

সকালে প্রায় বারোটা পর্যন্ত রইলেন। আবার ছুটোয় এলেন, প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত রইলেন। পরের দিনও ঐ রকম। ঐ দু'দিন সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও আর খাওয়াবার চেষ্টা করলেন না। ঐ কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাদ দিতে পারলে কে আর করে? তা ছাড়া, বাবা ওখানে থাকতে থাকতে গায়ে আর তাজা ঘা-ও হয়তো দেখাতে চায়নি। হয়তো আশা করেছে, এইবারে আমি খাব।

বাবা অনেক ক'রে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। অনেক কাহিনী বললেন। দুঃখ-কষ্ট কি, জীবনে কখনও জানেননি। এখন অবস্থা ভাঙছে। মা প্রায়ই অসুস্থ থাকেন, চোখে ভালো দেখতে পান না, চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ে। আমার উপরেই সব আশা-ভরসা।

তাঁর তরফ থেকে একই সব কথার পুনরাবৃত্তি, অনুরোধ, অনুনয়, চোখের জল। আমিও শেষ পর্যন্ত একটি কথারই পুনরাবৃত্তি করতে রইলাম। আমরণ উপোস করব যদি না আমাদের দাবি মেটানো হয়—এই সংকল্প আমরা দেশের নেতৃস্থানীয়দের জানিয়েছি, সেই নেতৃস্থানীয়রা যদি বলেন, তা হলেই শুধু খেতে পারি। তাঁদের সবার সঙ্গে বাবার দেখা করা সম্ভব নয়। চারজনের নাম বলে দিলাম—সি. আর. দাশ, মতিলাল ঘোষ, রামানন্দ চ্যাটার্জি ও হীরেন দত্ত। এঁদের সৎলোক বলে জানতাম, সহানুভূতিও এঁদের কাছে পাবেন, জানতাম। প্রেসিডেন্সি কলেজে ওটেন প্রহারের ব্যাপারে শেষোক্ত দু'জনের আলোচনা শুনেছিলাম। হীরেনবাবু তো বেশ খুশিই হয়েছিলেন।

বাবাকে বলে দিলাম, এঁরা যদি খেতে বলেন, টেলিগ্রাম করবেন। আমার

নিজের মনে ছিল, এঁরা তো খেতে বলবেনই, কিন্তু তখনও মন স্থির করবার কাজ আমার নিজের। বাবা বুঝলেন, এটা একটা স্তোকবাক্য মাত্র। দ্বিতীয় দিনে নগেনবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমায় অফিসে নিয়ে গেল, দু'জনে ধরে সাহায্য করল। অফিসে নগেনবাবুর সঙ্গে সেই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার এস. পি. সান্যালও বসে ছিলেন—সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইচ্ছা করেই তাঁকে রেখেছিল, আমাদের বাংলা কথা বোঝবার জন্যে—পাছে গোপন কিছু বলে দিই। গোপন বলবার আমার কি থাকতে পারে, অফিসারদের পক্ষে সে-কথা ভাববার নিয়ম নেই।

নগেনবাবুও খাবার জন্যে অনেক অনুরোধ করলেন; বললেন, ভূপেন বোস মশায় তাঁর আত্মীয়। তিনি তাঁকে লিখবেন যেন মণ্টেগুকে সব জানান। আমার কাছে গোপন কথা নগেনবাবু একটা বললেন: আমাদের অনশন নিয়ে বাইরে খুব আন্দোলন হয়েছে, এমনকি মিসেস অ্যানি বেশান্ত তাঁর কংগ্রেস সভাপতির বক্তৃতায় অনশনের উল্লেখ ক'রে স্টেট প্রিজনারদের প্রতি ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করেছেন। মিঃ সান্যাল এসব কথায় একটুও বাধা দিলেন না। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অনুপস্থিত থাকলে তিনি মাঝে মাঝে তাঁর জায়গায় কাজ করেন। তিনি আমার সব কথাই জানেন। খেতে অনুরোধ করার মধ্যেও আজ তিনি যোগ দিলেন না।

বাবা কলকাতায় গিয়ে, শুধু চারজন নয়, আরও অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সবার কাছেই সহানুভূতি পেয়েছিলেন, সবাই খেতে অনুরোধ করতে বলেছিলেন। শুধু রামানন্দবাবু বলেছিলেন, 'বাইরে থেকে এভাবে অনুরোধ জানানো আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না।'

বাবার টেলিগ্রাম পেলাম, 'সবাই তোমায় খেতে বলছেন। তুমি খেয়ে আমায় টেলিগ্রাম করবে।'

ততদিনে আমার অবস্থার অন্য রকম পরিণতি শুরু হয়েছে। একান্নদিন যেদিন হল, সেইদিন রাত থেকে অনিদ্রা শুরু হল। মাঝে মাঝে দু'চার মিনিটের তন্দ্রা ছাড়া ঘুম হতো না। বিলাসপুরের প্রচণ্ড শীত, সেলে ঠাণ্ডা আরও বেশি। ওরা গায়ে দেবার জন্যে একখানি রেজাই কিনে দিয়েছিল। ঐ অবস্থায় থেকে ওদের কাছে কিছু চাইতে ইচ্ছা হতো না। অনিদ্রায় হোক, শীতে হোক, দুর্বল ক'রে ফেলছিল। চুয়ান্ন দিনের দিন একদিনে দু'পাউণ্ড ওজন কমে গেল। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তারকে বলল, শুধু দুধ আর ডিম নয়, কাল থেকে কাজি

তৈরি করিয়ে রাখবে। কাঞ্জি মানে প্রচুর জলে খুদ সিদ্ধ করা। আর তার সঙ্গে সামান্য পরিমাণ rum দেবে। Rum এক রকম মদ।

দুধে, ডিমে, কাঞ্জিতে পরিমাণটা সেদিন বেশ ভারি হয়ে পড়ল। কিন্তু খাইয়ে যেমন নল বের করেছে, সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনি সবটা বমি হয়ে গেল। চেষ্টা একেবারেই করতে হল না। চেষ্টা করার সুযোগও হল না, হাত-পা বাঁধা অবস্থাতে বমি হল। বমির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পিত্তও পড়ল। আজ আর বমি যেন থামতে চাইছে না। হয়রান হয়ে পড়লাম। দেখে-শুনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাঁধন খুলে দিতে বলল। সেদিন আর দু'বেলা খাওয়াল না।

একটু বাদে ডাক্তার ঘরে এসে বললেন, 'আমি বেআকুবটাকে বলেছিলাম, পরিমাণে এতটা আপনার পেটের বর্তমান অবস্থায় সইবে না; ও আমার কথা শুনল না।'

এখন এত দুর্বল বোধ হতে লাগল যে আর ধস্তাধস্তি করি না। ডেক-চেয়ারে বসে থাকি, ওরা নল চালায়, একবেলা অল্প পরিমাণে দুধ খাওয়ায়। কিন্তু যা খাওয়ায় তা-ই বমি হয়ে যায়, বরং পিত্ত মিশে পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। এক-একবার বমি হয়, আর একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ি।

এখন আর বেড়াতে পারিনে। শুয়ে-বসে স্বপ্ন দেখি—একক ধূমকেতু একটি যেন এক অজানা অক্ষপথে আপন গতিবেগে ছুটে চলেছে, গতির বেগে অণু-পরমাণু তার পথে পথে ছড়িয়ে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

কোথায় চলেছি, কি হবে, ভাবতে পারি না, ভাবতেও চাই না।

প্রায় সময় ঘরে খাটে শুয়ে থাকি, কখনও বারান্দায় ডেক-চেয়ারে এসে বসি। কোনো গতিকে স্নানের জায়গাটায় একবার যাই। স্নান না ক'রে পারিনে।

এইবারে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হুকুম দিল, 'খাদ্যের মারফত পুষ্টিকর যখন কিছু পাচ্ছেন না, তখন অন্যভাবে চেষ্টা করতে হবে, রোজ অন্তত একঘণ্টা ক'রে সমস্ত গায়ে আস্তে আস্তে তেল মালিশ করে দেবে।'

আমায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি তেল মাখতে অভ্যস্ত?'

'সরষের তেল।'

সরষের তেল এখানে বড় গরম হবে। ডাক্তারকে বললেন, 'অর্ধেক সরষের অর্ধেক তিলের তেল মিশিয়ে এই কয়েদীটিকে দিয়ে এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা ধরে মালিশ করাবেন।'

তা-ই চলল। কিন্তু দুর্বলতাও আর কাটে না, বমিও বন্ধ হয় না।

চন্দ্রিকাপ্রসাদ এসে বলেন, 'অমরাবতীতে মিঃ সেন এখনও উপোস করছেন। বাঙালীরা বলছেন, তাঁরা সব জায়গা থেকে খবর নিয়েছেন, আর সবাই খেতে শুরু করেছেন। আপনাকে তাঁরা খেতে বলেছেন।'

জেলের সিপাই কয়েদী, আমার ঘর দেখা যায়, এমন জায়গা দিয়ে যে যায়, সেই দূর থেকে প্রণাম করে। একটি কয়েদী কালা-পাগড়ি ছিল—জেলের মাঝখানে সব দিকের ইয়ার্ডে ঢুকবার গেট সে খোলে, বন্ধ করে—নাম শেখ গটু। আমি একদিন দুপুরে বারান্দায় ডেক-চেয়ারে বসে আছি, তখন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জেলার জমাদার কারও ভিতরে আসবার সম্ভাবনা নেই। গটু চাবি এক সিপাইর হাতে দিয়ে ছুটে আমার কাছে এল। আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলতে লাগল, 'দাদা, তুমি খাও।'

আমি পা ছাড়িয়ে নিয়ে তার মাথাটা বুকের ভিতর টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, 'সে হয় না।'

তার সে পাগলের মতো কান্না আর থামে না, তাকে কিছুতে বোঝানো যায় না।

সে সুবিধা পেলে প্রায় রোজই আসে, আমায় 'দাদা' বলে ডাকে, আর ঐরকম কাঁদে। ছেলেমানুষ, অত্যন্ত গরীব, লেখাপড়া খুব সামান্য জানে; চেহারায় সৌন্দর্য নেই, কিন্তু এই যে দরদভরা মনটা, তার ছাপ মুখে মাখানো। সামান্য অপরাধ—তারই জন্য জেল দিয়েছে এক বছরের। ওর সাথে আলাপে মনটা তৃপ্তিতে ভরে যায়।

জেলারের এক ভাগ্নে তার বাড়িতে থেকে পড়ে। স্কুলের বাঙালী ছেলেরা ধরেছে, আমার সাথে দেখা করিয়ে দিতে হবে। দুপুরবেলায় এক-এক দিন তিন-চারজন ক'রে নিয়ে আসে। গেটের সিপাইও বাধা দেয় না, শেখ গটু তো দেয়ই না। অনেকের সাথে একে একে আলাপ হয়। ওরা বলে, আমার অবস্থা দু'চারদিন পর পরই অমৃতবাজার পত্রিকায় বের হয়। ওখানকার বাঙালীরা খবর পাঠান।

একদিন আমার ওজন তিন পাউণ্ড কমে গেল। তার দু'দিন বাদে মধ্য প্রদেশের I. G. C. H. (ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ সিভিল হস্‌পিটাল্‌স্) এল। মুরুব্বি চালে দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করল। দু'এক কথায় জবাব দিয়ে আমি চুপ ক'রে রইলাম। সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে বলল, হয়তো আবার নলঘার দিয়ে খাওয়াবার প্রয়োজন হবে।

আরও দু'দিন বাদে। সেটা বোধহয় উপবাসের সাতষট্টি দিন। চন্দ্রিকাপ্রসাদ ভোরে এসে বললেন, 'আজ চীফ কমিশনার আসছেন।' তখনও পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশ চীফ কমিশনারের প্রদেশ।

আরও বললেন, অমরাবতীতে মিঃ সেন উপবাসে মৃত্যু হয় না দেখে একষট্টি দিনের দিন গলায় দড়ি দিয়ে মরতে চেষ্টা করেছিলেন। রশিতে একখানা গীতা, একখানা চণ্ডী বাঁধা ছিল। তাতে আটকে গিয়ে দম বন্ধ হতে দেরি হয়েছে ইতিমধ্যে তাঁকে খুলে নামিয়েছে। আত্মহত্যার চেষ্টা করার জন্য সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁর নামে মামলা করার অনুমতি চেয়েছেন। আই. জি ফাইল চীফ কমিশনারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই ফাইল এখানে এসে গেছে।

চীফ কমিশনার এল না, এল তার চীফ সেক্রেটারী। এসে বলল, ওয়ার্ধাতে একটা বিদ্রোহ মতো লেগে গেছে, তাঁকে সেখানে যেতে হল। আমাকে আপনার এখানে পাঠিয়েছেন, আপনাকে খেতেই হবে।

আমার নতুন ক'রে আর কিছু বলবার ছিল না। চীফ সেক্রেটারী চার দিন ওখানে রয়ে গেল—রোজ সকালে বিকালে আমায় দেখতে আসে, খেতে অনুরোধ করে।

ইতিমধ্যে চীফ কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে সত্যেনদার সম্বন্ধে জবাব পাঠাল— জেলে কি ক'রে তাঁর পক্ষে আত্মহত্যার চেষ্টা করা সম্ভব হল? এর জন্য দায়ী জেলের আইন-শৃঙ্খলা। স্টেট প্রিজনারের নামে এর জন্য মামলা চলতে পারে না। স্টেট প্রিজনারকে বন্দী ক'রে রাখার ওয়ারেন্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের উপর। স্টেট প্রিজনার যদি পালায়, তা হলে তার জন্যও মামলা হবে সুপারিন্টেণ্ডের নামে।

খবরটি চন্দ্রিকাপ্রসাদ বলে গেলেন। আরও বলে গেলেন, ঐ দিন থেকে সত্যেনদা খেতে শুরু করেছেন।

শেষ দিন চীফ সেক্রেটারী এসে বলল, আর তো আমি থাকতে পারছিনে। আপনি খেলেন না, আমিই বা আর কি করতে পারি? আমি তো ডাক্তারও নই। আমি ফিরে গিয়ে বরং কর্নেল বেন্‌স্‌লিকে পাঠিয়ে দেব।

কর্নেল বেন্‌স্‌লি এলেন বাহাত্তর দিনের দিন। খাওয়ানো বন্ধ ক'রে দিলেন। তিনদিন ধরে পেটের ভিতর নল চালিয়ে দিয়ে কি একটা ঔষধ দিয়ে পাকস্থলীকে ধুয়ে নিলেন। পঁচাত্তর দিনের দিন একটা ফিডিং কাপে ক'রে দুধ নিয়ে এলেন। কর্নেল বেন্‌স্‌লির প্রথমবারের সে-চেহারা আর নেই। আমার

ডেক-চেয়ারের পাশে একটা চেয়ারে বসে আমার মাথাটা কোলের উপর টেনে নিয়ে বললেন, 'আপনাকে মরতে কিছুতেই দেব না। We'll make you live at least for your parents' sake.' এই বলে ফিডিং কাপের নলটা আমার মুখের ভিতর চেপে দিতে চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি দাঁত চেপে মুখ বুজে রইলাম।

খাওয়াতে না পেরে হতাশ মুখে চলে গেলেন। সন্ধ্যার দিকে আবার এলেন—হাতে একখানা টেলিগ্রাম। 'আমার যা করবার করেছি। এখন আমার conscience clear. আর তো আমি কোনো কাজেও লাগব না। আজ আমি চলে যাচ্ছি। আশা করি, আপনার মঙ্গল হবে।'

সেই রাত্রি থেকে আর আমায় সেলে থাকতে হয়নি। তবে ঘুম তো আমার তখন ছেড়েই গেছে।

পরদিন ভোরে চন্দ্রিকাপ্রসাদ বললেন, 'আই. জি এখানে এসেই ভারত গবর্নমেণ্টকে টেলিগ্রাম করেছিলেন, আপনি এখন খেতে আরম্ভ করলেও আপনার বাঁচবার সম্ভাবনা নেই। কাল সেই টেলিগ্রামের জবাব এসেছে, আপনার dying body আপনার বাপমাকে দিয়ে দিতে।'

বোধ হয় ঐ মর্মে টেলিগ্রাম বাবার কাছেও গিয়েছিল। তিনি কাঁদতে কাঁদতে রওনা হলেন। বাড়ি থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে ষ্টিমার ঘাট। শেষ রাত্রে ষ্টিমার ছাড়ে। শীতের রাত। যখন ঘাটে পৌচেছেন, তখন সিঁড়ি টানতে শুরু করেছে, তাড়াতাড়িতে উঠতে গিয়ে জলে পড়ে গেলেন। চাকর এবং অন্যান্য লোকের সাহায্যে উঠলেন। আবার সারাপথ কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এলেন। এসে অসুখে পড়লেন। মা-ও তখন খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।

১৪ ফেব্রুআরী। উপবাসের ছিয়াত্তর দিন। বিকেলে খুব একটা ধুলিঝড় বয়ে গেল। সেইদিনই ওখানকার শীত কেটে গিয়ে গরম পড়ে গেল।

ডাক্তার মোডী আজ খুব গম্ভীর। দুইবার অল্প অল্প পরিমাণ দুধ খাইয়ে গেলেন—আগের মতোই নল চালিয়ে। পরদিন খুব সকালে এলেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বললেন, 'আপনার জন্যে কয়েকখানা কাগজ এনেছি, আর একটা পেন্সিল। আপনার যাকে যাকে প্রয়োজন, চিঠি লিখুন। যেখানে গিয়ে বলেন, আমি চিঠি দিয়ে আসব।'

'আমি আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ। কিন্তু কাকে আমি চিঠি লিখব? কি আর আমার লিখবার আছে?'

'আপনি যাকে খুশি লিখুন। আপনি বাঁচবেন না। শেষকালে এতটুকু কাজ আপনার ক'রে দিতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। কাগজগুলো বাক্সে রেখে যাচ্ছি।'

আমি চাকরটাকে দেখিয়ে বললাম, 'ওর সামনে রাখবেন না।' অত্যন্ত নীরেট রকমের এই মারাঠী চাকরটাকে আমি বিশ্বাস করতাম না।

কিন্তু ডাক্তার তখন বেপরোয়া। মুখের ভঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, বয়ে গেছে।

ডাক্তার চলে যাবার পর চাকরটা রোজকার মতো কুঁজোয় জল ভরতে গেল। ফিরে আসবার পর বোধ হয় দুমিনিটও কাটেনি জেলার এসে উপস্থিত, পেছনে বড় জমাদার।

একটি কথাও না বলে জেলার আমার খোলা ট্রাঙ্কটা খুলে ফেলল। বাক্স থেকে কাগজ কয়খানা ও পেন্সিলটা নিয়ে বাক্স বন্ধ ক'রে চলে গেল।

আমার ভিতের ঝড় বইতে শুরু করল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এল সেদিন দুপুরের পরে। কিসে কি হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারলাম না—হঠাৎ ডেক-চেয়ার ছেড়ে উঠে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কাঁধে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'ডাক্তারকে আপনার ছেড়ে দিতে হবে।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলে, 'হাঁ, ছেড়ে দেব, আপনি খেতে শুরু করুন।'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে জেলার এবং অ্যাসিস্টাণ্ট জেলার চন্দ্রিকাপ্রসাদের দিকে একবার তাকাল। তাকাবার ভঙ্গিটায় আমার চমক লাগল। চন্দ্রিকা-প্রসাদের মুখে একটা অস্বাভাবিক রকমের করুণ হাসি।

মুহূর্তে আমার জ্ঞান হল, আমি কি করছি। ধপ ক'রে এসে আবার চেয়ারটায় বসে পড়লাম।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আবার বলল, 'বলুন, আপনি খাবেন, আমি ডাক্তারকে ছেড়ে দেব।'

আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। ওরা চলে গেল।

তখন থেকে সমস্ত রাতটা ধরে ঐ একটা কথাই কেবল মনে হতে লাগল, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি? মরতে পারলাম না, শেষকালে পাগল হয়ে আমায় বেঁচে থাকতে হবে?

আমার উপকার করতে গিয়ে ডাক্তার বেচারীর সর্বনাশ হবে? ঘুম তো অমনিতেই হতো না, সমস্ত রাতটা ছটফট ক'রে কাটল।

১৬ ফেব্রুআরী। উপোসের আজ আটাত্তর দিন।

ভোর বেলায় চন্দ্রিকাপ্রসাদ এলেন। 'Good morning' জানিয়ে বললেন, 'ভালো খবর আছে।' বলে কিন্তু আর দাঁড়ালেন না। এ তো চন্দ্রিকাপ্রসাদের পক্ষে অস্বাভাবিক। মনে হল, কারণ দুটো হতে পারে। এক, ডাক্তারের ব্যাপারে হয়তো চন্দ্রিকাপ্রসাদ ভয় পেয়ে গেছেন। পাছে বেশি সময় ধরে কথা বললে সিপাই জমাদার রিপোর্ট ক'রে দেয়। আর কাল যে রকম পাগলের মতো ব্যবহার করেছি, তাতে যদি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে কিছু বলে বসি।

ঐ দুই দুর্ভাবনা নিয়ে কাটাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে লাগল চন্দ্রিকাপ্রসাদের কথা—সুখবর আছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সকাল সকালই এল। আজও কালকের মতো ডাক্তার সঙ্গে নেই। বলল, গবর্নমেণ্ট আপনাকে জানাতে বলেছে, গবর্নমেণ্ট দুটো কমিটি করেছে—বিশিষ্ট জজ ও বেসরকারী লোকদের নিয়ে। একটা তদন্ত করবে আপনারা কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন কি না, তাই নিয়ে। আর একটা আপনাদের অনেকের বিরুদ্ধে যা চার্জ—তাই নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে বিবেচনা করবে। যাঁদের বিরুদ্ধে চার্জ প্রমাণ হবে না, তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে।

এই দুইটি কমিটিই, পরে জানলাম, রাওলাট কমিটি ও বীচক্রফ্‌ট-চন্দ্রভারকর কমিটি।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আরও বলল, 'গবর্নমেণ্ট আপনাকে জানাতে বলেন নি, তবু আপনাকে জানাচ্ছি—স্টেট প্রিজনারদের প্রতি আরও ভালো ব্যবহারের জন্য গবর্নমেণ্ট নতুন সব আইনকানুন তৈরি করেছেন। আমাকেও তার নকল পাঠানো হবে।'…এখন বলুন আপনি খাবেন।'

ভেবে দেখলাম, আর আমার সময় নেওয়া উচিত হবে না। প্রথমতঃ, পাগল হওয়া থেকে বাঁচতে হবে; দ্বিতীয়তঃ, যদি সম্ভব হয় ডাক্তারকে বাঁচাতে হবে।

তাছাড়া, আর সবাই যে অনশন ছেড়ে দিয়েছেন সে বিষয়ে এখন আর সন্দেহ নেই। আর আমরা যা চেয়েছিলাম, সবাই অনশন ছেড়ে দেবার পরে এর চেয়ে ভালোভাবে সে দাবি মিটবে বলে আশা করা যায় না।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বললাম, 'খাব, কিন্তু একটা শর্তে। আপনার মর্যাদাবোধের উপর ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু একটা কথা দিতে হবে।'

'কি?'

'ডাক্তারকে কোনো শাস্তি দেবেন না।'

'না, দেব না।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হাসপাতালে সুপ তৈরি করার আদেশ দিয়ে চলে গেল।

জেলখানার সাধারণ অবস্থা যাঁরা জানেন না, বিশেষতঃ ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনের রাজবন্দীদের সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টির সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা নেই, তাঁদের মনে হবে, ডাক্তার মোডী তো দিয়ে গেলেন মাত্র কয়েকখানা সাদা কাগজ আর পেন্সিল, তা নিয়ে আমি অত অস্থির হয়ে উঠলাম কেন? কি-ই বা ডাঃ মোডীর ওতে হতো?

চিঠির কাগজ ইত্যাদি জেলের আইনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিনা অনুমতিতে ভিতরে ঢুকতে পায় না। তারপর স্টেট প্রিজনারদের কোনো চিঠি বাইরে যাবে, সে তো কল্পনার অতীত। একজন স্টেট প্রিজনারকে ঔষধ খাবার জন্য এক তোলা চিনি দেবে, এই রকম সরকারী হুকুমনামায় উপরও অঙ্কিত থাকবে 'Confidential' বা 'গোপনীয়'।

কিন্তু অস্থির হয়েও ডাঃ মোডীকে বাঁচাতে পারলাম না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ পরঞ্জপে তার কথা রাখল না। এই মারাঠী ব্রাহ্মণ আর মারাঠা জেলার বেঙ্কট রাও দুইজনই স্বাধীনচেতা পার্শী ডাক্তার মোডীকে ঘৃণার চোখে দেখত। এখন এমন সুযোগ ছাড়ল না। সেইদিনই হুকুম হল, নরসিংগড় জেলায় তখন প্লেগ লেগেছে—ডাঃ মোডীকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে ডিউটির জন্য রওনা হতে হবে। যতদূর খবর নিতে পেরেছিলাম, তাতে জেনেছিলাম গবনমেণ্টের কাছে রিপোর্ট দিয়ে অন্য কোনো শাস্তি দেওয়ার নিয়ম নেই। সদর হাসপাতাল থেকে আর একজন ডাক্তার জেলের কাজ পেল।

ডাঃ মোডী অত্যন্ত হীনতা স্বীকার করেও চেষ্টা করেছিলেন যাওয়ার আগে আর একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে। গেটের সিপাই দুঃখিত নম্রভাবে তাঁকে জানিয়ে দেয়, আসতে দিতে পারে না, জেলার সাহেবের হুকুম নেই। ডাঃ মোডী, শেখ গট্টু, চন্দ্রিকাপ্রসাদ—আমার সেই হাঙ্গার স্ট্রাইকের জীবনের হয়ে রয়েছেন যেন ছোট ছোট কয়েকটি তারা আর ফুল।

অন্যমনে চলি পথে
ভুলিনে কি ফুল, ভুলিনে কি তারা,
তবুও তাহারা
প্রাণের নিঃশ্বাস বায়ু করে সুমধুর
ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেয় সুর।

হাঙ্গার স্ট্রাইকের জের

আলিপুর জেলে যেদিন হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু করি, সেইদিন বা তার আগের দিন ওজন নেওয়া হয়েছিল। তখন ছিল ১৫১ পাউণ্ড। ইদানীং রোজই ওজন নিত, আজ হাঙ্গার স্ট্রাইকের শেষ দিনেও নিল, দাঁড়াল ৮৯ পাউণ্ড।

একটু বেলায় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আবার এল। এসে বলল, এত দিনের উপোস, এর পর অন্তত: ১৫ দিন আপনাকে আমি শক্ত জিনিস কিছু খেতে দেব না; দুধ, সুপ, ফলের রস—আপনাকে এই সব খেয়েই কাটাতে হবে।

তার জন্যে মন খারাপ হয়নি। মনে এক দিকে ছিল ডাক্তারের চিন্তা; অপর দিকে, তখন বেলা বেড়ে উঠেছে--মাথার ভিতর কি রকম আগের দিনের মতোই একটা অস্থিরতা দেখা দিয়েছে—ইচ্ছা হচ্ছে যেন অস্বাভাবিক একটা কিছু ক'রে বসি। ঐ ভয়টা আবার পেয়ে বসল, বুঝি পাগল হয়ে যাচ্ছি। মনে হল, চেপে যাওয়া ঠিক হবে না। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে বললাম।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হুকুম দিল, পেছন দিকে চারিদিক খোলা আর একটা ছোট ঘরে আমায় নিয়ে যেতে, সেই ঘরের সব দরজা জানালায় খসখসের পর্দা ক'রে দিতে, একটা ডুস দিতে, আর একশিশি কেশরঞ্জন তেল আনিয়ে দিতে। আমায় বলল, 'দুপুরে যেমন স্নান করেন, রোজ ভালো ক'রে স্নান করবেন, তাছাড়া সন্ধ্যার আগে গরম জলে আর একবার স্নান করবেন।'

পরের দিনও উদ্বেগটা অনুভব করলাম। নিজেকে যথাসম্ভব সংযত ক'রে রাখতাম। খসখসের পর্দা তৈরি হয়ে এল। বেলা আটটা সাড়ে আটটা থেকে সেগুলো ভিজিয়ে দিত। তখন থেকে আর বেলা চারটা পাঁচটা পর্যন্ত ঘর থেকে বের হতাম না। উদ্বেগও কমে গেল। দুধ, সুপ—এই সব খেয়ে কেটে যেত।

আই. জি নাগপুর থেকে সপ্তাহে দু'তিনদিন ক'রে এক-এক ঝুড়ি কমলালেবু

পাঠিয়ে দিত। সাত দিনের দিন থেকে খুব পাতলা দু'একখানা টোস্ট স্যুপের সঙ্গে দিত।

দশ দিনের দিন বাবা আবার এলেন। কলকাতা এসে ষ্টিফেনসনের কাছে জেনেছেন, আমি খেতে শুরু করেছি। ষ্টিফেনসন বলেছে, 'আপনি তবু যান, দেখা ক'রে আসুন।' খরচের টাকাও দিয়ে দিয়েছে।

চন্দ্রিকাপ্রসাদ এসে বলে গেলেন, হুকুম এসেছে, আপনার বাবা যে কয়দিন এখানে থাকবেন, দিনের বেলা যখন-তখনই জেলের ভিতর এসে দেখা করতে পারবেন, পুলিশ কর্মচারী কেউ থাকবে না, আমাদের জেল কর্মচারীও কারও থাকবার প্রয়োজন নেই।'

এবারে যে ঘরটায় আমায় থাকতে দিয়েছিল, সেখান থেকে আগের মতো আর জেলের গেট অবাধ দেখা যেত না—জেলার বেঙ্কট রাও পা টিপে টিপে হঠাৎ এসে ঘরে ঢুকত। ডাঃ মোডা যে নিজেই আমায় কাগজ দিয়েছিলেন, ও তো তা জানত না, ওর বোধ হয় ধারণা হয়েছিল, আমিই চেয়ে নিয়েছিলাম। কাজেই ও ধরতে চেষ্টা করত, আমি বাবার মারফত কোনো চিঠি পাঠাই কি না।

বাবা আমার শরীরের অবস্থা দেখে তো খুব কাঁদলেন। তারপর আমার মৃত বা মৃতপ্রায় দেহ নিয়ে যাবার জন্যে সরকারী পত্রের কথা, তাঁর নিজের ষ্টিমারের সিঁড়ি থেকে জলে পড়ে যাবার কথা, অসুখের কথা সব বললেন। বাড়ির কথাও বললেন, চিরদিনের সচ্ছল সংসার এখন অভাবের সংসারে দাঁড়িয়েছে। মা প্রায়ই অসুস্থ থাকেন, চোখে কম দেখতে পান, তাই নিয়েই সংসারের কাজ সব কিছু করতে হয়।

সব শুনলাম—ঐ উপবাস-ক্ষীণ শরীরে মনটা শেষ দিকে একটা সমর্পণের ভাব আর একটা সুদূরের স্বপ্ন নিয়ে নিয়ত থাকতে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। মায়ের বিষয়ে কথাগুলো শুনে সেই দিনের রাতটা ক্রমাগত মনে হল, এ সবই তো আমারই জন্যে। এর পর আমার জীবনে সম্ভোগের, সঞ্চয়ের কোনো স্থানই তো নেই। খেতে আরম্ভ করার পরেও রাতের ঘুম ফিরে আসেনি। ঘণ্টা দুই ক'রে ঘুমোতে শুরু করেছি যেদিন থেকে সন্ধ্যাবেলায় গরম জলে স্নান করছি। ওদিন রাত্রে সে ঘুমটুকুও হল না।

বাবা সেদিন সন্ধ্যায় যাবার বেলায় বলে গেলেন, তিনি আর একদিন মাত্র থাকবেন, কিন্তু যাবার আগে তিনি আমায় ভাত খাইয়ে যাবেন। আমি

জানলাম যে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলেছে পনেরো দিনের আগে ভাত দেবে না। বাবা বললেন, তা তিনি আমায় ভাত খেতে দেখে যাবেন, অন্তত দুটো মুঠো ভাত তিনি নিজে হাতে ক'রে নিয়ে আসবেন। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি নেবেন।

এবারেও বাবা সেই ব্যারিস্টার নগেনবাবুর বাড়িতে এসে রয়েছেন। সেদিন জেলার আর ডাক্তার দু'জনে আমার দু'হাত ধরে জেলের গেটে নিয়ে গেল। অফিসে গিয়ে দেখি, সেখানে বাবাও রয়েছেন, আর রয়েছেন নগেনবাবু আর সেই ম্যাজিস্ট্রেট এস. পি. সান্যাল। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমায় বলল, 'আপনার বাবা আর দেরি করতে রাজী নন, আজই আপনাকে সামনে বসিয়ে চারটি খাওয়াতে চান। আমার মনে হচ্ছিল, আরও দু'এক দিন দেরি করা ভালো। ওঁর সেন্টিমেন্টের দিকে চেয়ে আমি আর আপত্তি করছিনে। আজই উনি ভাত এনে দেবেন, আপনি খাবেন।'

এর পর লেগে গেল নগেনবাবুতে আর মিঃ সান্যালে ঝগড়া। নগেনবাবু বললেন, তাঁর বাড়ি থেকে খাবার দেবেন; মিঃ সান্যাল বললেন, তাঁর বাড়ি থেকে।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলল, 'আপনাদের কারও বাড়ি থেকে আমি দিতে পারিনে, ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। তবে আমি এখানে যেসব পাচক পাব, তাদের হাতে খাবার তৈরি ক'রে এঁকে দেবার আমার ইচ্ছা নেই। কাজেই আপনারা যে কেউ ভার নিলে আমার দায়িত্ব অনেকখানি কমবে। কিন্তু আপনারা যিনিই দিন, খরচের টাকা আমি দিতে বাধ্য, এবং আপনাদের তা নিতে হবে।'

দু'জনে সমস্বরে বলে উঠলেন, 'ওসব বাজে কথা ছাড়ুন।'

তারপর মিঃ সান্যাল মৃদু হেসে নগেনবাবুকে বললেন, 'আপনি সরকারী লোক নন, আপনাকে কেন দিতে দেব?'

অনেক ঝগড়াঝাটির পর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মধ্যস্থ করল।

'মিঃ সান্যাল, আপনি বাবুর্চির হাতে খান, বিকেলের খাওয়াটা ওঁর এখন দরকার হালকা রকমের—সেটা আপনি পাঠাবেন। আর মিঃ দের বাড়িতে মেয়েরা রান্না করবেন, উনি দুপুরের খাওয়াটা দেবেন।'

ঐ ভাবেই শেষ পর্যন্ত রফা হল। বাবা সেদিন নগেনবাবুর বাড়ি থেকে মুঠো ভাত ক'রে নিয়ে এলেন। ঠাকুর খাবারটা জেল-গেট পর্যন্ত নিয়ে এল, সেখান থেকে কোনো সিপাই কয়েদী দিয়ে আনতে দিলেন না—নিজে হাতেই নিয়ে এলেন।

এর পর থেকে ক্রমে শরীর ফিরতে লাগল। কমবার বেলাতেও যেমন রোজ আধ পাউণ্ড, এক পাউণ্ড, দুই পাউণ্ড ক'রে ওজন কমেছে এখন তেমনি আবার বাড়তে শুরু করল। দুই বেলা খাবার ছাড়া টিফিনের জন্য বিস্কুট, মাখন, পাঁউরুটি, সুজি, ঘি দিয়েছিল, একটা স্টোভ দিয়েছিল। দুধ, ডিম, ফল— এগুলোও আসত। চাকরটাকে দেখিয়ে দিয়েও বিশেষ লাভ হতো না। তা ছাড়া অত্যন্ত নোংরা, নিজের হাতেই প্রায় সব ক'রে নিতাম। সকাল-বিকাল বেড়াতাম, বেড়াবার গতিবেগ আর পরিমাণ ক্রমে বাড়িয়ে তুললাম।

যেন নতুন জীবন লাভ করছি। ছোট্ট শিশুটির মতো তুলতুলে নরম শরীর গড়ে উঠছে। ইচ্ছা হল, ভিতরটাকেও নতুন ক'রে গড়ে তুলব। 'আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে।' পোড়ানো তো চরম করেই হল, কিন্তু গন্ধ তো আমার নিজের চেষ্টাতেই সৃষ্টি করতে হবে। স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি সারা জীবন। একা একা ঘুরে-বসে সময় কাটে, নতুন ক'রে স্বপ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করি। পথ খুঁজে পাইনে, নতুন আয়োজন করতে হবে, এই শুধু জানি। আয়োজন বন্ধুদের সাথে মিলে করব, নতুন পথ খুঁজব। কিন্তু যে-কোনো আয়োজন, যে-কোনো পথেরই যেন যোগ্য হতে পারি।' এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রতি মুহূর্তের দৃষ্টি খুলে রাখি ভিতরের দিকে।

যখন-তখনই প্রায় অফিসে যাই। কেউ বাধা তো দেয়ই না, বরং জেলের বড় গেট খুলে দেয়। নিয়ম, বড় গেট খুলবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা আরও উপরওয়ালা কেউ এলে। কিন্তু হাজার স্ট্রাইকে শ্রদ্ধা পাই আমি প্রায় উপরওয়ালাদের মতোই। তার কাছে আইন শ্লথ হয়ে যায়। এইভাবে আমার জন্য বড় গেট খুলতে জেলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও দু'-একদিন দেখেছে। অমন জেলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও কিন্তু বারণ করেনি।

ভোর বেলায় জেলের কয়েদীদের গনতি মেলাতে আসেন চন্দ্রিকাপ্রসাদ। তখন জেলার বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কারও আসবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ঐ সময় মাঝে মাঝে চন্দ্রিকাপ্রসাদই আমায় অফিসে ডাকেন, আমার সম্পর্কিত যত confidential চিঠিপত্র, তা খুলে আমায় পড়তে দেন। অবশ্য বিশেষ confidential যেগুলো, সেগুলো থাকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিজের কাছে। তাও দু'একখানা মাঝে মাঝে হাতে পড়ত। যেগুলি হাতে পেলাম, তারই মধ্যে পেলাম রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহারের যে নতুন আইন-কানুন করেছে তারই একখানা। নির্জন কারাবাস রাজবন্দীদের ঘুচে গেল। বেশি বিপজ্জনক

আর অল্প বিপজ্জনক এই যে দুই শ্রেণীর রাজবন্দী তাঁরা যথাক্রমে পাঁচ ও দশজন একসঙ্গে মিশতে পারবেন, খেলাধুলো করতে পারবেন, সপ্তাহে একখানা এবং দু'খানা করে চিঠি লিখতে পারবেন। মাসে দু'দিন ক'রে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। রান্নাবাড়ার তদারক নিজেরা করতে পারবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

চন্দ্রিকাপ্রসাদ ছাড়া আরও একজন আইনকে অগ্রাহ্য ক'রে চলেন। তিনি মিঃ সান্যাল।

শরীর যেমন ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল, শুধু স্বপ্ন নিয়ে থাকা ছাড়া নিজের ভিতর কাজের তাগিদ দেখা দিল। পড়া বই সঙ্গে যা ছিল, আর একবার ক'রে কিছু কিছু পড়ি, গীতাঞ্জলি ইংরেজীতে অনুবাদ করি, আলিপুর জেলের ফরাসি শিখবার খাতাগুলো ছিল, তাই মুখস্থ করি, অথবা ভুল হোক, শুদ্ধ হোক ফরাসি লিখি।

এখন আর আমার হাঙ্গার স্ট্রাইক নেই। তাই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জেলার সিভিল সার্জন হিসাবে প্রায়ই মফঃস্বলে ঘোরে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাজ করেন মিঃ সান্যাল। তিনি একদিন বলেন, 'আপনাকে কিছু কিছু বই দেব। কিন্তু দেখবেন যেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট না দেখতে পায়।' বই তিনি প্রায়ই যা দিতেন, ক্রপট্‌কিন, স্টেপনিয়াক—এঁদের রচিত।

স্টেপনিয়াকের *Career of a Nihilist* বইটা সেইদিনই পড়ে শেষ করেছি। বইয়ের সম্পর্কেই সান্যাল বসে আলোচনা করছেন, আমি তাঁকে একটা জায়গা পড়ে শোনাচ্ছি—এমন সময় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এসে হাজির। এসেই জিজ্ঞেস করে, 'কি বই পড়ছেন?'

আমি কিছু বলবার আগেই মিঃ সান্যাল জবাব দেন, 'একটা প্রেমের গল্প, আমিই পড়তে দিয়েছি।'

Career of a Nihilist প্রেমের গল্প—কথাটাকে মিথ্যা না বললেও চলে, কিন্তু অনেকবার ভেবেছি, স্টেপনিয়াকের *Underground Russia* বা *Russia Under the Czars*, অথবা ক্রপট্‌কিনের *Conquest of Bread* পড়বার বেলায় অমনি ধরা পড়ে গেলে উনি কি বলতেন। অবিশ্যি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ও-বালাই ছিল না—সে যদি বইখানা হাতে নিয়েও দেখত, Nihilist মানে কি, তা তার বোধগম্য হতো না।

এঁদের ঠিক বিপরীত, আর আইনের ক্রূর প্রতিমূর্তি ছিল জেলার। সে

দেখত, সান্যাল এসে মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে কথা কন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলাপ জমাতে চেষ্টা করে। সে-ই বা করবে না কেন? তবে সে আসত প্রায়ই রাতের অন্ধকারে—পা টিপে টিপে, অথবা দুপুরে আমার খাওয়া-দাওয়ার পর। তার আলাপ ছিল প্রায় নিজের কাজ বাগাবার উদ্দেশ্যে—আমার কথা থেকে গোপন কিছুর সন্ধান পায় কি না, আর তার নিজের সম্পর্কে আমি যেন কোনো খারাপ ধারণা পোষণ না করি।

একদিন বিরক্ত হয়ে বলি, 'আচ্ছা বলো তো, কোনো সিপাই কয়েদী তোমার সম্পর্কে 'শ'কারাদি বচন ছাড়া প্রয়োগ করে না কেন?'

পান-খাওয়া দাঁত বের ক'রে খুব একচোট কাষ্ঠহাসি হেসে বলে, 'আমি জানি, অমুক সিপাই, আর অমুক জমাদার।'

'ওরা কি বলে আমি জানিনে, তবে তোমার প্রশংসা করবার লোক এ-জেলে নেই।'

আর একচোট হেসে বলে, 'আমি জানি। আপনি সেলে থাকতে অমুক সিপাই একদিন এই সব বলেছিল, আর অমুক জমাদার এই সব—আমি সেলের দেয়ালের বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনে গেছি।'

আমি প্রায় আকাশ থেকে পড়ি। কিন্তু সেরকম ভাব না দেখিয়ে ওদের বাঁচাবার চেষ্টায় বলি, 'কি জানি, ওরা এরকম কথা বলেছে বলে আমার তো মনে পড়ে না।'

কতবার আমি সাবধান করেছি সিপাইদের, তারা নিজের গরজেও কতবার খৈনি খেয়ে থুথু ফেলার উপলক্ষ ক'রে অ্যাণ্টিসেলের বাইরে দেখে নিয়েছে। তবু দেখছি, ও কারও কারও কথা শুনে গেছে।

ও যে সিপাই আর জমাদারের নাম করল, পরে তাদের পেয়ে সাবধান ক'রে দিলাম। ওরা এই শ্রেণীর লোকের সাধারণ বীরত্বের ভাব প্রকাশ করল, বলল, 'কি করবে ও?'

এখানে বলে রাখি, বিলাসপুর-প্রবাসী বাঙালীরা এই সিপাই জমাদারদের মাঝে মাঝে রাস্তায় ধরে আমার খবর নিতেন এবং আমায় খবর পাঠাতেন। তার জন্ম ওদের সাথে ভাব করবার উদ্দেশ্যে টাকা-পয়সাও খরচ করতেন। তবে জেলারের কথায় বুঝলাম, সেসব ও কিছু জানতে পায়নি। কিন্তু চন্দ্রিকা-প্রসাদের যে আমার সাথে বেশ ভাব এবং তিনি যে গোপনে আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে আলাপ করেন, তা জেনেছে। এক ধরনের জেলার ছিল এবং এখনও

আছে—যাদের কাজ, জেল শাসনের উপায় স্বরূপ কতকগুলি স্পাই এবং গুণ্ডা পোষণ করা। এই স্পাই এবং গুণ্ডার প্রাদুর্ভাব বড় বড় জেলগুলিতেই বেশি ক'রে টের পাওয়া যায়।

জেলার হঠাৎ একদিন একটা বাইরের কথা পাড়ল। জিজ্ঞেস করল, 'বাংলা দেশে কয়টা সেণ্ট্রাল জেল?' আমার একটু খটকা লাগল।

বললাম।

তারপর জিজ্ঞেস করে, 'তার ভিতর কোন্ জেলটা ভালো?'

বুঝলাম, গবর্নমেণ্ট জানতে চায়, আমার কোন্ জেলে যাবার ইচ্ছা।

ইতিপূর্বে আই. জি বলে গেছে, আমি হাঙ্গার স্ট্রাইক ছেড়ে দিলে জব্বলপুর জেলে নিয়ে যাবে, সেটা ওখানকার সবচেয়ে ভালো জেল। জব্বলপুর স্বাস্থ্যকর জায়গা। এবং ঐ জেলে স্টেট প্রিজনারদের রাখবার মতো ভালো ঘর আছে।

গবর্নমেণ্ট ব্যবস্থা করেছিল, বাংলার সব স্টেট প্রিজনারদের হাজারিবাগ জেলে রাখবে। তার জন্য প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ ক'রে পুরানো সেল ভেঙে নতুন ক'রে প্রায় শ'দেড়েক সেল তৈরি করেছিল। কিন্তু প্রথম যে স্টেট প্রিজনাররা সেখানে যান, তাঁরা গিয়ে পান এক খাজা রকমের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে —ফলে, পর পর তিনটি হাঙ্গার স্ট্রাইক সেখানে হয়। আমায় হয়তো সেখানে আর নিতে চায়নি।

এদিকে বাবাও বিলাসপুরের গরম দেখে এসেছেন, তিনি কলকাতায় এসে স্টিফেনসনকে বলেন, আমায় বাংলার কোনো জেলে আনতে। তিনি চেয়েছেন আমায় যশোহর খুলনা বা ফরিদপুর—এই রকম কোনো জেলে যেন আনা হয়, যাতে তিনি মাঝে মাঝে দেখা করতে পারেন।

স্টিফেনসন বলেছে, আমায় সেণ্ট্রাল জেল ছাড়া রাখা চলবে না। এরই ফলে ওখানে প্রকারান্তরে অনুসন্ধান করতে বলেছে, আমি কোন্ জেলে থাকতে চাই।

জেলারের প্রশ্ন থেকে অনুমান করলাম, এইরকমই একটা কিছু ব্যাপার দাঁড়িয়েছে। তাই জেলারের কথার জবাবে বলে বসলাম, রাজসাহী জেল।

রাজসাহী জেলের কথা আলিপুরে থাকতে শুনেছি, সবচেয়ে বেশি দুর্ব্যবহার ঐ জেলে, সবচেয়ে কড়া নির্জন বাসের ব্যবস্থা। আবার এ-ও শুনেছি, মেদিনীপুর জেলের হাঙ্গার স্ট্রাইকে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কয়েকজনকে ওখানে নিয়ে গেছে। তাঁদের কেউ কেউ আমার পরিচিতও।

এতদিনে বুঝে নিয়েছি, জেলের দুরবস্থা সবচেয়ে বেশি সেখানে, দুরবস্থা

যেখানে সয়ে নেওয়া হয়। তবে প্রথম প্রথম সয়ে না নিয়েও উপায় ছিল না—প্রায় সবাই সর্বত্র একা পড়েছিলেন, স্টেট্ প্রিজনারদের অধিকার কি, তা-ও জানা ছিল না। বাইরে থাকতে এই শুধু জানা ছিল, শত্রুর পুরীতে দুর্ব্যবহার তো ওরা করবেই, হয়তো বা যন্ত্রণা দিয়ে তিলে তিলে মেরেই ফেলবে—তারই জন্যে তৈরি হতে হবে। অনেক জুলুম অনেকে নীরবে সহ্য করেছেন এই শিক্ষার ফলে। আবার এ-শিক্ষা যাঁদের ছিল না—বিশেষতঃ পরবর্তী যুগে, তাঁরা কখনও-বা নানা দুর্বলতা দেখিয়েছেন, কখনও-বা বাড়াবাড়ি করেছেন—রাজনৈতিক বন্দীদের ছোট করেছেন।

চন্দ্রিকাপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি?'

তিনি বললেন, 'হয়তো আপনার অনুমান সত্যি। আমায় কিছু জানতে দেয়নি। একটা কি চিঠি এসেছে—জেলারকে ডেকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেখিয়েছে, কিন্তু চিঠি ফাইলে রাখেনি।'

কয়েকদিনের মধ্যেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানাল, আমার বদলীর হুকুম এসেছে। কোথায় বদলী, তা বলল না। অন্য সময় জেলার আমায় আপ্যায়িত ক'রে বলল, 'আপনি বলেছিলেন, রাজসাহী জেল বাংলার সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যে সব-চেয়ে ভালো। তাই আমরা আপনার সেখানেই বদলীর ব্যবস্থা করেছি।'

বাংলাদেশে ফিরে আসছি, নতুন জায়গায় আসছি, সঙ্গীসাথী পাব—মনে আনন্দও আছে। আবার ভাবি, নিজেকে নতুন ক'রে গড়ে তুলবার সুযোগ এইখানেই তো ভালো পাচ্ছিলাম। বেশ হতো থাকলে। সকাল-সন্ধ্যায় ধ্যান, প্রার্থনা, আত্মবিচার করি, আপন মনে গান গাই। সারাদিন কিছু কিছু পড়ি বা লিখি। মনটা সব সময় একটা কিছু নিয়ে আছে, এই তৃপ্তিটা বেশ পাই। হাঙ্গার স্ট্রাইকের পর ওখানে দেড় মাস এইভাবে কাটে।

একদিন জেলার একজন রিজার্ভ ইনস্পেক্টরকে নিয়ে এল—অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। বললে, 'ইনিই কাল আপনাকে নিয়ে যাবেন।'

ইনস্পেক্টরটি বলল, 'ট্রেন সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়। কিন্তু আমি আপনাকে বিকেল তিনটা আন্দাজ নিয়ে যাব। আপনি তার ভিতরে তৈরি হয়ে নেবেন।'

সান্যাল এর ভিতর একদিন এসে বিদায় নিয়ে গেলেন। নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন, ছাড়া পেয়ে জব্বলপুরে একবার যেন তাঁর বাড়িতে যাই। শুনেছিলাম, জব্বলপুরে কেন, সমস্ত মধ্যপ্রদেশের ভিতরই তাঁদের বাড়িটি সুন্দর। মিঃ সান্যালের নিমন্ত্রণ কিন্তু রাখা হয়ে ওঠেনি।

নগেনবাবু সরকারী কর্মচারী নন। আর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ পরঞ্জপের ভদ্রতার জন্য ওখানকার সমাজে বিশেষ খ্যাতি ছিল না—নেহাতই সরকারী কর্মচারী। তাই নগেনবাবু আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আর চেষ্টা করেননি। তিনি এবং বাড়ির মেয়েরা ঠাকুরের মারফত শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমিও ঐ পন্থাতেই বিদায় নিলাম।

ইনস্পেক্টরটি জেল থেকে বেরিয়েই বললেন, 'দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে আমি এত আগে বের ক'রে নিয়ে এসেছি, কারণ আমার মা আপনাকে একবার দেখতে চান, আপনাকে একটু চা খাওয়াতে চান।'

বললাম, 'এতো সুখের কথা—মা চা খাওয়াতে চান, এতে মনে করবার কি আছে?'

ইনস্পেক্টরের কোয়ার্টারে গাড়ি থামতেই একটি শ্যামবর্ণা বৃদ্ধা মহিলা ছুটে এসে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'এস বাবা এস, আমি কত কৃতজ্ঞ!'

বুড়ি টেবিল সাজিয়েই রেখেছিলেন। বললেন, 'আমি বাঙালীর মেয়ে। আমার মা ছিলেন ব্যারাকপুরে সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে আয়া। তোমার কথা কত শুনি। কি কাণ্ডই করেছিলে বাবা। অমন করে মানুষেও পারে—আমরা তো শুনেই অস্থির।'—বলতে বলতে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন।

ছেলে তখন মাথা নিচু ক'রে পাশের চেয়ারটাতে বসে। তারপর তাঁর স্ত্রীও এসে টেবিলে যোগ দিলেন। চারজন এক সঙ্গেই চা খাওয়া হল—আরও কত কি সব পিঠে-পায়েস তৈরি করেছিলেন। আমি তখনও গুরুপাক জিনিস কিছু খাইনে। তাই কিছু কিছু বাদ দিলাম।

খেতে খেতে ইনস্পেক্টরটি বললেন, 'চারজন কনস্টেবল ও একটি হেড কনস্টেবল নিয়ে আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। অথচ কলকাতার উপর দিয়ে গেলে কি যে ক্ষতি হতো জানিনে। আমার স্ত্রীকে কলকাতায় পৌঁছে দেব। সে কথা জানানো সত্ত্বেও অনুমতি পেলাম না। আপনাকে নিয়ে যেতে হবে সিনি, আদ্রা, আসানসোল, ব্যাণ্ডেল, নৈহাটি হয়ে। একেবারে ছকে দিয়েছে।'

পথে বড় যত্নই করেছিলেন এই ইনস্পেক্টর ও তাঁর স্ত্রী।

রাজসাহী জেলে তিন বৎসর

দু'টো দিন বাইরের হাওয়ায় ঘুরে নেওয়া গেল। ব্যাণ্ডেল এবং হুগলি ঘাট স্টেশন দিয়ে যখন যাই, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি, পুরনো স্মৃতি সব মনে জাগছে। ঐ তো, একটু পথ, যদি চলে যেতে পারি চন্দননগরে পৌঁছে যাব—পলাতক জীবনে ওখানে কত দিন কাটিয়েছি। আজও গেলে আমার আশ্রয়ের অভাব হবে না—সহকর্মীরা কে ধরা পড়েছেন, না পড়েছেন—এই কয় মাসের খবর জানিনে, তবুও আমার স্থান আমি ক'রে নিতে পারবই। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, প্রহরীরা সতর্ক হয়েই পাহারা দিচ্ছে—শরীর দুর্বল, বেশি ছুটতে পারব না। মনের কামনা মনেই মিলিয়ে যায়।

ব্যাণ্ডেল স্টেশনে আমার পুরানো পরিচিত রেল কর্মচারীটির দেখা পাই কি না—ঘুরে ঘুরে এদিক-ওদিক খুঁজে দেখি। পুলিশ পেছনেই ঘুরছে। হয়তো অনর্থক ভদ্রলোককে বিপন্ন করব ভেবে, ভয়ে আর কোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করাও হল না।

ক্রমে রাত হল—নৈহাটি, শ্যামনগরও ছেড়ে গেলাম। কয়েক ঘণ্টার স্বপ্নও ফুরিয়ে গেল। কয়েক ঘণ্টা যেন পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গেই কাটল—অতুলদা, কুন্তল, চারু। তখনও জানিনে যে, কুন্তল আর চারু মাস তিনেক আগেই ধরা পড়ে গেছেন।

জেলেই তো যাচ্ছি, তবু পরদিন মনে হতে লাগল কতক্ষণে গিয়ে পৌঁছাব। ঘর-বাড়ি ছাড়া জীবন—নিকট-আত্মীয় হয়ে উঠেছেন সহকর্মীরাই। আলিপুর জেলে থাকতে শুনেছিলাম, পূর্ব-পরিচিতদের মধ্যে রাজসাহীতে আছেন যতীন শেঠ, পূর্ণ দাস এবং নাম-জানাদের মধ্যে আছেন প্রভাস দে, হরিশ শিকদার, গিরীন ব্যানার্জি এবং আরও কেউ কেউ। ভাবছি, কতক্ষণে এঁদের সঙ্গে দেখা হবে।

জেল-গেটে ঢুকতেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ইনস্পেক্টরটি ম্লান মুখে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। অফিসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা—পূর্ব-পরিচিত অ্যাশ সাহেব। ফরিদপুরে যখন পড়ি, তখন সেখানকার সিভিল সার্জন ছিলেন, ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং ভালো ডাক্তার হিসাবেও নাম ছিল। আমার দিদির চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজে চেয়ে করেলা ভাজা দিয়ে ভাত খেয়েছিলেন। সে-কথা মনে আছে। কিন্তু ভালো খেলোয়াড় এবং ভালো ডাক্তার হলেই যে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও ভালো হবে, এমন কোনো কথা নেই—সে পরিচয় শীঘ্রই পাওয়া গেল। তাছাড়া বুড়ো হয়ে মেজাজটাও গেছে খিটখিটে হয়ে।

আমায় জেলারের ঘরে বসিয়ে দু'জনে মিলে আমার কাগজপত্র দেখল। হয়তো তারই ফলে আমার মালপত্র বা দেহের আর তল্লাশি হল না। নরেন মল্লিক বলে একজন এ্যাসিস্টাণ্ট জেলার সঙ্গে নিয়ে জেলের ভিতর যেতে যেতে জিজ্ঞেস করে, 'কতদিন হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছিলেন ?'

'আটাত্তর দিন।'

'বাবা, এ যে একেবারে বাঘ !'

কথাটা বন্ধুদের কানে গেল। সেই থেকে জেলের বন্ধুমহলে নাম হল 'বাঘা' বা 'বাঘা দা'।

কয়েক দিন পূর্বে প্রায় অনুরূপ উপায়ে আর এক বন্ধুর নামকরণ হয়েছে 'মৌলবী সাহেব'।

জেলের একেবারে শেষ প্রান্তে জেলের বাইরের দিককার উঁচু দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে ফাঁসি-কাঠের সংলগ্ন কুড়িটি সেল। এরই তেরটিতে আমাদের স্টেট প্রিজনারদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আমি আসবার সপ্তাহখানেক আগে আগ্রা জেল থেকে নিয়ে এসেছে সুরেশ দাসকে। আগ্রা জেলের কয়েক মাসে সুরেশবাবু মাথায় লম্বা লম্বা বাবরি গোছের চুল গজিয়েছেন, মুর-ধরনের খানিকটা দাড়ি রেখেছেন, জেলে ঢুকেছেন ধুতিটাকে লুঙ্গির মতো ক'রে ফেত্তা দিয়ে পরে।

সুরেশবাবু চন্দননগরে ধরা পড়াতে Foreigners' Ordinance and Ingress into India Act-এর বন্দী। তাঁকে X class করবে কি Y class করবে, Regulation III-র বন্দীদের সঙ্গে মিশতে দেবে কি না-দেবে, এই সব ভেবেচিন্তে বোধহয় তাঁকে সেলে পৌঁছে দিয়ে, নরেন মল্লিক সেলের বাইরের কাঠের দরজাটা টেনে বন্ধ ক'রে দিতে যাচ্ছিল।

সুরেশবাবু বললেন, 'ও মশয়, দরজা বন্ধ করেন ক্যান ?'

'তাই-নিয়ম।'

'কিসের নিয়ম মশয়, দিনের বেলায় দরজা বন্ধ করার ?' বলে সুরেশবাবু তো এক হ্যাঁচকা টানে দরজাটা খুলে নিলেন। নরেন মল্লিক হেসে চলে গেল।

পাশের ঘরে জমেছিলেন বন্ধুরা। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, 'মৌলবীর তো তেজ আছে।'

এই থেকে হয়ে গেল সুরেশবাবুর নাম 'মৌলবী সাহেব'।

আমায় সেলগুলোর সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, প্রথমেই চোখে পড়লেন পূর্ণ দাস। কিন্তু বাইরের পরিচিত যাঁরা, সে কালের সংস্কার ছিল, অফিসারদের সামনে তাঁদের সঙ্গে সে পরিচয় স্বীকার না করা। তাঁর পাশেই ছিলেন মণি চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে আগে পাশাপাশি সেলে থেকে এসেছি প্রেসিডেন্সি জেলে। এ ক্ষেত্রে পরিচয় অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই। বললাম, 'এ লোকটিকে তো চিনি!' তিনি হেসে ফেললেন। কিন্তু পূর্ণদা মনে করলেন, আমি বোধহয় তাঁর কথাই বলছি, তিনিও হেসে এসে আমার হাতখানা ধরলেন। পরে বুঝলাম, নরেন মল্লিককে অত সন্দেহ করবার বিশেষ কিছু নেই—একটু ভ্যান্‌তাড়া গোছের লোক, কাকে চিনি বলেছি, তা অফিসে পৌঁছবার মধ্যে ভুলে যাবে। আর পুলিশে খবর দেবার মতো অতখানি উৎসাহও সারা জীবন কুড়িয়েও পাবে না।

বন্ধুদের মধ্যে আমার নতুন নামকরণটি ক'রে তো নরেন মল্লিক সরে পড়ল। তখন শুরু হল পরিচয়ের পালা। শুনলাম, হাজারিবাগে স্টেট প্রিজনারদের জন্য নতুন জেল খোলা হয়েছে এবং রাজসাহী থেকে যতীনদা (শেঠ), প্রভাসবাবু, হরিশবাবু, আরও দু'চারজন সেখানে চলে গেছেন। একটু নিরাশ হলাম। কিন্তু নতুন পেলাম কলিকাতা মলাঙ্গা লেনের গিরীন ব্যানার্জিকে ও ময়মনসিং বাজিতপুরের নরেশ চৌধুরীকে। তাছাড়া ছিলেন টাঙ্গাইলের রসিক সরকার ও ঢাকা মহেশ্বরদি পরগনার সতীশ পাকড়াশি। ইনি এসেছেন আমি ওখানে পৌঁছাবার একদিন আগেই।

রাজসাহী জেলের পুরনো কাহিনী সব একে একে শুনলাম। এখানেই জ্যোতিশ ঘোষ পাগল হয়ে যান। সে-কথা ধরা পড়বার আগেই শুনেছিলাম। অবস্থা ও ব্যবস্থা দেখে এবং শুনে মনে হল, আরও লোক পাগল হয়নি কেন!

নরেশদার চেহারাটি ফ্যাকাশে—প্রায় হলদে হয়ে গেছে। ওখানকার ওঁরা

যা ব্যবহার পেয়েছেন, নরেশদা তার ফলাফলের প্রায় প্রতিমূর্তি। যে তেরোটা সেল আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়েছে, তারই শেষ প্রান্তে কুড়ি নম্বর সেল, ফাঁসির আসামীর জন্য। অন্য সেলগুলিও অনুরূপ, একটুখানি পার্থক্য এই—সবগুলো সেলেরই অ্যান্টিসেলের সামনে পাঁচ-ছয় হাত দূর দিয়ে আর একটি দেওয়াল, এই দেওয়ালের গা থেকে কয়েকটি ক'রে সেল অন্তর অন্তর অ্যান্টিসেলের দেওয়ালের গা পর্যন্ত আর একটি ক'রে দেওয়াল, মাঝে একটি ক'রে লোহার গরাদে দেওয়া দরজা—এইভাবে যে ঘেরা, তাতে ফাঁসির সেলের এলাকা ঐ একটি সেলেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমাদের দিকে সাত নম্বর থেকে দশ নম্বর পর্যন্ত চারটি সেল, এগারো নম্বর থেকে তেরো নম্বর পর্যন্ত তিনটি সেল, চৌদ্দ থেকে ষোলো পর্যন্ত তিনটি এবং সতেরো থেকে উনিশ পর্যন্ত তিনটি—এক-একটা আলাদা আলাদা এলাকা। প্রেসিডেন্সি জেলের চুয়াল্লিশ ডিগ্রী যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। কিন্তু সেখানে অ্যান্টিসেলের পরে জেলের আসল দেওয়ালের আগে আর দেওয়াল নেই, এবং সেলইয়ার্ড বাইশটা ক'রে সেলের সামনে একটা, এখানকার মতো তিন চারটে সেলের জন্য আলাদা আলাদা নয়।

রাজসাহী জেলে প্রথমটা নরেশদাদের চব্বিশ ঘণ্টাই সেলে বন্ধ থাকতে হতো, স্নান এবং পায়খানা যাবার জন্য অ্যান্টিসেলে সকাল-বিকাল কয়েক মিনিটের জন্য বের ক'রে, সামনের কাঠের দরজাটি বন্ধ ক'রে দিত। লোহার থালায় ক'রে খাবারটা সেলের লোহার দরজার তলা দিয়ে গলিয়ে দিত। কয়েক মাস এইভাবে দিনরাত সেলের ভিতর কাটাবার পর জ্যোতিষবাবু পাগল হন। তাঁকে বহরমপুরের পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দেয়। এদিকে অন্য সব জেলে হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু হল। তখন দয়া ক'রে ওঁদের সকালে পনেরো মিনিট ও বিকালে পনেরো মিনিটের জন্য অ্যান্টিসেলের সামনে যে ঐ স্বল্পপরিসর জায়গাটুকু, তার ভিতর 'exercise'-এর জন্য বের করত। এখানে বলা প্রয়োজন, ঐ যে সাত থেকে দশ নম্বরের এলাকা, ওর ভিতর একজন ক'রে মাত্র স্টেট প্রিজনার রাখত। এবং ঐ প্রত্যেক আলাদা আলাদা এলাকায় একজনের বেশি স্টেট প্রিজনার রাখত না—যেন কারও গলার আওয়াজ কারও কাছে না পৌঁছায়। পরবর্তী উন্নত আবহাওয়ায় যখন 'exercise'-এর জন্য সকাল-বিকাল বের করত, তখন এলাকাগুলোর মাঝখানে যে লোহার দরজা, তার উপর দিয়ে এক-একখানা কম্বল ঝুলিয়ে দিয়ে এলাকাগুলির পরস্পরের ভিতর আড়াল সৃষ্টি ক'রে দিত। তা সত্ত্বেও প্রথম এলাকার অধিবাসিরা যখন 'একসারসাইজ'-এর

জন্য বের হবেন, তখন দ্বিতীয় এলাকার অধিবাসিরা নয়, তৃতীয় এলাকার অধিবাসিরা বের হবেন। এই উপায়ে পরস্পরের এবং মানুষের সংস্পর্শ বাঁচাবার যত রকম বিধিবিধান হতে পারে, তার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয়নি।

রাতের বেলায় স্টেট প্রিজনারদের পাশের খালি সেলগুলিতে দাগী কয়েদীদের এনে ভরতি করত। ভাতের সঙ্গে ডাল, লাউয়ের ঘ্যাঁট এবং এক টুকরো ক'রে মাছের সঙ্গে প্রচুর ঝোল এই ছিল খাদ্য—অধিকাংশ দিনই পোড়া ডাল, যত কদর্য চাল পাওয়া যায় তার আধাসিদ্ধ ভাত—সবটাই অত্যন্ত নোংরা—মেয়ে-কয়েদীদের ইয়ার্ড থেকে রান্না হয়ে আসত।

কাপড়-জামা চাইলে বলত বাড়িতে লেখ। চিঠি, বই, খবরের কাগজ—এসব ছিল স্টেট প্রিজনারদের পক্ষে দুর্লভ বিলাস দ্রব্য।

এই জীবন যাপন ক'রে, এই খাদ্য খেয়ে যা হতে পারে, ওঁদের তা-ই হতে থাকল। নরেশদাকে অম্লশূলে ধরল। সারাদিন বন্ধ সেলের মধ্যে বসে শুয়ে কি আর করবেন? ওঁর মনে দ্বন্দ্ব উঠল, ভগবান আছেন কি নেই। ভাবতে ভাবতে মনটা যখন স্থৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন ওঁর চোখে পড়ল, সেলের একেবারে উপরের দিকে জানালা নামক যে একটি পদার্থ আছে, তাতে মাকড়সার জাল জমেছে—একটি পোকা তাতে আটকা পড়েছে, পোকাটি বার বার চেষ্টা করছে উপরে উঠে জানালার মুখে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু জালটি এমন ভাবে তৈরি যে, ও বহু চেষ্টায় এক-একবার কোনো মতে উপরের দিকে ওঠে, আবার ধাঁ ক'রে নিচে পড়ে যায়। নরেশদা বার বার এটি লক্ষ্য ক'রে স্থির করলেন, যদি পোকাটি বেরিয়ে যেতে পারে তাঁ হলে বুঝব, ভগবান আছেন, নয় তো নেই। এক-একবার পোকাটি যখন প্রায় বেরুবার মুখে, ওঁর সমস্ত স্নায়ুগুলো যেন বলতে থাকে, এই···এই···। দিনের পর দিন ওঁর মনের বা স্নায়ুর তীব্র, একাগ্র দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। এক-একবার পোকাটি নিস্তেজ হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে—উনিও হাত-পা ছড়িয়ে নিরাশ হয়ে শুয়ে পড়েন।

চির-বৈচিত্র্যে ঘেরা মানুষের মনকে ফুলের মতো ছিঁড়ে নিয়ে অমনি বন্ধ ক'রে রাখলে যা হয়, জ্যোতিষবাবুর একদিন তা-ই হল। নরেশদারা ওর সীমা পর্যন্ত গিয়ে নেহাত স্নায়ুর জোরে বেঁচে গেলেন। ইতিমধ্যে একটা পাশের সেলেই জ্যোতিষবাবুর কি হল, তা ওঁরা টেরও পেলেন না। সামান্য দূরে দূরে দু'টো সেলে প্রভাস দে আর হরিশ শিকদার দু'জন আবাল্য বন্ধু ছয় মাস কাটিয়ে গেলেন—অথচ পরস্পর জানতে পারলেন না।

এর ভিতর ঝড়ো হাওয়া ঢুকল—গিরীনদা, পূর্ণদা, যতীনদা—ওঁরা সব মেদিনীপুরের হাঙ্গার স্ট্রাইকের পর ওখানে গিয়ে ওঁদের টেনে টেনে বের করতে লাগলেন। কিন্তু সেলে বন্ধ থেকে থেকে এমন অবস্থা হয়ে গেছে, নরেশদা বাইরের আলো সইতে পারেন না, ধরে নিয়ে বাইরে বসিয়ে দিলে চোখ চেপে ঘরে ফিরে আসেন। শুনতে শুনতে *A Tale of Two Cities*-এর ডাঃ ম্যানেতের কাহিনী মনে পড়ে।

আমি রাজসাহীতে যাবার আগেই অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়েছে। কিন্তু তবু গিয়ে সব যা কাহিনী শুনলাম, তাতে হাসব কি কাঁদব ভেবে পাইনে। তখনও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অ্যাশ সাহেব, আর জেলার এক ব্যক্তি—তার নাম রায়-সাহেব গুরুচরণ দত্ত।

মেদিনীপুরের হাঙ্গার স্ট্রাইক থেকে যাঁরা গেছেন, তাঁদের একটু ভয়ও করত। এদিকে আলিপুরের হাঙ্গার স্ট্রাইকের পর সরকারী হুকুমও গেছে ভালো ব্যবহার করবার। ভালো ব্যবহারের অঙ্গ হিসেবে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হুকুম দিয়েছে, রোজ প্রত্যেক স্টেট প্রিজনারকে আধ সের ক'রে দুধ দিতে। প্রথম দিন ঠিক এল। তার পরদিন থেকে জন প্রতি এক ছটাক হিসেবে কমতে থাকল। জেলার জানে, যেদিন ওটা কমে পাঁচ ছটাকে দাঁড়াবে, সেদিন সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে নালিশ হবে। সেদিন সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে নিয়ে জেলার আর রাজবন্দীদের ও-মুখো হতো না। বলে দিত, ওরা ভালই আছে, ওদের কোনো নালিশ নেই।

কিন্তু এঁদের তখন পৃথক পৃথক ভাবে জেলের ভিতর এদিকে-ওদিকে বেড়াতে দিত। এঁরা তাকে তাকে থেকে রাস্তার ভিতরই সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে ধরতেন। জেলারকে জিজ্ঞেস করলে বলে দিত, কেউ কোনো ভুল করেছে—ও দেখবে, আর যাতে ওরকম না হয়।

গুদাম পচা চালের ভাত দেয়। কয়েকবার নালিশ করেছেন। কয়েকদিন পর পরই আবার পচা চালের ভাত আসে। একদিন ধরতে জেলার বলে, 'কে জানে সার, কে ঐ চাল দিয়েছে!'

প্রভাসবাবু গর্জে উঠে বললেন, 'Do you mean to say that it was surreptitiously introduced into the godown?'

'Surreptitious' কথাটার মতো কড়া ইংরেজি বুঝবার বিদ্যা বোধহয় রায়-সাহেবের ছিল না; বলে বসল 'Yes sir, yes sir'।

এর পর কয়েকদিন চাল ভালোই এল। আবার একদিন অমনি পচা চাল। খেতে বসে গন্ধ পেয়েই তো যতীন শেঠ থালা ধরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ডেকেছেন, 'জমাদার, জেলার কাঁহা হ্যায়? বোলাও উস্‌কো।'

পূর্ণ দাস বললেন, 'নিয়ে এস শা···কে। ওকে কুচি কুচি ক'রে কেটে পদ্মায় ভাসাব, তারপর না হয় ফাঁসি যাব।'

এর পর মিনিট পনেরো না যেতে খাসা সরু চালের ভাত, কয়েক রকমের তরকারি আর গরম গরম চপ শুদ্ধ পরিষ্কার বড়ো বড়ো থালায় ক'রে কয়েদীরা বয়ে নিয়ে এল। বলা বাহুল্য, এরপর থেকে আর কোনো দিন গুদাম পচা চাল স্টেট প্রিজনারদের কাছে আসেনি।

কয়েকজন একাদশী করতেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হুকুম দিলেন, তাজা ফল যেন দেওয়া হয়।

রায়সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন বেশ একটু স্থূলকায়া, এবং অফিসের উপরে দোতলা থেকে তিনি যে কণ্ঠে কথা বলতেন, জেলের ভিতরে কয়েদীরা শুনতে পেয়ে তাঁর নাম দিয়েছিল 'রায়বাঘিনী'। কয়েদীরাই রাজবন্দীদের খবর দিল, একাদশীর ফলাহারের ব্যবস্থা স্বামীর মুখে জেনে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'ত্যাজ-চন্দ্রের ব্যাটারা! কিশমিশ প্যাস্তা খাবেন!'

আমি রাজসাহীতে গিয়ে রায়সাহেবের দর্শন পাইনি। তার জায়গায় এসেছে উপেন মুখার্জি বলে একজন। ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯১৪ সালে যখন পূর্ণ দাস তাঁর দলবল নিয়ে ফরিদপুর জেলে বিচারাধীন বন্দী, উপেন মুখার্জি তখন সেখানকার জেলার। চিত্তপ্রিয়ের বারো বছরের ভাই কান্তিপ্রিয়ের প্রতি জেলে দুর্ব্যবহারের জন্য একদিন জেলারকে মার দেবার বন্দোবস্ত করেছিলেন পূর্ণদা, সন্তোষ দত্ত এবং আরও দু-একজন। রাতের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে উপেন মুখার্জি দরজার বাইরে থেকে ওঁদের আলাপ-আলোচনা শুনে ফেলে। তার পরদিন থেকে ফরিদপুর জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা ফিরে গেল।

তারপর হুগলী জেল হয়ে উপেন মুখার্জি রাজসাহীর জেলার হয়ে এসেছে। পূর্ণদাও সেখানে রয়েছেন। সরকারী হুকুম ইদানীং একটু রাশ ঢিলে দিয়েছে, তার ফলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যদি বলে একগুণ, জেলার করে দশগুণ। তাছাড়া অন্য বুদ্ধিও উপেন মুখার্জির ছিল। সে জানে. রাজবন্দীদের পেছনে যদি দশ টাকা খরচ করে, উপরি পাওনা না হয় এক টাকা হতে পারে; কিন্তু ত্রিশ

টাকা খরচ করলে চাই কি পাঁচ টাকাও হতে পারে। আর টাকা তো গৌরী সেনের। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জিজ্ঞেস করলে অনায়াসে বলা চলে, 'স্যার, না দিলেই রাজবন্দীরা গোলমাল করবে।' সে নিজেই এসে রাজবন্দীদের বলে, 'এখানে এমন ভালো ভালো ছোট মাছ পাওয়া যায়, আপনারা রোজই রুই মাছ খাচ্ছেন কেন? আমি কালই ব্যবস্থা করছি।'

আড়াই সের যদি রুই মাছ আসত, তার পরদিন থেকে তার সঙ্গে আরও এক সের ক'রে পাবদা বা বাটা মাছ আসতে শুরু করল। তারপর একদিন ভালো কই মাছ বাজারে উঠল, সেদিন থেকে তা-ও আর দু'সের ক'রে আসতে থাকল, এইভাবে যেমন মাছ, তরকারি, ফল, তেমনি কাপড়, জামা, জুতো, তেল, সাবান। চাল, ডাল, আটা, ঘি, চিনি তো গুদামে স্লিপ পাঠালেই হল।

অবস্থা এই দিকে যখন ঘুরছে, তখন আমি রাজসাহী পৌঁছালাম। পৌঁছাবার পর দিনই ম্যানেজারীর মাঁট্রসেক ইত্যাদি পূর্ণদা আমার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। ওখানে তখন ম্যানেজারী করা মানে আর কিছু নয়, কোনো জিনিস কখনও কোনো কারণে দিতে অস্বীকার করলে ধমক দিয়ে আদায় করা। অত দিন হাঙ্গার স্ট্রাইক ক'রে গেছি—কথা ভারে কাটে অনেকখানি।

রাজবন্দীদের সব জায়গায় যে অবস্থায় রেখেছে, আমাদেরও জিদ চেপে গেল, অস্বীকার কোনো জিনিসে করতে দেব না। গিরীনদা আমাদের মধ্যে বয়সে সবার চেয়ে বড়ো ছিলেন, এবং তাঁর আপনভোলা স্বভাবের জন্য সবাই তাঁকে শ্রদ্ধাও করতাম। মুখফোড় লোক—ঝগড়া-ঝাটিও তিনিই এগিয়ে গিয়ে করেন। তাঁর একটা নীতি আমরা মেনে নিয়েছিলাম—কোনো কিছু চাইবার আগে ভেবে-চিন্তে চাইব। কিন্তু যা চাইব, তা যেমন ক'রে হোক আদায় করতে হবে। জেলখানার আগাগোড়াকার জীবনে এই নীতিটি পালন করতে চেষ্টা করেছি।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন রাজবন্দী একে একে ওখানে গেলেন—এঁরা সবাই অনুশীলনের লোক—প্রবোধ দাশগুপ্ত, যোগেশ চ্যাটার্জি, প্রতুল গাঙ্গুলী। প্রবোধ নতুন ধরা পড়ে এসেছেন।

আগেই বলেছি, প্রতুলবাবু আমাদের সঙ্গে আলিপুরের হাঙ্গার স্ট্রাইকে ছিলেন এবং একই সঙ্গে আমরা মধ্যপ্রদেশে যাই—আমি বিলাসপুরে, প্রতুলবাবু রাইপুরে। এখন মধ্যপ্রদেশ থেকে সবাইকে আবার বাংলা অথবা হাজারীবাগে পাঠিয়ে দিল।

যোগেশ ছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলের চুয়াল্লিশ ডিগ্রীতে। আমি যখন ১৯১৭ সালের জুলাই মাসের দিকে সেখানে ছিলাম তখন তিনিও সেখানে। দূর থেকে দেখেছি মাত্র, আলাপের সুযোগ হয়নি। তাঁদের প্রতি তখনকার ব্যবহারের কথা বলেছি। সম্প্রতি ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি বীচ্‌ক্রফ্‌ট্‌ চন্দ্রভার-কর কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেবার জন্যে কয়েকজনকে প্রেসিডেন্সি জেলে এনেছে। দু'চার দিনের জন্যে এঁদের এনেছে, যাঁকে যেখানে খালি জেল পেয়েছে সেখানেই রেখেছে। অরুণ গুহকে এনে রেখেছে চুয়াল্লিশ ডিগ্রীতে। যোগেশকে পাশে পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, 'এই ব্যবহার আপনারা সয়ে যাচ্ছেন কেন ?'

'কি করব ?'

'আমরা মেদিনীপুরে হাঙ্গার স্ট্রাইক করার পর তো অবস্থা ফিরতে শুরু করেছে।'

ওঁরা সব তিনচারদিন পরই ফিরে গেছেন। এর পর হয় প্রেসিডেন্সির চুয়াল্লিশ ডিগ্রীতে হাঙ্গার স্ট্রাইক। তারপর অতীন রায়চৌধুরীকে নিয়ে গেছে ঢাকা জেলে, আর যোগেশকে এনেছে রাজসাহীতে চারদিন উপবাসের পর।

সুরেশবাবু আগ্রায় যে কয়মাস ছিলেন, শুধু দুধ খেয়ে থাকতেন রোজ পাঁচ সের। এখানেও তাই চালালেন, তার সঙ্গে কিছু কিছু ফল খেতেন। তার-পর আমিই একদিন বললাম, 'এতে লাভ কি ?' স্বাভাবিক মতোই খাওয়া-দাওয়া শুরু করলেন। কিন্তু জেলারের ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁর দুধের পরিমাণ পাঁচ সেরই বজায় রইল। আমাদের সকলের পাওনার উপর এই পরিমাণটাই আমাদের রোজ ক্ষীর, সর, মিঠাই খাওয়ার ব্যবস্থা হল।

খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিকই আছে। রান্নাঘরেও রোজ আমাদের এক-একজন ম্যানেজারী করতে যান ; কে কত পদ করাতে পারেন, তার প্রতিযোগিতা চলে। একটি হিন্দুস্থানী দাগী কয়েদী রান্না করে—উত্তরবঙ্গের রাজবংশী তিন-চারটি কয়েদী তাকে সাহায্য করে। এক-একদিন সাড়ে এগারোটা বারোটার ভিতর বাবুদের সকলের জলখাবার খাইয়ে কুড়ি-বাইশ পদ রান্না নামিয়ে দেয়। এই হিন্দুস্থানীটিও যেমন রান্নায় ওস্তাদ, রাজবংশীরাও তেমনি হাসিমুখে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। এমন সৎ আর সরল এদের প্রকৃতি—কেন যে দলে দলে এদের জেলে এনে পুরেছে ভেবে পাওয়া দুষ্কর।

পাই এত, রান্না হয় এত—অথচ খাবার বেলায় অনেক দিন আমাদের

কপালে মাছ-তরকারিও থাকে না। যত দিন যায়, জেলের ভিতর স্বাধীনতা যত বাড়ে, তত চোখে পড়ে চারিদিকে কত বুভুক্ষু লোককে রেখে আমরা খাই! আমরা খাই চর্ব্য-চূষ্য, তারা খায় মানুষের অখাদ্য ডাল আর তরকারি, আর মোটা মোটা ভাত। ক্রমে এমন হয়ে পড়ল যে এক-একদিন পঞ্চাশ-ষাটজন পর্যন্ত কয়েদীর ফাইল ধরে বসিয়ে লুচি মাংস আর মিষ্টি খাওয়াই। অবশ্য এ অবস্থা একদিনে আসেনি। সে পরের কাহিনী পরে বলা যাবে।

কাপড় জামা জুতো তেল সাবানের দিকেও অবস্থা পৃথক নয়। এদিকে আমাদের বাক্সে-পেটরায় এক-একটি প্রকাণ্ড ফোকর দেখা দিয়েছিল।

খবরের কাগজ ওরা দেবে না। কিন্তু খবরের কাগজ না পড়লে আমাদেরও চলে না। কাজেই কাগজ যোগাড় হয়—জেলের ছোট-বড় কর্মচারীর মারফত। অনেক আপদ-বিপদ ঘাড়ে নিয়ে তাঁদের এই কাজ করতে হয়। তাঁদের কিছু দেওয়া কর্তব্য হিসাবেই আমরা দিই, কাগজের মূল্য হিসাবে নয়। তাছাড়া সিপাই জমাদারদের বিপক্ষে রেখে এসব কাজ করা চলে না। তারা আমাদের পেছনে লেগে থাকবে না, এই অবস্থাটা আনতে গেলে আমরা খুব ভালো লোক বলে তাদের কাছে পরিচয় হওয়া চাই। তাই ঘি তেল চিনি ময়দা থেকে শুরু ক'রে কাপড় জামা জুতো তেল সাবান—এমন কি গামলা ডেকচি পর্যন্তও এই পথে উড়ে যেত। জেলখানার অত কড়াকড়ির ভিতর কি ক'রে ওরা নিত এসব? আমারও এক সময় আশ্চর্য লাগত—বিশেষ ক'রে যখন একজন সিপাই একদিন একটা ডেকচি চাইল। আমি জিজ্ঞেস করতে সে বলল, বাবুজি, জেলের কেবল দেওয়ালটাই নিয়ে যাওয়া চলে না, আর কিছুই আঁটকায় না।

সকাল বেলা কাগজ আসে। একজন একটা সেলের ভিতর বসে সেটা পড়ে নোট করেন, আর একজন দরজার সামনে এবং সেলের ইয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেন—কারণ, সেটা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসবার সময়। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা একটা ঘরে জমায়েৎ হই—সেটা আমাদের বৈঠকখানা, সেখানে টানাপাখা ছিল, আর ফরাশ বিছানো। প্রথমে খবরগুলো শোনা হয়, কারও ভালো বক্তৃতা বা প্রবন্ধ থাকলে তা পড়া হয়। তারপর তাস বা পাশা খেলা। যাঁরা ওতে রস পান তাঁরা খেলেন, নয়তো নিজের নিজের ঘরে বা গাছতলায় বসে পড়াশোনো করেন। বিকালে ব্যাডমিণ্টন খেলা হয়। তারপর হাত-পা ধুয়ে কিছু সময় একটা খোলা মাঠে সবাই মিলে বসি। সেলগুলো এমনই গরম যে —যতক্ষণ বাইরে কাটিয়ে যেতে পারা যায় ভালো।

আমি বসে থাকি—নরেশদা আমার কোলে মাথা রেখে ঘাসের উপর শুয়ে পড়েন। কোনো কোনো দিন মণিদা অথবা রসিক। আমি বলি, ময়মনসিং-এর লোকেরা শুতে ভালোবাসে। নরেশদা আমায় একটা ঘুঁষি মেরে বলেন, তুলোর ঢিবি। হাঙ্গার স্ট্রাইকের পরে নতুন ক'রে শরীর গড়ে উঠছে—গায়ে প্রচুর মেদ জমছে। দেখি, লক্ষণ ভালো নয়। ভোরে উঠে মাঠের চারিদিক দিয়ে দুই মাইল দৌড়াই, বিকালে ডাম্বেল বা ডেভেলপার নিয়ে ব্যায়াম করি, শরীর আবার শক্ত হয়ে উঠতে থাকে।

এর ভিতর একদিন নরেশদাকে নিয়ে চলে গেল আলিপুর জেলে চিকিৎসার জন্য। উদার, সরল, অমায়িক নরেশদার সঙ্গের মাধুর্য, আর রাজসাহী জেলের ঐ এক বছরে তাঁর যা অবস্থা হয়েছে—সব মিলিয়ে তিনি যখন চলে গেলেন, আমাদের জীবন থেকে যেন অনেকখানি খসে গেল। এঁরা দুই ভাই রমেশ আর নরেশ ছিলেন দুই পৃথক দলে। দু'জনের চরিত্রের পার্থক্যও যে-কোনো লোকের চোখে পড়ত। সখারাম গণেশ দেউসকর যখন 'দেশের কথা' লেখেন, সে কাজে সখারামের উপদেশ মতো নরেশদা অনেকভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স অল্প। সেই থেকে নরেশদার পড়াশোনোর প্রতিও বেশ একটা ঝোঁক গড়ে উঠেছিল। রাজসাহী জেলে পরে পড়াশোনোর যে একটা আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল, তাতে নরেশদার দান সামান্য নয়। কয়েক বছর পরে নরেশদার থাইসিসে মৃত্যু হয়।

দিনটা আমাদের এক রকম কাটে। আর সব ব্যবস্থাই মোটামুটি ভালো। কিন্তু রাত যেন আর কাটতে চায় না। এপ্রিল-মে মাসে রাজসাহী জেলের ঐ সেলগুলো যেন এক-একটি স্টীমারের বয়লারের পাশের জায়গাটির মতো হয়ে থাকত। না পারা যেত পড়তে, না পারা যেত শুতে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শীতলপাটি আর হাতপাখা পর্যন্ত কিনে দিতে পারে, কিন্তু 'A State Prisoner shall be confined in a cell'—এই ছিল তখনকার আইন—সে-সেল মানুষের বাসের যত অযোগ্যই হোক না কেন। কি আর করা যাবে? শীতলপাটিটা সেলের দরজার গোড়ায় মেঝেতে বিছিয়ে নিতাম, কুঁজোর জলে গামছা ভিজিয়ে বার বার শীতলপাটিতে লাগাতাম, তারপর ঘুমোতে চেষ্টা করতাম। ঘুম যখন আসত না, তখন শুরু হতো সবাই মিলে এ-সেল ও-সেল থেকে চিৎকার, আর মণিদার উদ্দাম সংগীত, সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিংয়ের খাটে উঠে নৃত্য। সুরেশবাবু শুরু ক'রে দিতেন যাত্রার দলের পাঠ বলা—'ডাক্, ডাক্ তব

পিতামহকে।' 'ডাক্' 'ডাক্' দু'টি আওয়াজ যখন করতেন, তখন মনে হতো বাজ পড়ে বুঝি সেলের ছাদ ভেঙে গেল। জেলের অপর প্রান্ত থেকে জমাদার ছুটে আসত কি কাণ্ড হল দেখবার জন্যে। দরখাস্তের পর দরখাস্ত পড়তে লাগল—সেল বাস থেকে মুক্তির জন্য। ফল কিছু হল না। এর ভিতর এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটল।

রসিক সরকার ছিলেন অনুশীলনের লোক। দলের সঙ্গে এক সময়ে মতের বনিবনাও হয়নি। তখন দল ছেড়ে পূর্ণদার সঙ্গে কাজ করেছেন। পরে দলের অন্যতম নেতা, ভাইপো অমৃত সরকার আবার চেষ্টা ক'রে দলে ফিরিয়ে নিয়েছেন। বয়সে রসিক আমাদের সমবয়সীই হবেন, কিন্তু ঐ বয়সেই তাঁর মাথার চুল অনেক পরিমাণে পেকে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে খুব স্ফূর্তি করেন। কয়েদীদের সঙ্গে গল্প ক'রে তাদের দুঃখদৈন্যের কথা শোনেন। কখনও কখনও বা তাদের কথা শুনতে শুনতে ঘরে এসে খাওয়া-দাওয়ার বা অন্য জিনিস যা পান দিয়ে দেন। আবার এক-এক সময় ভয়ানক গম্ভীর হয়ে মাঠের ভিতর একা চুপচাপ বসে থাকেন। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে হেসে উড়িয়ে দেন।

কোনো কোনো দিন খেলার মাঠে যান না। কোনো কোনো দিন খুব স্ফূর্তি হৈ চৈ ক'রে খেলাধুলো করেন। আমারই মতো ব্যাডমিণ্টন ভালো খেলতে পারতেন না। সুরেশবাবু ছিলেন সব চেয়ে ভালো খেলোয়াড়, কাজেই কোনো দিন আমাকে, কোনো দিন রসিককে সুরেশবাবুর বায়া হতে হতো। খেলায় এক-একটা ভুল করলে সুরেশবাবু আসতেন র‍্যাকেট নিয়ে তাড়া ক'রে, রসিকও র‍্যাকেট তুলে রুখে দাঁড়াতেন। তখন শুরু হতো দু'জনের মাঠ জুড়ে নটরাজের নৃত্য। হাসতে হাসতে আমাদের পেটের নাড়ী ছিঁড়তো।

সেদিন রসিক সবচেয়ে বেশি ক'রে নৃত্য করেছেন। তরপর, খেলাধুলার পর রোজকার মতো যে যার ঘরে বন্ধ হয়ে গেছি। শেষ রাতের দিকে কি একটা গোলমাল শুনে ঘুম ভেঙে গেল। ডাকছি, 'সিপাই, সিপাই, কি হল ?' সে কি জবাব দিল, আমি শুনলাম 'সাপ'। মনে করলাম, বুঝি কোনো সেলে সাপ ঢুকেছে। দু'জন ক'রে সিপাই থাকত রাতের বেলা আমাদের পাহারা দেবার জন্য, দিনের বেলায় তিনজন। এদের একজন ছিল গুর্খা। সামনে যার গলার আওয়াজে আমি শুনলাম 'সাপ', সেটি গুর্খা।

আর ইতিমধ্যে হিন্দুস্থানী সিপাইটির গলা শুনছি, সেলের পেছনে

হাসপাতালের কাছে। তার গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছে না—বলছে, 'চাবি লাও, চাবি লাও।'

সে বোধহয় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। বিপদে সংকেত ধ্বনি করবার জন্ত তার পকেটে ছিল হুইস্‌ল্, সে-কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। হাসপাতালের সিপাই তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, শিটি বাজাও না! তৎক্ষণাৎ নিয়মানুযায়ী এক হুইস্‌লের সঙ্গে চারদিকে হুইস্‌ল্ এবং গেটে ঘণ্টা বেজে উঠল।

তারপর সেলব্লকের এক প্রান্ত থেকে কি সব আওয়াজ হল, আমরা অপর প্রান্ত থেকে বিশেষ কিছু বুঝতে পারলাম না।

হুইস্‌ল্ ও ঘণ্টা বাজা বন্ধ হওয়ার অনেকটা পরে একজন সিপাই আমাদের সেলের দিকে এল। তাকে অ্যান্টিসেলের ভিতরে ডাকতে সে প্রথমটা তো সাহসই পায় না। অনেক ইতস্তত করার পর চারিদিক দেখে যখন ভিতরে এল, তখন তার মুখে শুনলাম, দশ নম্বরের বাবু নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে খুলে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। বেঁচে আছেন কি মরে গেছেন —সে খবর ও বলতে পারল না বা বলল না।

দশ নম্বর সেলে থাকতেন রসিক।

আর আমি গুর্খার যে আওয়াজটি শুনেছিলাম, সেটা 'সাপ' নয়, 'আগ'।

ভোর পর্যন্ত পরস্পরকে ডাকাডাকি ক'রে আর বিশেষ খবরও পেলাম না। ডাকাডাকির উৎসাহও তেমন ছিল না।

ভোরে খুলে দিতে শুনলাম ও দেখলাম সব।

রাত প্রায় বারোটা পর্যন্ত আট ও ন' নম্বর ঘরে প্রতুলবাবু ও গিরীনদা পরস্পরকে ডাকাডাকি ক'রে গল্প করেছেন। একটু অসহিষ্ণু হয়ে দশ নম্বর ঘর থেকে রসিক গিরীনদাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'গিরীনদা, রাত যে বারোটা বাজে, আপনারা ঘুমোবেন না?'

এর পর ওঁরা গোছগাছ ক'রে শুয়ে ক্রমে ঘুমিয়ে পড়েছেন। রসিক তখন খাটে মশারি ঝুলিয়ে দিয়ে খাটখানাকে ঠেলে সেলের দরজার গায়ে ঠেকিয়ে দিয়েছেন তারপর কয়েকখানা কাপড় দিয়ে নিজের আপাদমস্তক জড়িয়েছেন। কিছু দিন ধরে হারিকেন থেকে তেল ঢেলে রেখে খাটের তলায় মগে জমিয়ে রেখেছিলেন। সেই তেল সর্বাঙ্গে ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। আগুন দেখে গুর্খাটি দরজার বাইরে থেকে টেনে মশারি ছিঁড়েছে আর হিন্দুস্থানী সিপাইকে বলেছে, 'যাও, চাবি লাও।' অ্যান্টিসেলের ভিতর চৌবাচ্চায় যে জল ছিল নিজে মগে ক'রে

সেই জল নিয়েছে, আর সেলের গরাদের ফাঁক দিয়ে ছিটিয়ে আগুন নেভাতে চেষ্টা করেছে।

উপেন মুখার্জি জেলার রাতের বেলায় প্রকৃতিস্থ থাকত না। তার উপর যখন শুনেছে, একজন স্টেট প্রিজনার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন, তখন সে পথেই গড়িয়ে পড়েছে—তার হাতে চাবির গোছা। যতীন গুহ ডাক্তার যখন দৌড়ে ভেতরে ঢুকছিলেন, দেখেন জেলার রাস্তার পাশে পড়ে রয়েছে। তাঁকে দেখে উপেন মুখার্জি বলে, 'আপনার পায়ে পড়ি ডাক্তার বাবু, এই নিন চাবি, আমায় বাঁচান।'

যতীনবাবু এসে যখন সেল খুলে খাট ঠেলে দিয়ে ঘরে ঢুকলেন, রসিক তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ছেন। আগুন সিপাইর ছিটানো জলে প্রায় নিভে এসেছে। যতীনবাবু যখন তাঁর হাত ধরলেন, তখনই তিনি কেবল একটা গোঙানি শব্দ ক'রে পড়ে গেলেন। তাঁকে ধরাধরি ক'রে হাসপাতালে নিয়ে যায়, সেখানে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর প্রাণবিয়োগ ঘটে।

আমরা ভোরবেলায় লক্ষ্য ক'রে দেখার সুযোগ পেলাম। সেলের পিছন দিকে একেবারে উপরে যে একটি ছোট জানালা থাকে, তার ঠিক নিচে কাপড় জামা ঝুলিয়ে রাখার একটি ব্রাকেট। তাতে চারটি পেগে জামা-কাপড় ঝুলছিল। যতক্ষণ ধরে পুড়েছেন, ততক্ষণ ধরে এমনই সোজা দাঁড়িয়ে ছিলেন যে, চারটি পেগের মাঝের দু'টিতে ঝোলানো কাপড় পুড়ে গেছে, কিন্তু পাশের দু'টির জামা কাপড় যেমন-কে তেমনই রয়ে গেছে—বোঝা যায়, কী শক্ত মন নিয়ে ঐ আগুনে পোড়ার যন্ত্রণাটি তিনি সয়েছেন।

পরদিন আমরা সকলে মিলে অনেক গবেষণা করলাম, কেন রসিক এই কাজ করলেন। বলতে গেলে আমরা কোনো কারণই স্থির করতে পারিনি। পূর্ণদা যা যা জানতেন, বললেন। পূর্ণদার সঙ্গে পরিচয়ের কথা বলেছি এবং সে-পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ।

তাঁর মতে রসিক একটি পুলিশ কর্মচারীকে হত্যায় লিপ্ত ছিলেন। সেই কর্মচারীটিকে যখন গুলী করা হয় তার কোলে একটি ছেলে ছিল; সেই ছেলেটিও সেই সঙ্গে মারা যায়। রসিক নাকি পূর্ণদাকে কয়েকবার বলেছেন, সেই ছেলেটি যেন মাঝে মাঝে তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

রসিক রাজসাহী জেলে আসবার পূর্বে ছিলেন হুগলী জেলে। সেকালের রাজবন্দীদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করার জন্ত চারটি জেল বিশেষ খ্যাতি অর্জন

করেছিল—প্রেসিডেন্সি, রাজসাহী, ফরিদপুর ও হুগলী জেল। হুগলীতে জেলের চার কোণে চারটি সেলে রাজবন্দীদের রাখত। প্রত্যেক সেলের সামনে খানিকটা ক'রে জায়গা চট দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল। রাজবন্দী ওর বাইরে মুখ গলাতে পারবেন না, আর বাইরের কোনো লোকও ওর ভেতরে উঁকি মারতে পারবেন না।

রসিক ঐ অবস্থায় প্রায় এক বৎসর ছিলেন। পূর্ণদা বলেন, তার কিছুদিন পূর্বেও বাইরে রসিকের সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছে—বেশ সুস্থ সতেজ যুবক! এখন মাথার অর্ধেকের উপর চুল পেকে গেছে। মাঝে মাঝে বেশ স্ফূর্তিতে থাকেন, মাঝে মাঝে বেজায় গম্ভীর হয়ে পড়েন।

পূর্ণদাকে রসিক বলেছেন, উপেন মুখার্জি হুগলী জেলে যাবার পর মাঝে মাঝে রাত্রে গোপনে বে-আইনী ভাবে রসিককে সেল খুলে জেলারের বাসায় নিয়ে যেত, সেখানে ভালো ভালো খাবার খেতে দিত। একজন পুলিশ কর্মচারী সেখানে যেত, ওঁকে নানারকম ভয় দেখাত, প্রলোভন দেখাত।

এখন রসিক আত্মহত্যা করবার পর পূর্ণদার মুখে এই সব কথা শুনে একবার আমাদের মনে সন্দেহ জাগল, ঐ অবস্থায় পুলিশের কাছে রসিক কিছু বলে ফেলেছেন কি না এবং তারই অনুতাপে আত্মহত্যা করলেন কি না।

সেযুগে বিপ্লবীরা যে-শিক্ষা ও দীক্ষা পেতেন, তাতে সেরকম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মুহূর্তের দুর্বলতায় অনেকে, ক্ষতি না হতে পারে, এমন কিছু বলেছেন, তারপর সারাজীবন নিদারুণ অনুতাপে জ্বলে মরেছেন, অনেকে পুড়ে পুড়ে নতুন মানুষ হয়ে গড়ে উঠেছেন, আবার অনেকে প্রতি মুহূর্তের এই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা ক'রে জুড়িয়েছেন—এরকম দৃষ্টান্ত কম নয়।

কিন্তু ভেবে ও আলোচনা ক'রে আমরা সিদ্ধান্ত করলাম, রসিকের ক্ষেত্রে এরকম সম্ভব নয়। সে-মানুষের ধরনই আলাদা। এবং রসিক এমন প্রকৃতির যে ওরকম কিছু হলে তা অন্ততঃ পূর্ণদার কাছে গোপন করতেন না। যে-ঘৃণা তিনি পুলিশ কর্মচারী ও উপেন মুখার্জির মুখের উপর প্রকাশ করেছেন বলে পূর্ণদাকে বলেছেন, সে-কথায় সন্দেহ প্রকাশ করবার বিন্দুমাত্র হেতু নেই। এবং তারই ফলে তাঁকে রাজসাহী জেলে এনেছে। পরবর্তী সব ঘটনা থেকেও রসিকের প্রতি তাঁর সহকর্মীরা কোনো সন্দেহ পোষণ করেননি।

সব দেখে শুনে আমাদের ধারণা হল, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা দীর্ঘকাল সয়ে সয়ে মনটা এমনই কোমল হয়ে উঠেছিল যে সেই অবকাশে সেই পুলিশ

কর্মচারীটির নিরপরাধ শিশু-সন্তানের স্মৃতি ওঁকে পীড়া দিত। যে উদার-কোমল মন আমরা রসিকের ভিতর দেখেছিলাম তাতে এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক যে নিজের উপর নির্মম প্রতিশোধ নেবার এইটিই হেতু।

স্নেহলতার করুণ কাহিনী বাঙালী জাতির ভুলে যাবার কথা নয়। সে ঘটনা এরই কিছুকাল আগে ঘটে। পরে আমরা জানতে পেরেছিলাম, স্নেহলতার কথা রসিক কয়েদীদের সঙ্গে পর্যন্ত আলাপ করতেন। এবং সেই উপলক্ষে পুড়ে মরতে শরীরের কোন্ অংশ বিশেষ ক'রে জখম হয়—এই সব প্রশ্নও করতেন।

কি তাঁর মনে হতো, তার সবটুকু অনুমান করা শক্ত। অনেক দিন গল্প করতে করতে হঠাৎ কোথাও উধাও হয়ে যেতেন। পরে দেখা যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাঠের ভিতর চুপচাপ বসে আছেন। কোনো দিন বা একখানা চক্ নিয়ে সব ঘরের দরজায় লিখেছেন, 'চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কাজ সাধিত হয় না।' কোনো দিন বা এমন কথা লিখেছেন যাতে আমাদের অচ্ছুত জাতিদের প্রতি তাঁর দরদ প্রকাশ পায়।

ম্যাজিস্ট্রেট এল অনুসন্ধান করতে। কয়েকদিন আগে রসিকের বাড়ি থেকে একখানা চিঠি এসেছিল—তাতে অর্থাভাবে বাড়ির লোকের কষ্টের কাহিনী ছিল। আমাদের ভিতর যে দু'একজনের জবানবন্দি নিল, তাঁরা এই চিঠির উপরই জোর দিলেন। এটা আমরা পরামর্শ ক'রে স্থির করেছিলাম।

রাজনৈতিক বন্দীদের ব্যাপার দেখাশোনা করত সে যুগে একজন অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী। তখন ছিল ষ্টিফেনসন—ঝুনো সিভিলিয়ান। রসিকের আত্মহত্যার পর আমাদের এক টেলিগ্রাম গেল তাকে আসবার অনুরোধ জানিয়ে। একদিন বিকেলে তো এসে উপস্থিত। তাকে সেল দেখাতে ভিতরে ঢুকিয়ে কথায় কথায় আটকে ফেলা হল—মতলব আঁটাই ছিল—সঙ্গে গিরীনদা কথা বলতে বলতে ভিতরে ঢুকেছেন, আমরা বাদবাকীরা দরজা জুড়ে যেন কথাই বলছি। বেশি বেগ পেতে হল না—জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ণ, তায় রাজসাহীর সেল, অপর দিকে আছেন বিলাতী সাহেব, একটু স্থূলকায়, কলকাতায় পাখার তলায় বসে কাজ করে। তিন-চার মিনিটের মধ্যে রুমাল দিয়ে চোখ-মুখ মুছতে মুছতে হাঁপাতে শুরু করল। বলে, 'দেখুন, এসব সেল তো আপনাদের জন্যে তৈরি হয়নি, হয়েছিল পাকা অপরাধীদের জন্যে!'

এই কথাটি স্বীকার করার পর সেল থেকে মুক্তি দেওয়া হল। সেদিন আর

বেশি কথা হল না, বলে গেল, পরদিন সকালে আসবে। অফিসে বসে রসিকের মৃত্যু সম্পর্কে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেলারের যা যা বলবার ছিল শুনল।

ওদের পণ ছিল, সেল ছাড়া আমাদের রাখবে না। আমরাও যে-কোনো উপায়ে হোক, সেলে বন্ধ রাখার প্রথা রহিত করাব। আমাদের কথা—রসিকের আত্মহত্যা সম্ভব হতো না যদি আমরা রাত্রে একসঙ্গে একটা ওআর্ডে বন্ধ থাকতাম।

পরদিন সকালে প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে অনেক তর্ক-বিতর্ক হল। গিরীনদা বললেন, 'কেউ পালাবার চেষ্টাও করবে না—আমাদের উপর নির্ভর ক'রে যদি আমাদের পদ্মার ধারে নিয়ে ছেড়ে দাও, আমরা আবার ফিরে আসব।'

ষ্টিফেনসন প্রবোধের দিকে চেয়ে একটু হেসে জিজ্ঞেস করে, 'What has Probodh got to say to that ?' প্রবোধ একবার দালান্দা হাউজ থেকে পালিয়ে পরে আবার ধরা পড়ে এসেছেন।

প্রবোধ মুখের মতো জবাব দিলেন, 'Did you then depend on my honour ?'

ষ্টিফেনসন সব শুনে সব দেখে চলে গেল। দিন তিনেক বাদে টেলিগ্রাম এল। ব্যবস্থা হল, দিনের বেলা আমাদের সেলেই কাটাতে হবে, রাত্তির বেলায় হাসপাতালের দোতলার ঘরে বন্ধ হব। ঘরখানা বেশ বড়, আর খোলা—পদ্মা অবধি দেখা যায়। আমরা তখন নয়জন ওখানে—সবাই X class, অর্থাৎ 'অত্যন্ত বিপজ্জনক', একসঙ্গে পাঁচজনের বেশি থাকতে পাব না। ঘরখানার মাঝামাঝি দিয়ে চাটাইয়ের একটা মস্ত বড় বেড়া ক'রে দেওয়া হল, তার একদিকে পাঁচজনের, অপর দিকে চারজনের থাকার ব্যবস্থা হল। রাত্রে খাবার ইত্যাদি দেবার জন্যে প্রত্যেক দিকে একজন ক'রে কয়েদী থাকার ব্যবস্থা হল; অবশ্য, খাবারটা একদিকেই থাকত, আমরা বেড়াটাকে ঠেলে একসঙ্গে বসেই খেয়ে নিতাম।

বলতে গেলে, রসিকের মৃত্যুর ফলেই আমাদের সেল-বাস ঘুচল। কিন্তু এই কথাটা আমাদের পীড়া দিত। কথাটা যেদিন খোলাখুলি আমি বললাম, গিরীনদার চোখ দু'টো ছলছল ক'রে উঠল, তিনি সরে গেলেন। অন্য সব জেলে কিন্তু স্টেট প্রিজনাররা শেষ পর্যন্ত (১৯২০) সেলেই কাটিয়ে গেছেন।

সেলে যতদিন ছিলাম, মনে হতো, কি দুঃখেরই জীবন! ওআর্ডে গিয়ে সবাই এক সঙ্গে থাকতে পারাটাই সবচেয়ে কাম্য। পরের জীবনে বুঝেছি, জেল-

খানায় এর চেয়ে মারাত্মক ধারণা আর কিছু নেই। একটা অত্যন্ত গণ্ডিবদ্ধ সীমানার মধ্যে থেকে সারা দিনরাত একই মুখ দেখা, একই কথা শোনা, অন্ত বৈচিত্র্য কিছু নেই, দায়িত্ব কিছু নেই, চিন্তাও না করলে চলে যায়—এ থেকে দাঁড়ায়, মানুষের মন কেবল পরস্পরের খুঁত ধরতেই লেগে যায়, পরস্পরের পার্থক্যের বোধটাই প্রবল হয়ে দেখা দেয়। সে-হিসাবে রাজসাহীতে এই যে ব্যবস্থা হল, দিনের বেলায় যার যার নিজের সেলে কাটাব, রাত্রির বেলায় এক-সঙ্গে থাকব, জেলখানার পক্ষে এ প্রায় আদর্শ ব্যবস্থা।

ভেদবুদ্ধি তবু আমাদের জীবনকে বিষাক্ত ক'রে তুলল। এই ভেদবুদ্ধির মূল ছিল কিন্তু আমাদের বাইরের জীবনে, এখানে কেবল তাই ডালপালা ফুলে ফলে দেখা দিল। এখানে বাংলার বিপ্লবী দলের গোড়াপত্তনের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটু আভাস দেওয়া অবান্তর হবে না। বলতে গেলে সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে বাংলায় গুপ্ত বিপ্লবী দল গড়ে তোলবার চেষ্টা প্রায় কোনো সময়েই থামেনি। এ চেষ্টায় সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতারা যা করেছেন, সে কথা বাদ দিলেও রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, যোগেন বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিকরাও হাত লাগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথেরা কয়েক ভাই-বোনে মিলে তাঁদের বাড়িতেই যে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তারই প্রভাবে সুরেন ঠাকুর একাজে অনেক দূর এগিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জনও এই প্রভাবে এসে পড়েন। তবে যাঁরা বেপরোয়া ও সক্রিয়ভাবে গত শতাব্দীর শেষ ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে বিপ্লবীদল গড়বার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে যতীন ব্যানার্জি (স্বামী নিরলম্ব), যতীন মুখার্জি ও ব্যারিস্টার পি. মিত্রের কথা আজ অনেকে মোটামুটি জানেন।

কলকাতার অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার পর মিত্তির সাহেব তার প্রসারের চেষ্টা করতে করতে স্বদেশী আন্দোলন এসে পড়ে। সে জোয়ারে কারও আর চেষ্টার প্রয়োজন ছিল না—বাংলার জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে আপনা-আপনি সব সমিতি গড়ে ওঠে। তার অনেকগুলি অনুশীলন সমিতির শাখা হয়ে যায়, অনেকগুলি পৃথক সমিতি হিসাবে চলতে থাকে। এর ভিতর বরিশালের 'স্বদেশ বান্ধব' সমিতি ও ময়মনসিংএ 'সুহৃদ সমিতি' ও 'সাধনা সমাজ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময় মিত্তির সাহেব ঢাকায় অনুশীলন সমিতির এক শাখা গঠন করেন ও খ্যাতনামা পুলিনবিহারী দাসকে তার পরিচালক নিযুক্ত করেন। পুলিনবাবু এই কাজের ভার নিয়ে সমিতির এক গঠনতন্ত্র ও প্রতিজ্ঞাপত্র প্রণয়ন

করেন এবং জেলায় জেলায় ঢাকা সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন। এই গঠনতন্ত্রে ও প্রতিজ্ঞাপত্রে অপর সমিতিদের সম্পর্কে নির্দেশ ছিল যে, ছলে-বলে-কৌশলে তাদের বিনাশের চেষ্টা করতে হবে। এই নির্দেশ যে মনোভাবের সৃষ্টি করত তার ফলে অপর সমিতিগুলি যেমন পরবর্তী যুগে অনেক সময় পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করেছে বা পরস্পরে মিলে গেছে, এই সমিতির সভ্যদের পক্ষে তা কখনও সম্ভব হয়নি। বরং এই সমিতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুকরণে অপর কোনো কোনো দলের লোকদের মধ্যেও অনেক সময় এক অশোভন ও অকারণ সংকীর্ণতা দেখা দিয়েছে।

এ-দ্বন্দ্ব অল্প দিনের মধ্যে পূর্ববঙ্গে যেমন জেলায় জেলায় তীব্র হয়ে ওঠে, অন্যত্র তা হয়নি। কলকাতায় বরং ঢাকা অনুশীলন সমিতির লোকেরা এসে যখন একটা পৃথক সত্তা বজায় রেখে চলতেন, যতীন মুখার্জি, যাদু গোপাল মুখার্জি, অতুল ঘোষ এবং আরও কেউ কেউ তখনও চেষ্টা করেছেন একযোগে চলতে। এঁরা আশা করতেন, সাময়িক পার্থক্য মিটে যাবে—কারণ পূর্ববঙ্গের কর্মীদের থেকে এঁদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন।

এঁদের অনেকে পুরানো কলকাতা অনুশীলন সমিতির লোক—অনুশীলন সমিতি তখন ছিল প্রধানতঃ লাঠিখেলার এবং অন্যভাবে শরীরচর্চার আখড়া মাত্র। সবারই মনে অবশ্য ছিল স্বাধীনতার একটা অস্পষ্ট চিত্র। তখন ঢাকা শাখার সভ্যদের সঙ্গে কলকাতা শাখার এঁদের কোনো পার্থক্য ধরা পড়েনি। যাতায়াত মেলামেশা চলত। ৪৯নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের (বর্তমান বিধান সরণী) কেন্দ্রই ছিল বিশেষভাবে মিলনক্ষেত্র।

এর আগে ১৯০২ সালে বরোদা থেকে আসেন যতীন ব্যানার্জী ও বারীন ঘোষ। বিপ্লবের কথা নিয়ে অল্পবিস্তর জল্পনা-কল্পনা যাঁরা করতেন তাঁরা অনেকে জানতেন, এঁদের পাঠিয়েছেন অরবিন্দ ঘোষ। এঁদের কার্যক্রম সম্পর্কে কানা-ঘুষো শোনা যেতে লাগল। তার ফলে অনুশীলন, আত্মোন্নতি প্রভৃতি সমিতির সভ্যদের অনেকের লাঠিখেলার চেয়ে বেশি আরও কিছু করার আগ্রহ দেখা দিল। দলের প্রধানদের কাছে একথা খুলে বললে তাঁরা বলতেন, 'ওসব করতে চাও তো ঐ বরোদা থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের কাছে যাও।'

বারীনবাবু এমন সময় একদিকে 'যুগান্তর' বলে কাগজের প্রতিষ্ঠা করেন, অপর দিকে মুরারীপুকুর বাগানে বোমা তৈরির কারখানা করেন। তখন ভাষা বদলে গেল—'বরোদা থেকে যাঁরা এসেছেন' না বলে, বলা হতো 'যুগান্তরের

ওঁদের কাছে যাও'। যুগান্তর দলের নামকরণের এইভাবে সূত্রপাত। এমনি ক'রে 'যুগান্তর দল' বলে যাঁদের পরিচয় হল, তাঁদেরও এটা অপছন্দ হবার হেতু ছিল না। কারণ, এর ভিতর স্বীকৃতি ছিল যে দেশের স্বাধীনতার যাঁরা স্বপ্ন দেখছেন, তাঁদের ভিতর এঁরা activist—কর্মোদ্যমশীল বা কর্মরত। দ্বিতীয়তঃ, যুগান্তর অর্থ একটা আমূল পরিবর্তনের কল্পনা। সুতরাং এই কর্মীরাও এই নামে আত্ম-পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করতেন। সাধারণভাবে শুধু বিপ্লবী বলেই নিজেদের জানতেন। যুগান্তর বলে কোনো দলের কেউ কখনও নামকরণ করেনি। এ নামে শুধু একটা ঐতিহ্য গড়ে ওঠে স্বতঃপ্রবৃত্ত সংঘাত-সংঘর্ষমূলক কর্মপ্রণালীর ফলে এবং সেটা সেই ১৯০৭-০৮ সাল থেকে।

এই মনোভাবের ভিতর আটঘাঁট কম ছিল, দলের কোনো গঠনতন্ত্রের বা গণ্ডির ধারণা ছিল না। সবটা যেন একটা বিশেষ মনোভাবই মাত্র। একটা আন্দোলন। আন্দোলনের লক্ষ্য একই—এক যুগ-পরিবর্তন বা যুগান্তর। অস্পষ্ট যা ছিল, অনেকে ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্তির চেয়ে বেশি কিছু চিন্তা করতেন না।

এই আন্দোলন কখনও কখনও হয়তো এক-একটা কেন্দ্রে বা খণ্ডদলের হাতে চলেছে। কিন্তু আন্দোলন একটাই। বারীনবাবুরা ধরা পড়বার পর তাঁদের অবশিষ্ট লোক এবং কলকাতা অনুশীলন ও আত্মোন্নতির সভ্যরা বরাবর মোটা-মুটি একযোগেই চলেছেন। ময়মনসিং, বরিশাল, ঢাকা, উত্তরবাংলা, যশোর, খুলনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের ঘাঁটিগুলির সহযোগিতা অবাধই ছিল। কিন্তু ঢাকা অনুশীলনের এককেন্দ্রিক গঠনতন্ত্র এক ভিন্ন মনোভাব, একটা দলীয় গণ্ডি সৃষ্টি ক'রে। সে-কথা আগে বলেছি। তার ফলে তার কর্মীদের সঙ্গে ওরকম সহযোগিতার চেষ্টা বরাবর নৈরাশ্যে পরিণত হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগে পার্থক্যের একটা রাজনৈতিক কারণ ঘটল যখন ভারতীয় বিপ্লবে জার্মানির সাহায্য পাবার সম্ভাবনা জানা গেল। সব দলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানানো হল। সব দল একত্র হয়ে যতীন মুখার্জির নেতৃত্ব মেনে নিল। কিন্তু ঢাকা অনুশীলন দল এই প্রচেষ্টায় যোগ দিতে অস্বীকার করল—নিজেদের পৃথক অস্তিত্বই প্রধান বিবেচনার বস্তু হয়ে দাঁড়াল। ঢাকা অনুশীলন দলে কিন্তু এর ফলে ভাঙন দেখা দিল। নেতৃস্থানীয় কর্মী কুমিল্লার নগেন দত্ত (গিরিজাবাবু) ও কাশীর শচীন সান্যাল (পূর্বে ইনি যাদু গোপাল, অতুল ঘোষের সঙ্গে কাজ করতেন) প্রভৃতি যখন জানতে পারেন তাদের দল বিপ্লব চেষ্টায়

যোগ দিতে অস্বীকার করেছে তখন তাঁরা দল ছাড়েন এবং অতুল ঘোষের কাছ থেকে সাংকেতিক পরিচয় নিয়ে উত্তর ভারতে রাসবিহারী বোসের সঙ্গে কাজ করতে থাকেন।

এই সবের ফলে ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৭-১৮ সাল পর্যন্ত ধরা পড়ে যাঁরা জেলে গেলেন, তাঁদের ভিতর ঢাকা অনুশীলনের লোক যাঁরা নন তাঁরাই পরস্পরকে যুগান্তরের লোক বলে জানতেন। এবং জেলখানাতে এঁদের প্রীতির বন্ধন আরও নিবিড় হল। কলকাতা অঞ্চলের যাঁরা পূর্ববঙ্গের দলের দ্বন্দ্বের খবরও রাখতেন না, তাঁরা কিন্তু জেলখানাতেও মনে করতেন বিপ্লবী যখন সবাই তখন দলাদলিটা সাময়িক, ও-ভুলটা এক সময়ে মুছে যাবে, আমরা সবাই একই। রাজসাহী জেলে আমাদের গিরীনদা ছিলেন এই দলের। তিনি ছিলেন 'আত্মোন্নতি'র লোক। কিন্তু এই সব ছোটখাটো দলের ভেদবুদ্ধি তাঁর মনে স্থান পেত না। আর বাইরে, জার্মানির সাহায্যে বিপ্লব চেষ্টায় আমরা এক নেতৃত্বে একযোগেই কাজ করেছি, এই জ্ঞানে আমরা পাঁচজন—গিরীনদা, পূর্ণদা, মণিদা, সুরেশ দাস ও আমি—যেন কতকটা এক পরিবারের লোকের মতোই চলতাম।

অন্যদের সঙ্গেও গোড়াতে আমাদের মোটামুটি হৃদ্যতাই ছিল। এঁরা চারজন ছিলেন ঢাকা অনুশীলনের লোক—প্রতুল গাঙ্গুলী, সতীশ পাকড়াশী, যোগেশ চ্যাটার্জি এবং প্রবোধ দাশগুপ্ত। এঁদের ভিতর প্রতুলবাবু রাজসাহীতে আসেন সকলের পরে।

সেল-বাসটা উঠে যাওয়া পর্যন্ত জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের একটা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ বিবাদের ভাব ছিল। সেটা ক্রমে কেটে গিয়ে মনের চাপটা যেন অনেকটা লঘু হয়ে গেল। পড়াশোনা যে করতে চায় তার দায়িত্ব আছে, অন্যের নেই—খেয়েদেয়ে, তাস-পাশা খেলে, ঘুমিয়ে দিন কাটিয়ে দিলেও কেউ কিছু বলবে না। এ অবস্থায় মুখ বদলানো হিসাবে তাস-পাশার পরিবর্তে পড়াশোনাও কেউ কেউ করে। তাতে মনের উপর কোনো দায়িত্বের চাপ থাকে না। অথচ মন একটা কিছু না নিয়ে থাকতে পারে না, তাকে সেভাবে সামান্য সময়ও ছেড়ে রেখে দিলে কোথায় ঘুরে মরে তার ঠিকানা নেই। আমরা বেছে নিলাম, দুই দলে পরস্পরের কুষ্ঠি কাটা।

অনুশীলনের সতীশবাবু এবং প্রবোধ সর্বশেষে ধরা পড়ে জেলে এসেছেন। কাজেই ওঁরা চারজন যখন এক সেলে জমতেন, আমরা প্রথমটা মনে করতাম,

ওঁরা বাইরের খবর-বার্তা নিচ্ছেন। কাজেই গুপ্তসমিতির সাধারণ নিয়মানুবর্তিতায় আমরা সেখানে যেতাম না। কিন্তু মাসের পর মাস এই খবর নেওয়ার ব্যাপার চলতে পারে না। কিছুদিনের ভিতর দেখলাম, যোগেশ ওভাবে একঘরে আলাদা জমে থাকাটা বিশেষ পছন্দ করছেন না। প্রেসিডেন্সি জেলে ৪৪ ডিগ্রীতে সমদুঃখীদের সঙ্গে কয়েকমাসের অভিজ্ঞতার পর ইনি একটা নতুন জীবন গড়ে তুলতে ব্যগ্র। সেই হিসাবে খানিকটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতেন, বন্ধুদের সাহচর্যও অনেক সময় এড়িয়ে চলতেন। উনি একাকী থাকেন বলে আমি অনেক সময় মিশতাম। সেই সূত্র ধরে ইনি এখন প্রস্তাব করলেন, আমার সাথে পড়াশোনা করবেন। সময় ঠিক ক'রে ইনি ইংরেজি, ভূগোল আর ফরাসি পড়তে শুরু করলেন। অপর তিনজনের সবার থেকে আলাদা হয়ে একত্র আলাপ-সালাপ সম্পর্কে মাঝে মাঝে একটা চাপা উষ্মা প্রকাশ করতেন। একটু দুঃখ ক'রে এমনও একদিন বললেন, তিনি যে পড়ার জন্যে আমার কাছে সময় কাটাতে আরম্ভ করেছেন, তাও তাঁর বন্ধুরা পছন্দ করছেন না। এই বেয়াড়া সংকীর্ণতায় দেশেরও অনিষ্ট হবে, নিজেদেরও—এই ওঁর মত। আমি বলি, 'কিন্তু বন্ধুদের অমতে আমার সঙ্গে মিশলে তোরও তো অনিষ্ট হবে।'

উনি বলেন, 'বয়ে গেছে, আমি মানুষের সাথে মিশব। আপনার অমত নেই তো?'

আমি বলি, 'আমার কেন অমত থাকবে?'

প্রবোধ ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির—উদার, সরল, গোঁয়ার; ভিতরে বিষ পোষণ করবেন, বাইরে সেটা চেপে হেসে-খেলে চলবেন, সে ক্ষমতা তাঁর ছিল না। কিন্তু জেলের আবেষ্টনে মনের সংকীর্ণতা বাড়ে। সেদিকে সর্বদা খেয়াল না রাখতে পারলে ভালো কাজেরও কদর্থ হয়। এই কদর্থ কিন্তু কোনো সময়েই প্রবোধের নিজস্ব ছিল না। কথায় কথায় ভিতরের হলাহল প্রকাশ পেয়ে গেল। এমন কি, গিরীনদা—যিনি সবার জন্যে সমানভাবে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করতে সর্বদা প্রস্তুত—তাঁর উপরেও মাঝে মাঝে মেজাজ দেখিয়ে বসতেন। এই মেজাজ বস্তুটি দু'জনেরই ছিল উগ্র।

ক্রমে ওদিককার প্রতিক্রিয়া আমাদের মধ্যেও বিষ ছড়াল। ফলে, ওঁরা যখন এক ঘরে বসে আমাদের কুষ্টি কাটতেন আমরাও তখন আর এক ঘরে বসে ঐ কাজই করতাম। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। অভিজ্ঞতাও বাড়তে লাগল। বুঝলাম, শিক্ষায়-সংস্কারে চারিত্রিক ভিত্তির ব্যবধানও দাঁড়িয়েছে অনেকখানি।

সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী ও বিপ্লবী কর্মীর চরিত্রের পরিচয়ের একটা দায়িত্ব আমাদের আছে—এই বোধ থেকে অনেক সময় অনেক রকম ব্যক্তিগত ক্ষতি সহ্য ক'রে আমরা আমাদের যৌথ মান বজায় রেখে চলতে চেষ্টা করতাম—যেমন কর্তৃপক্ষের কাছে, তেমনি জেলের সিপাহী কয়েদীদের কাছেও।

আগে বলেছি, আমাদের নীতি ছিল, সরকারের কাছ থেকে আদায় করব যত পারি, সঞ্চয় করব না কিছুই। এই নীতি মেনে এবং অনেক সময় বন্ধুদের নিষেধ না মেনে, যোগেশ মাঝে মাঝে আমার খোলা বাক্সে গোপনে নতুন জামা-কাপড় জমা দিয়ে চলে যেতেন—আমি বাক্স খুলেই টের পেতাম, এটি কার কাজ। এসব সংগ্রহের উদ্দেশ্য পূর্বে বলেছি। প্রবোধও গোপনে দু'একবার আমার কাছে জিনিসপত্র রেখে গেছেন। কিন্তু ঐ দু'একবারই মাত্র। তাঁর উপর সতীশবাবুর শাসন ছিল কড়া। টিটকারিটা চাপা রেখে জেলার পর্যন্ত একবার আমাদের গোপনে শুনিয়ে গেল, একজন তাঁর আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় অনেক জিনিসপত্র দিয়ে দিয়েছেন, এমনকি সাধারণের ব্যবহারের জিনিস পর্যন্ত। এ-খবর আমরা আগেই শুনেছিলাম—যে কয়েদী সে জিনিস অফিসে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার কাছে।

কর্তৃপক্ষের কাছে যতই আমরা চাপতে চাই, ভিতরের অবস্থা তারা জেনে ফেলে। উপেন মুখার্জি মাঝে মাঝে কিছু বই কিনত; প্রবাসী, Modern Review, Bengalee ইত্যাদি কাগজ রাখত। কাগজগুলো আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, এবং বই পেতে হলে পুলিশের অনুমতি নিতে মাসের পর মাস কেটে যেত। উপেন মুখার্জি কিন্তু আমাদের খুশি রাখবার জন্যে গোপনে এগুলি দিত। ফরিদপুর জেল থেকে পূর্ণদার সঙ্গে তার পরিচয়। তাঁর সঙ্গে 'তুমি' বলে কথা বলে, পুজোয় কাপড়ও দেয়। পূর্ণদাই প্রথম ওগুলো নিয়ে আসতেন, পরে আমি আনতাম। একদিন দু'জনেই গেছি। তখন আমাদের দলাদলির চরম অবস্থা। শরৎবাবুর 'শ্রীকান্ত' বইখানা পূর্ণদার হাতে দিয়ে উপেন মুখার্জি বলে, 'পূর্ণ, তোমরাই বইটা পড়বে, প্রতুলবাবুরা পান, আমি চাইনে। তাঁরা পড়েন না, বই নষ্ট করেন।'

পূর্ণদা নীরবে বইখানি ফেরত দিয়ে চলে আসছিলেন, উপেন মুখার্জি জিজ্ঞেস করে, 'কি হল?' পূর্ণদা ধীরে ধীরে বললেন, 'আমরা সবাই রাজবন্দী, আমরা পড়ব, ওঁরা পড়বেন না, সে হয় না।'

পরদিন উপেন মুখার্জি নিজেই বইখানা নিয়ে এসে পূর্ণদাকে দিয়ে বলে গেল, 'তোমরা সবাই পড়তে পার।'

একটা বিষয়ের সুরাহা হল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমরা হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। অল্প দিনেই এই একটা অন্ধকার নোংরা এঁদো গলির প্রান্তে ধাক্কা খেয়ে আমরা সবাই ঘুরে দাঁড়ালাম।

গিরীনদা পড়াশোনা করেছেন প্রচুর—ভারতবর্ষ, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকা ইত্যাদি প্রধান প্রধান দেশের ইতিহাস সন তারিখ সমেত প্রায় কণ্ঠস্থ। এখনও রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান (Sociology) ইত্যাদি নিয়ে পড়াশোনা করছেন, তাই নিয়েই থাকেন। দলাদলি যখন চরমে উঠেছে, সব ভুলে পড়াশোনায় ডুবে থাকতে চান, পেরে ওঠেন না, মন বসে না, ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত জোর জোর পায়চারি ক'রে ফেরেন। সিগারেট ধরালেন। সিগারেট টানতে টানতে ঘোরেন। মাঝে মাঝে হঠাৎ অকারণ ঝগড়া ক'রে বসেন—হয়তো মণিদা বা পূর্ণদা—যাঁদের বেশী ভালোবাসেন, তাঁদেরই সঙ্গে। ক্রমে মেজাজ অত্যন্ত উগ্র হয়ে ওঠে, আমরা তখন হাসি-ঠাট্টায়, অন্য কথায় ভোলাতে চেষ্টা করি।

আমরাও তখন পড়তে শুরু করলাম—যে যত সময় পারি। রাজসাহীতে সরকারী কলেজ, তার লাইব্রেরীও ভালো। সরকারের ব্যবস্থায় আমরা সেখান থেকে বই পাই। স্বনামখ্যাত শিক্ষাবিদ কুমুদিনী ব্যানার্জি তখন রাজসাহী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাতের উপায় নেই। কিন্তু অলক্ষ্যে থেকেও তিনি আমাদের পড়াশোনায় যে সাহায্য করেছিলেন, তার জন্যে ওখানকার সেকালের আমরা সবাই তাঁর কাছে চিরঋণে আবদ্ধ। এক-একটা বিষয়ের আমরা নাম লিখে পাঠাতাম। সেই সব বিষয়ের ভালো ভালো বই বেছে এক-একবারে কুড়ি-পঁচিশখানা পাঠাতেন। পড়ে ফেরত দিলে আবার পাঠাতেন। বিশেষ বিশেষ বই এক-একখানা—যা ধীরে ধীরে পড়বার জিনিস—তা সবার পড়বার জন্যে পাঁচবার সাতবার ক'রেও আসত।

এই সময়ে আমাদের কেউ কেউ দিনে চৌদ্দ-পনেরো ঘণ্টা পর্যন্ত পড়তে শুরু করলেন—বিশেষতঃ সুরেশ দাস। যে সব বই আসত, তিনি কোনো বাছবিচার করতেন না, সবই পড়তেন। *Six Systems of Hindu Philosophy* বইটা তিনি আগাগোড়া টুকে ফেললেন। Washington Irving-এর *Life of George Washington* টেনে অনুবাদ ক'রে গেলেন।

মণিদা খুব বেছে পড়তেন। কিন্তু যা পড়তেন, তা খুব মনোযোগ দিয়ে, এবং নোট রেখে। পূর্ণদা অত্যন্ত ধীরে পড়তেন, সারা বছরে দু'চারখানার বেশী নয়। অন্যবিধ কাজও তিনি করতেন—গোপনে সংবাদপত্রাদি সংগ্রহ করা, সারা জেলের কয়েদীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো বইতে কি আছে, তার সার মর্ম অপরের কাছেও জেনে নিতেন।

যোগেশ মোটামুটি সব বই-ই পড়তেন। মান-অভিমানের বালাই ছিল না। কোন্ কোন্ বই পড়া উচিত, গিরীনদাকে বা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিতেন। যা পড়তেন, একাগ্র মনে পড়তেন। সতীশবাবুও খুব পড়তে শুরু করলেন। প্রথমটা ইংরেজি বুঝতে কষ্ট হতো। কিন্তু অসাধারণ অধ্যবসায়ে *Illustrated Weekly* বা অন্য কোনো সাময়িক পত্রের প্রতিটি প্রবন্ধের প্রতিটি শব্দ ধরে পড়তে পড়তে এই বাধা অল্প দিনেই অতিক্রম করলেন। প্রবোধ আর সতীশবাবু প্রায় একসঙ্গেই পড়াশোনা করতেন। প্রতুলবাবুও পড়তেন, কিন্তু পড়ার চেয়ে দলের চিন্তাতেই আগ্রহ ছিল বেশী।

আমার জীবনে এই সময়ে একটা প্রচণ্ড ভাঙাগড়া চলছিল। তার প্রধান হেতু ছিল জীবনটাকে বোঝবার চেষ্টা করা। হাঙ্গার স্ট্রাইকের পর যেন একটা নব-জীবন লাভ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল একটা revaluation of values। বাইরে কিন্তু এর বিশেষ প্রকাশ ছিল না।

গিরীনদা সাহিত্য প্রায় পড়তে চাইতেন না। আমি সাহিত্যই পড়তে চাইতাম বেশী। আলিপুর জেলে বিশেষ ক'রে মেজদা (চন্দননগরের বসন্ত ব্যানার্জি) ও শ্রীরামপুরের জিতেন লাহিড়ীর সঙ্গে থেকে বুঝে এসেছি, কলেজে পড়ে লেখাপড়া বিশেষ কিছু শিখিনি। জেলে ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান (Sociology), দর্শন, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি পড়তে হবে, তখন সংকল্প করেছি। কলেজে পড়বার সময় ও পরে হেমেনদার সঙ্গে আলিপুরে যখন ছিলাম, তখন থেকে ডারুইন-তত্ত্ব ভালো ক'রে বোঝবার একটা আগ্রহ ছিল। বিশেষজ্ঞের জ্ঞান কোনো বিষয়ে চাইনি, দুনিয়াটাকে মোটামুটি চিনতেই চেয়েছি এবং তার সম্পর্কে নিজেকেই জানতে চেয়েছি। জেলখানায় পড়তে গিয়ে দেখলাম, একটা বিষয়ে কিছু জানতে হলে আর একটা বিষয়ে অন্ততঃ সামান্য জ্ঞান থাকা দরকার—Sociology পড়তে Anthropology কিছু না জানলে চলে না, Anthropology পড়তে Biology এবং Biology পড়তে

Physiology-র অ আ ক খ জানা দরকার। এমনি ক'রে দু'দিনের জন্তে বিভিন্ন বিষয়ের একটা পল্লবগ্রাহিতা জুটল।

রাজনীতি পড়তে গিয়ে যে সব বই পড়লাম—যথা, ব্লুণ্ট্‌শ্‌লি, লেকক্‌, সিজুইক, ডাইসি, উড্রো উইলসন—এখনকার দিনে সে সব কেউ পড়ে না। ইতিহাস, অর্থনীতির বেলাতেও তাই। দর্শন ছিল নিজের বিষয়। ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস সম্পর্কে কলেজে যেসব বইয়ের নাম শুনেছিলাম, তারই দু'একখানা পড়লাম। একদিকে ধর্মজীবনের দিকে ঝোঁক ছিল, আর একদিকে সোসিয়ালিজমের নাম সবে শুনছিলাম। তাই একদিকে পড়লাম Varieties of Religious Experience পর্যন্ত, আর একদিকে বহু চেষ্টা ক'রেও Socialism সম্পর্কে Sombardt-এর বই ছাড়া আর কোনো বই পাওয়া গেল না। নিজের প্রাণের টানে পড়তাম শেলী, ব্রাউনিং, বায়রন প্রভৃতি। এসব ছাড়া যোগেশ তো আমার সাথে পড়তেনই। পরে প্রবোধও ইংরেজী শিখতে চাইলেন এবং জিতেন চৌধুরী বলে আর একজন নতুন এলেন, তিনিও। বয়সও প্রায় একই, স্কুল-কলেজের বিদ্যাও প্রায় সমান সমান। এঁদের অ্যাডিসন, মেকলে, হাক্সলিট্ ইত্যাদি পড়াতে গিয়ে নিজের বিদ্যেয় হতো না, কখনো গিরীনদার কাছে ধার করতাম, কখনো এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ইত্যাদি নিয়ে বেশ খাটতে হতো; ওঁদের কার কতোটা লাভ হল জানিনে, আমার নিজের কাজ হচ্ছিল।

একটা প্রভাব ভিতরে ভিতরে কাজ করছিল—সেটা এই সময়ে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। ১৯১৫ সালে যখন যতীনদার (যতীন্দ্রনাথ শেঠ, A. B. Harv.) বাড়িতে ছিলাম, তখন তাঁর এবং তাঁর বন্ধু (বর্তমানে যাদবপুর এনজিনীয়ারিং কলেজের) হীরালাল রায়ের সংস্পর্শে এসে বুঝেছিলাম, মনের কপাটটা এঁটে বন্ধ ক'রে রেখে পড়াশোনা করা বৃথা। দিদিমা-জাতীয়াদের কাছ থেকে যেসব সংস্কার চেপে বসে, সেগুলো একটু পরিষ্কার না ক'রে নিলে পড়াশোনা ক'রে পণ্ডিত হওয়া যায় হয়তো, কিন্তু মনের সংস্কৃতি এগোয় না। পণ্ডিত হবার উচ্চাশা ছিল না, আর বুকনি ঝেড়ে বা বড়ো বড়ো বইয়ের নাম বলে প্রশংসা পাবার আগ্রহটাকে হাস্যকর মনে হতো। লাওয়েল আর ডড্‌ পড়ে আমাদের একজন যখন এক সরকারী কর্মচারীকে শুনিয়ে দিলেন আমরা বাইশটা দেশের শাসনতন্ত্রের খবর রাখি, তখন হাসি পেল। জীবনের উপর নানাদিক থেকে নানা প্রভাব যা এসেছে, তাতে যা-কিছু করি, যা-কিছু পড়ি সবেরই ভিতর

একান্ত মনের যে-আগ্রহটা ছিল, সেটা 'হওয়া'—'করা'-ও নয়, 'পাওয়া'-ও নয়। পাওয়ার ভিতর যে-বস্তুর প্রতি আকর্ষণ ছিল, সেটা মানুষের ভালোবাসা।

১৯১১ সাল থেকে মনের ভিতর একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা জমেছিল—রবীন্দ্রনাথ যা কিছু লিখেছেন, তা সবই পড়ব। বিপ্লবী দলে আসার পর থেকে গীতা, উপনিষদ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ—এবং আর যা যা পড়েছি, তাতে এই 'হওয়া'র দিকটাতেই মনটা ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু দেখলাম, একদিকে রবীন্দ্রনাথের লেখায় যত সাহায্য পেয়েছি, তত আর কিছুতে নয়।

ধরা পড়বার আগে বিনয় সরকার, রাধাকমল ও অজিত চক্রবর্তীর লেখা পড়তে গিয়ে বহু বিদেশী সাহিত্যিকের নাম কণ্ঠস্থ হয়ে যায়, যেমন—টলস্টয়, তুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্কি, হুইটম্যান, ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, আনাটোল ফ্রান্স, বার্নার্ড শ'। এঁদের যত বই পাই জেলে পড়ব—এ সংকল্পের সাধনায় রাজসাহীতে প্রচুর সুযোগ পেলাম। গীতা, উপনিষদ্, বিবেকানন্দ থেকে যে কথাটা জীবনে চরম ক'রে জেনেছিলাম—'নিজেকে জান'—টলস্টয় আর ইমার্সন যেন সেইটাকে একটা নতুন রূপ দিল। তুর্গেনিভের *Fathers and sons* যেন চোখের সামনে দেখিয়ে দিল আমরা কত বড় ভাঙাগড়ার সামনে। এই ভাঙাগড়ার সামনে নতুন মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার প্রয়োজন আছে। ইবসেন আর বার্নার্ড শ' চোখের ঠুলি ভেঙে খান খান ক'রে দিল। গোর্কির নাম কুমুদিনীবাবুর জন্যই প্রথম শুনলাম। *Three of Them* পড়ে মনে হল, সমাজের সামনে কাঁচা মাল হিসাবে এসে পড়ে শিশু—আর সমাজের ছাঁচে পড়ে শিব বানর হয়ে গড়ে ওঠে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজসাহী জেলের ছোট্ট মাঠখানার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত দ্রুত পায়চারি করতাম, অথবা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে উঠে পদ্মার দিকে চেয়ে বসে থাকতাম আর ভাবতাম, কি চাই—কি করব—কি হব। এতদিন যা কিছু পড়েছি, হয়েছি, মানুষের দুনিয়ার সঙ্গে তার যেন সম্পর্ক ছিল কম—আমার অতীত আর কোনো দুনিয়ায়, ভবিষ্যৎ আর কোনো দুনিয়ায়—আমি এখানে যেন বিদেশে প্রবাসে। আজ যেন সে ভুল ভাঙতে থাকল। শ্রীঅরবিন্দের 'আর্য' পড়ছি তখন—এতকাল যে অর্থে তা দেখা দেয়নি, আজ যেন সেই অর্থে ধরা দিল। এতদিনে যেন বুঝলাম—

আমি ঢালিব করুণা ধারা।
আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা।

আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।

এই মন্ত্রের অর্থ কি। সমস্ত দুনিয়াটা যেন একটা নতুন অর্থে পেলাম—সব নতুন ক'রে সজীব হয়ে উঠল।

হাতে-লেখা একখানা কাগজ চালাতে শুরু করা হয়েছিল—নাম ছিল 'ভাঙা কুলা'—তার ভিতর বাংলা, ইংরেজি দুই রকম লেখাই বের হতো। মণিদা সেটার সম্পাদক। প্রথম প্রবন্ধ লিখলাম তাতে—'মানি না'। দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখলাম 'Not peace but a Sword'। কার্লাইল পড়ছিলাম। কার্লাইলের ভাষার তোড় এসে পড়ল তাতে। 'মানি না'—এ-কথা বলতে তখন বলিনি যে, ভগবানের অস্তিত্ব মানি না; এই কথাই বললাম, তুমি যদি বিশ্বসৃষ্টির বাইরে কিছু হও, মানুষের সুখ-দুঃখের জগতে অতীত কিছু হও, তা হলে তোমায় মানি না। মানুষের সুখ-দুঃখ, স্নেহ-ভালোবাসা, দ্বন্দ্ব-কলহ সব জড়িয়ে যদি তুমি হও, তা হলে তুমি আমার, আমি তোমার। বন্ধুরা লেখাটার খুবই প্রশংসা করলেন।

আমাদের পড়াশোনার আর একটা দিক ছিল সেদিন। সে আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। আজ যা একান্ত সহজ, সাধারণ, সেদিন তা ছিল না। জাতিভেদ মানি না, স্ত্রী স্বাধীনতা চাই—এসব কথা আজ আর বাংলার শিক্ষিত সমাজে এমন কিছু বড় কথা নয়। কিন্তু সেদিন—এমন কি যাঁরা বিপ্লবী হিসেবে জেলে গেছেন, তাঁরাও এসব কথায় আঁৎকে উঠতেন। একদিকে এই। আর একদিকে ইবসেনের *Doll's House*, তুর্গেনিভের *Fathers and Sons*, মেটারলিঙ্কের *Mona Vanna*, 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশের চরিত্র। আমাদের জীবনে এবং পরস্পরের মধ্যে শুরু হল তুমুল দ্বন্দ্ব।

জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটা সক্রিয় অভিযান আমার জীবনে শুরু হয়েছিল চার বছর আগে দৌলতপুর কলেজে। আমার উৎসাহদাতা ছিলেন প্রথমটা ডাঃ যুগল আঢ্য, পরে ডাঃ অমূল্য উকিল। শশীদার, অধ্যাপক মণি শেঠের ও অধ্যাপক শরৎ ঘোষেরও সমর্থন পেতাম গোঁড়ামির সেই সুরক্ষিত দুর্গে। সহপাঠী ফণি মুখার্জির খাওয়া নষ্ট করতাম রোজই স্নানের পর রান্না ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কোঁচার খুঁট গায়ে দেবার অছিলায়। তাঁর গুরুভাই প্রিন্সিপালের বকুনি খেলাম, কিন্তু ফণিকেও মেস ছাড়তে হল। মোটের উপর, আমরা জেলে যাবার আগেই দৌলৎপুর কলেজে গোঁড়ামির ভিত নড়ে গিয়েছিল অনেকখানি।

জেলে গিয়ে দেখলাম, গিরীনদার জাতিভেদের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। ব্রাহ্মণ পাচক ছাড়া অন্য কেউ রাঁধতে পারত না। জেলের আইন-কানুন ও গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত জাতিভেদের মর্যাদা বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। বন্ধুদের সমাজেও গিরীনদা স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতেন। আমাদের ভালোবাসতেন না, তা নয়, কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ি না করার গভীর তাৎপর্যে আস্থাবান। গিরীনদা সহজেই ক্ষেপে যেতেন, এবং আমরাও এ নিয়ে তাঁকে একটু আধটু উপহাস করতাম। আমি রাজসাহী জেলে যাওয়ার অল্প দিন পরে কিন্তু হঠাৎ একদিন গিরীনদা বলে বসলেন, 'ভূপেনকে সাথে নিয়ে খেতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই! ও-তো ব্রাহ্মণ!' এই বলে সত্যি সত্যি তিনি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে সাথে খেতে বসালেন। খেতে খেতে কিন্তু বললেন, এই প্রথম তিনি জীবনে ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর জাতের স্পর্শে খাচ্ছেন!

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই থামল না। পূর্ণদা মাংসের ভক্ত—বিশেষতঃ মুরগীর। আমাদের সেলগুলোর পেছনে ছিল একটা পাঁউরুটির কারখানা। আমাদের রান্নাঘরে তো মুরগী ঢোকবার তখন উপায় নেই। পূর্ণদা মুরগী আনলেন এবং ঐ পাঁউরুটির কারখানায় মুসলমান পাচক তা রান্না করল। আমরা খেলাম। গিরীনদা 'ছ্যা ছ্যা' করলেন। মণিদার ও সুরেশবাবুর মুরগী খেতে আপত্তি নেই, কিন্তু অহিন্দু পাচকের রান্নায় আপত্তি। মণিদার ভাব কতকটা গোরার মতো—আমাদের অগণিত লোকের ভক্তিকে আমি ভক্তি করি। আর গতানুগতিকের বিরুদ্ধে কোনোরকম প্রশ্ন সুরেশবাবুর মনে তখন পর্যন্ত জাগেনি।

কিন্তু খাওয়াদাওয়া ছাড়া চিন্তার দ্বন্দ্বটা উগ্রতর—বিশেষতঃ নারী পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে। আমার মোটামুটি মত: গণ্ডির বাঁধন বেঁধে বিকৃতি আমরা কিছু কমাতে পারিনি, হয়তো বাড়িয়েছি। অবাধ মিলনে বরং সে বিকৃতির হাত থেকে আমরা কিছুটা রেহাই পেতে পারি। সব রকম স্বাধীনতারই যেমন গোড়াতে একটু বাড়াবাড়ি দেখা দেয়—এদিকেও তা হতে পারে। কিন্তু স্থায়ী মঙ্গল স্বাধীনতার মধ্যে। গিরীনদা প্রভৃতি কয়েকজন এই মতের ঘোর বিরুদ্ধে। তাঁরা সনাতনপন্থী।

ধরা পড়বার আগে ও পরে আমেরিকা প্রত্যাগত বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম, সেখানকার ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে হরদয়াল ও বাসুদেব ভট্টাচার্য অ্যানার্কিস্ট হয়ে যান এবং Free Love-এর সমর্থক। একদিন এই গল্প করতে গিরীনদা আমাকেও Free Love-এর সমর্থক বলে ঘোষণা ক'রে দিলেন।

এক-একখানা বই যা পড়ি, তা নিয়ে সুতীব্র আলোচনা হয়। রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতির বই নিয়েও আলোচনা হয়—বোঝবার জন্য। কাজেই সেখানে ভাষা ও কণ্ঠ একটা সীমা মেনে চলে। মতামতের প্রশ্ন যখন ওঠে তখন আর ওসব সীমার বালাই থাকে না। এটা প্রায়ই ওঠে সাহিত্য পর্যায়ের বই নিয়ে। যে সব বই নিয়ে আমাদের ভিতরে সবচেয়ে উগ্র আলোচনা হয়েছে, তার ভিতর এখন এই কয়খানার নাম আজও বেশী ক'রে মনে পড়ছে: রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে', সরযূবালা দাশগুপ্তার 'দেবোত্তর বিশ্বনাট্য'; গোর্কির *Three of them*; ইবসেনের *Doll's House*; বার্নার্ড শ'র '*Mrs Warren's Profession*; তুর্গেনিভের *Fathers and Sons*; মেটারলিঙ্কের *Blue Bird*;—এবং Mona Vanna ও পদ্মিনীর আদর্শের বৈপরীত্য নিয়েও তর্ক হয়। আমার উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে Ibsen-এর *Brand*; বইখানার একটা গদ্য অনুবাদ পেয়েছিলাম। পদ্য অনুবাদ পরে পড়েছি, তত ভালো লাগেনি।

আলোচনার সময় আমার ভিতরে মতলব থাকত—নিজের মতামতটা নিজের কাছে স্পষ্ট ক'রে তোলা। একটা সুবিধা ছিল। সন্ধ্যাবেলা খেতে বসে গিরীনদাকে একটা খোঁচা দিতাম। আর শুরু হয়ে যেত আলোচনা। এক-একদিন সমস্ত রাত্তির ধরে আলোচনা চলত। রাত দেড়টা-দু'টো আন্দাজ যদি কেউ ঘুমিয়ে পড়ত, তখন কমিটি মিটিং-এর মতো এখানে দু'জন ওখানে তিনজন ক'রে বসে যেতেন। পরদিন সকালে তর্ক চলত। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসার সময় হলে সব আবার পৃথক হয়ে যেতেন। তারপর আবার তর্ক শুরু হতো স্নানের সময় চিৎকার ক'রে ক'রে; খাওয়া-দাওয়ার সময়ও বাদ যেত না। তর্ক থামত খাওয়া-দাওয়ার পরে একদল তাস বা পাশা নিয়ে বসবার পর। কোনো কোনো দিন রাত্তির বেলায় নয়জনে মিলে তর্কের ঝোঁকে এমন কাণ্ড ক'রে বসতাম যে জেলখানার সমস্ত সিপাই জমাদার নীচে এসে জমে যেত—ভাবতো বুঝি বাবুরা ঝগড়া মারামারি লাগিয়ে দিয়েছে।

এই তর্কের উগ্রতার ভিতর কিন্তু বাইরের রাজনীতির দলের বিবাদ একটু চাপা পড়ে রইল। দলাদলির একটি দিক আছে। ওর সংকীর্ণতায় একবার পেয়ে বসলে নিজেদের ভিতরও তার প্রতিক্রিয়া থেকে অনেক সময় বাঁচা যায় না। অল্প দিনের ভিতরই দেখা গেল, ওঁদের চারজনের ভিতর প্রতুলবাবু আর যোগেশ একদিকে, সতীশবাবু আর প্রবোধ অপর দিকে। প্রায় বাক্যালাপ বন্ধ ন

এখন মতামতের গণ্ডির বৃত্ত আর দলের গণ্ডির বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ ক'রে গেল। মতামতের বিবাদের মধ্যে গিরীনদা আর আমি দাঁড়িয়ে গেলাম দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের নেতা। আমার কথা: প্রাচীনকাল থেকে মেনে এসেছি বলেই কোনো কিছুকে মেনে যেতে হবে—এর কোনো মানে নেই। এতে মানুষ এবং সমাজ দুই-ই পঙ্গু হয়। প্রতিটি জিনিসকেই যুক্তি দিয়ে বিচার ক'রে দেখতে মনকে অভ্যস্ত করতে হবে, এবং যুগের পক্ষে উপযোগী হলেই তাকে গ্রহণ করা চলবে, নইলে তাকে সবলে বর্জন করতে হবে। গিরীনদার কথা: যে-যুগ থেকে কোনো জিনিস মেনে আসা হয়েছে, সে-যুগেও ভবিষ্যদ্দর্শী বিচক্ষণ লোক ছিলেন, এবং তাঁদের বিচার-বুদ্ধির সারবত্তার ফলে শত আঘাতেও আমাদের সমাজ বেঁচে রয়েছে। কাজেই এখন সেসব হঠাৎ বর্জন করার ফলে সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেবে, তাতে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার যুদ্ধ ব্যাহত হবে। আমি বলি, পঙ্গু মানুষ দিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধ চলে না। গিরীনদা বলেন, আগে দেশকে স্বাধীন ক'রে তারপর সমাজ সংস্কারের কাজে হাত দিলেই চলবে।

ব্যক্তিগতভাবে গিরীনদার আমার প্রতি স্নেহ গভীর। আমি সেটা বুঝি এবং তাঁকে ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা ক'রে চলি—যদিও তর্কের ভাষা আমাদের কারুরই উগ্রতায় কম যায় না। সুরেশবাবু স্বল্পতর যুক্তিতে, উগ্রতর ভাষায় এবং উচ্চতম কণ্ঠে গিরীনদার সমর্থক। ব্যক্তিগতভাবে তিনিও আমার প্রতি স্নেহপ্রবণ। মণিদার আমার প্রতি মমতা যত গভীর, আমার মতামতে তত বেশী আঘাত পান, আর তত নীরবে গভীরভাবে চিন্তা করেন। পূর্ণদা বিচারক। তিনি দুই পক্ষের কথা শুনে শেষে রায় দেন। মণিদার অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁকে পূর্ণদার কাছাকাছি এনে ফেলে—যদিও রায়ের বেলায় পূর্ণদার রায় আসে প্রায়ই কতকটা আমার দিকে, আর মণিদার রায় গিরীনদার দিকে। আমি বুঝি, অন্তরের গভীরে মণিদা প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। খালাসের কয়েক বৎসর পরে—বোধহয় ১৯২৩ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর—রাত্রে মণিদা আমায় তাঁর ওখানে নিয়ে গেলেন। বললেন, জেলখানায় তোমার কথাগুলো আমার shocking লাগত, কিন্তু ওতে পরে আমার চিন্তায় সাহায্য করেছে।

অপর দিকে, তর্কের ভিতর যোগেশ প্রত্যেকটি সমস্যা বুঝতে চাইতেন, তিনি ছিলেন আমার নীরব, কিন্তু গভীর সমর্থক। প্রতুলবাবু ছিলেন সবল, কিন্তু কৌশলী সমর্থক। বোলশেভিক বিপ্লব তখন চলছে, সতীশবাবু তার খুঁটিনাটি

সংবাদ পড়তেন এবং উৎসাহিত হয়ে উঠতেন। সে-হিসাবে তাঁর সমর্থন আমি আশা করতাম, কিন্তু সমর্থন করা বোধহয় সব সময় সুবিধার মনে করতেন না। প্রবোধের নিজস্ব সমর্থন যে আমার দিকে, তা আমি বুঝতাম, কিন্তু মতামত গঠন এবং প্রকাশ—উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর উপর পার্টি-ডিসিপ্লিন যেন প্রবল হয়ে উঠত। বেচারীর অবস্থা দেখে আমার কষ্ট হতো। নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে—শেষ পর্যন্ত প্রবোধকে একা পড়ে যেতে হয়। সেই অবস্থায় দলের গণ্ডি উল্লঙ্ঘন না ক'রে আমি যতটা পারি মিশতাম।

প্রথমবারের মুক্তি

ইতিমধ্যে ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাস এসে পড়ল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর Armistice হয়ে গেল। খালাসের উদ্যোগপর্বে রাজসাহী থেকে কেউ কেউ স্থানান্তরিত হতে লাগলেন—এঁদের ভিতর গিরীনদা, প্রতুলবাবু, পূর্ণদা, মণিদা, সুরেশ দাস একে একে চলে গেলেন। আবার নতুন আসতে লাগলেন বসন্তবাবু (মেজদা), হেমেনদা, ভূপতি মজুমদার, জিতেন চৌধুরী (নোয়াখালী—লামচর)। এঁদের কারও কারও সঙ্গে পুরাতনরা কেউ কেউ কয়েক মাস ক'রে রয়েও গেলেন। এঁদের মধ্যে মেজদা ছিলেন মধ্যপন্থী। আর হেমেনদা যেমন ছিলেন যুক্তিপন্থীদের মধ্যে উগ্রতম, ভূপতিদা তেমনি ছিলেন প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে প্রচণ্ডতম। কাঠে কাঠে ঘর্ষণে মাঝে মাঝে আগুন ধরে যেত।

কিন্তু হেমেনদা এসেছিলেন দার্জিলিং জেল থেকে হাঁপানিতে ভীষণ কষ্ট পেয়ে। সে-কষ্ট তাঁর এখানেও গেল না। এক এক রাত্রে দু'বার তিনবার ক'রে আড্রেনেলিন আর মর্ফিয়া ইনজেকশন নিতে হতো। তা সত্ত্বেও বসে রাত কাটাতে হতো। ১৯১৭ সালে আলিপুর জেলে সেই যে বিরাট পুরুষকে দেখেছি, এ যেন তাঁর ধ্বংসাবশেষ। ব্যাধি ছাড়া অন্য নির্যাতনও সয়েছেন। পুরাতন সেই আনন্দ এখনও এক-একবার উঁকি-ঝুঁকি মেরে যায়। রাত্রে শ্বাসকষ্টে এক-একবার এমন অবস্থা হয়, মনে হয়, এখনই বুঝি দম বন্ধ হয়ে যাবে। আমি কাছে এসে দাঁড়াই। কিছু করবার নেই, শুধু দাঁড়িয়েই থাকি। উনি হাত দিয়ে ঠেলে দেন। আমি একটু ঘুরে আবার এসে দাঁড়াই। উনি ইঙ্গিতে বলেন, ঘুমোন গিয়ে। আমি ধীরে ধীরে বলি, ঘুমোতে যে পারিনে। উনি একটু ম্লান হাসি হাসেন।

জেলখানার সর্বব্যাপী একঘেয়েমির একটি গুণ এই যে ওর অধিবাসীর অন্তরের গভীরে অনুক্ষণ ওর সংগীতের মতো বাজে গীতার শ্রীকৃষ্ণের কথা:

"ন ত্বেবাহং জাতু নাসং……ন চৈব……" অর্থাৎ আমি ছিলাম না এমন কোনো কাল নেই। সেই আবহাওয়ায় যুগযুগের রাজবন্দীদের অন্তরের সীমাহীন দ্বন্দ্বসংঘর্ষের ইতিহাস বহন করে সেলের অজরামরবৎ দেওয়ালগুলি। প্রথম জেলে ঢুকেছিলাম প্রেসিডেন্সি জেলের ইউরোপিআন ইয়ার্ডে। সেখানকার ৩নং সেলের ভিতরের দেওয়ালে নিচের দিকে এক জায়গায় লেখা দেখলাম :

জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন

আবার তা থেকে কয়েক ইঞ্চিমাত্র দূরে পড়লাম সেই হাতের লেখা—

মা, আর যে পারি না!

নিজের অভিজ্ঞতার দিকেও চেয়ে দেখলাম—হাঙ্গার স্ট্রাইকের আড়াই মাস, তার পর আরও আড়াই মাস একলা কাটিয়েছি বিলাসপুরে। এমন তীব্র ক'রে অবিশ্যি কিছু অনুভব করিনি যাতে De Profundis-এর কবিত্ব আসে অথবা যাতে ক'রে দেওয়ালে লিখতে হয়, আর যে পারি না! তারপর নরেশদা, জ্যোতিষবাবু, রসিক সরকার—এঁদের জেল-জীবনের কথা সব শুনলাম, সমস্ত চিত্র দেখলাম। মনে হল, এঁদের অভিজ্ঞতা ক্রূরতর ও দীর্ঘতর।

আমার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ কিন্তু একটা ভিন্ন পথ নিল। তার রূপটি আমার চোখে স্পষ্ট ক'রে ফুটে উঠল রাজসাহী জেলে আমার ১৬নং সেলের দেওয়ালের একটি লেখাতে। কোনো ফরাসী-জানা রাজবন্দী সেখানে লিখেছেন : Ah mon Dieu, qui est une meilleure vie? হে মোর ভগবান, উন্নততর জীবন কি? অতীত রাজনৈতিক জীবনের শিক্ষাদীক্ষার দিকে চেয়ে এক কথায় জবাব পেলাম—নিবেদিত জীবন।

এক শ্রদ্ধেয় সহকর্মী বলেছিলেন, কাজটি আমি করেছি, জিনিসটি আমার—এই উত্তম পুরুষগুলোকে জীবনে বাদ দিয়ে চলবে। নিজেকে না ছাড়তে পারলে কিছুই ছাড়া হল না। এর সঙ্গে '*Brand*'-এর কথাটা এসে যুক্ত হল : All or nothing—হয় সবই দেব, নয় তো কিছুই দিয়ে কাজ নেই। কিন্তু এই তো সব নয়। প্রতি মুহূর্তের জীবনের দিকে চেয়ে বলি—কত কি যে ধূলি উড়ে এসে পড়ে, উড়ে যায়—তার তো অন্ত নেই! 'ছ'জনায় মিলে পথ দেখায়।'

মাঠে ঘুরি—নিজেকে নিয়ে দ্বন্দ্ব করতে করতে গতিবেগ খর হয়ে ওঠে। রাতের নিভৃত অন্ধকারে চোখ মেলে বসে নিজেকেই মারি। এক-একটি দিনের

শেষে তৃপ্তিতে মন ভরে আসে : নিজের পড়াশোনা ছাড়া আদর্শের চিন্তা, পথের চিন্তাতেই দিনটি কেটেছে, অসঙ্গতি ততটুকুই মাত্র এসেছে সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে যতটুকুর প্রয়োজন।

যদি কোনোদিন তোমার আসনে
আর কাহাকেও বসাই যতনে,··· ··

ভাবি, এ কি একটা অপরাধ ? কেন ? দেশকে স্বাধীন করার ব্রত নিয়েছি, দেশকে, স্বাধীনতাকে যদি তোমার আসনে বসাই যতনে, সে কি একটা অপরাধ ? এরা কি তোমায় ছাড়া ? আজকের এই জেলখানার জীবনে নিজেকে ভবিষ্যতের লক্ষ্যে তৈরি করবার জন্যে পড়াশোনা করছি—সে কি একটা অপরাধ ? নিবেদিত-জীবনে যে সব বন্ধুর সঙ্গ পেয়েছি, তাদের সঙ্গের সুখ সেই সুখের স্মৃতি,—এ উপভোগ কি একটা অপরাধ ? চোখ বুজে কোনো সাকার বা নিরাকার দেবতার ধ্যান—এই কি একমাত্র নিরপরাধ কাজ ?

যোগসূত্রে পতঞ্জলিও বলেছেন, 'যথাভিমতধ্যানাদ্বা'—চিত্তচাঞ্চল্য নিরোধ যদি যোগের উদ্দেশ্য হয়, তা হলে যা ভালো লাগে তার ধ্যানেও সে উদ্দেশ্য সাধন চলতে পারে। যৌবনের ধর্মে শুধু ভাবি, আমার ধ্যানের আসনে যাকেই বসাই, 'শূন্যমনের বৃথা উপহার' যেন কাউকেউ না দিই, কোনো মুহূর্তেই না দিই। মনের উপর এমনি নজর রাখতে চেষ্টা করি।

এ আমার অন্তরতম প্রদেশের দ্বন্দ্ব। এছাড়া বাইরের জগতের সঙ্গে ব্যবহারেরও দ্বন্দ্ব আছে। সেদিকে বাইবেলের দু'টি কথার টলস্টয়ের ব্যাখ্যা মনের উপর গভীর দাগ কাটে : (১) কাউকে বিচার করবে না এবং (২) যেমন ব্যবহার অপরের কাছ থেকে আশা কর, অপরের প্রতিও তেমনি ব্যবহার করবে। শুধু তাই নয়, দু'টো কথাকে মিলিয়ে একটা নিত্য দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়—অপরের যে আচরণের দরুন, যে মনোভাবের দরুন নিজে ব্যথা পাই, নিজের ভিতর ক্ষোভ আসে, বিরক্তি আসে, অপরের কঠোর সমালোচনা করি, নিন্দা করি, নিজের দিকে অমনি নজর পড়ে, তেমনি আচরণের, মনোভাবের অঙ্কুর, আভাস নিজের ভিতরেও আছে কি না। প্রতি কথায় কাজে যেন নিজেকে সংকুচিত মনে হয়। অথচ নিজেকে নির্ভুল মনে ক'রে চলা আর সঙ্গে সঙ্গে সব ভুল-ভ্রান্তি অপরের ঘাড়ে চাপানো—মনে হয় যেন একটা অশিক্ষিত মনের ধর্ম।

এছাড়া আছে, ভবিষ্যতের রাজনীতির চিন্তার দ্বন্দ্ব। ধরা পড়বার পর থেকে কতবার কত রাজকর্মচারী বলে দিয়েছেন, ৩নং রেগুলেশনে যাদের ধরেছে

তাদের আর কস্মিনকালে ছাড়া হবে না। এসব শোনবার পরও আমাদের গিরীনদা বলতেন, ছাড়বে না বই কি? অমনি ছাড়বে? মাথায় সুপুরি রেখে খড়ম পেটা করব, খালাস আদায় ক'রে বাইরে যাব।

এসব কথা সত্ত্বেও প্রথমে মনে হতো না যে শীঘ্র ছাড়বে। একটা সুদূর দিনে কি রাজনীতি করব, তার একটা অসাড় চিন্তায় মনের উপর তেমন কোনো ছবি ভেসে উঠত না, শুধু গতানুগতিকেরই চর্বিতচর্বণ ক'রে যে রাজনৈতিক কাজের চিন্তা করতাম, সে ঐ গোপন পন্থায় অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে যুদ্ধের আয়োজন। এই চিন্তার ধারায় পরিবর্তন এনে দিল ক্রমে ১৯১৮ সালের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির নীতি ঘোষণা, মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার নিয়ে আন্দোলন, রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন, গান্ধীজির ভারতীয় রাজনীতিতে অবতরণ, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি। কিন্তু সে সব কথা পরে বলছি। ইতিমধ্যে জেল-জীবনের দু'একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে নিই।

পুজো এসে পড়ল। বেখেয়ালী গিরীনদার জেল-জীবনের একঘেয়েমি ভাঙবার নানারকম খেয়াল ছিল। দরখাস্ত করা হল গবর্নমেণ্টের কাছে, আমরা যখন বিনাবিচারে বন্দী, আমাদের বাইরের জীবনের উৎসব আনন্দে, বিশেষতঃ ধর্মোৎসবে বাধা দেবার অধিকার সরকারের নেই। বাঙালীর জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্মোৎসব দুর্গা পুজা। তা করতে দিতে হবে।

আগেই বলেছি, উপেন মুখার্জি কি প্রকৃতির জেলার ছিল। সে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দিয়ে লেখাল, জেলের অফিসাররাও পুজো করবে, সেই সঙ্গে গবর্নমেণ্ট যদি রাজবন্দীদের বাবদ একশ' দেড়শ' টাকার বরাদ্দ ক'রে দেয়, পুজোয় তাঁদের জন্যও সংকল্প করতে বাধা নেই। গবর্নমেণ্ট অর্থাৎ ষ্টিফেনসন কিছু টাকার বরাদ্দ ক'রে লিখে দিল, উপযুক্তমতো নিরাপত্তার ব্যবস্থা ক'রে জেলের কর্মচারীদের সঙ্গে একত্রে রাজবন্দীদের পুজো করার ব্যবস্থায় গবর্নমেণ্টের আপত্তি নেই।

পুজোয় বিশ্বাস আমাদের আছে কারও কারও, আমার তখন আর নেই, কিন্তু উৎসব করব না কেন, আর সে-উৎসব যখন বন্দী-জীবনের চিরন্তন বিধি-নিষেধকে উল্লঙ্ঘন করতে চলেছে?

জেলের গেটের ঠিক বাইরে পুজোর মণ্ডপ হল। আমরা যে সেখানে জেলার এবং জমাদার-সিপাইদের পাহারায় শুধু অঞ্জলি দিতেই যাই, তা নয়। প্রায়

যখন-তখন বললেই গেটের সিপাই দরজা খুলে দেয়। গেটের বাইরে অবিশ্যি একজন জমাদার আর এদিক-ওদিকে দু'চারজন সিপাই নজর রাখে। পুজোর দিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সকালবেলা অল্প সময়ের জন্য জেলে আসে। তারপর জেলারের সঙ্গে ব্যবস্থায় আমরা বাইরে গিয়ে বসি। শহরের নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা আসেন, আমরাই তাঁদের অভ্যর্থনা করি। এ যে জেলের পক্ষে কত বড় কাণ্ড, তা জেলে যাঁরা না গেছেন, বিশেষতঃ স্টেট প্রিজনার হয়ে না গেছেন, তাঁরা আন্দাজ করতে পারবেন না।

জেলার শাক্ত। পট্টাম্বর অঙ্গে, শুধু পায়ে আমাদের জন্য 'মায়ের প্রসাদ' নিজে বয়ে নিয়ে আসে। চক্ষু দুটি তখন তার রক্ত বর্ণ, ভাষা অসংলগ্ন। সে সময় আমাদের জন্য না করতে পারে এমন কাজ নেই। সেই অবস্থাগ্রস্ত জেলারের সঙ্গে গিরীনদা ব্যবস্থা ক'রে ফেললেন, আর অষ্টমীর দিন জেলের বারশ' কয়েদীকে আমরা লুচিমেঠাই খাওয়ালাম। কয়েদীদের খাওয়ানোটা আমাদের রাজসাহীতে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিকই ছিল, সেকথা আগে বলেছি। একসঙ্গে সবাইকে খাওয়াবার সুযোগ এই প্রথম।

কিন্তু চূড়ান্ত হল নবমীর দিন রাত্রে। সেদিন বায়স্কোপের ব্যবস্থা হয়েছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেলার, সিভিল সার্জনও সেদিন মফঃস্বলে গেছে। বিশেষতঃ স্টেট প্রিজনারদের সম্পর্কে দায়িত্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের, তাঁর অনুপস্থিতিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের। এদিকে জেলার ঠিক করেছে রাতের বেলা আমাদের ঘর খুলে বের ক'রে নিয়ে অফিসের একটা ঘরে বসিয়ে বায়স্কোপ দেখাবে। সে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে পুজোর আরতি দেখতে নেমন্তন্ন করেছে। ওদিকে নিজে টং হয়ে রয়েছে।

উপরওয়ালাদের খুশি করার সেই সনাতন পন্থা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ক্যাসেল পুজা-মণ্ডপের বাইরে উঁকি-ঝুঁকি মেরে পুজোর আয়োজনের সব কিছু দেখছে। উপেন মুখার্জি বলে, You can go in, sir. এদিকে কিন্তু ব্রাহ্মণ ছাড়া, কায়স্থ, বৈদ্য যে সব কর্মচারী ছিল তাদের এবং তাদের বাড়ির মেয়েদের পর্যন্ত মণ্ডপের ভিতরে ঢুকে পুজোর আয়োজন করতে দেয়নি। পীড়াপীড়িতে ক্যাসেল ঢুকতে গিয়ে যখন জুতোর ফিতে খুলছে, উপেন মুখুজ্যে তখন বলছে, You are my father, sir, you can go in with your shoes on, sir.

ক্যাসেল অবস্থাটা বুঝল। সে জুতো খুলে রেখেই ভিতরে ঢুকল।

এর পর যখন উপেন মুখার্জি আমাদের খুলে এনে বায়স্কোপ দেখাবার অনুমতি চাইল, ক্যাসেল দায়িত্ব নিতে সাফ অস্বীকার ক'রে বসল।

বায়স্কোপ রাত ৮টায় হবার কথা। ১০টা অবধি স্থগিত রইল। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ফিরে এসে যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জিজ্ঞেস করল, সে বলল, জেলারকে এমন অপ্রকৃতিস্থ দেখলাম যে আমি ভরসা পাইনি। তুমি যখন এসেছ, তুমি ব্যবস্থা করলে আমার আপত্তি নেই।

আরও কৌতুককর একটা উৎসবের কাহিনী বলি। সে ভূপতিদার একমাত্র পুত্র মিনুর সঙ্গে যোগেশের একমাত্র কন্যা ধলির বিবাহ উৎসব। সদব্রাহ্মণ মেজদা এতখানি সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী যে তিনি এই অসবর্ণ বিবাহে পৌরোহিত্য করতে রাজী হলেন। পাত্র হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার বৈদ্য, আর পাত্রী বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ-বংশীয়া। জেলের দর্জিখানায় তৈরি বিচিত্র সাজে সজ্জিত বর আর কনে ফুলসাজে সাজানো দুই ডুলিতে চার কয়েদীর কাঁধে চেপেছে। আর চার কয়েদীর গলায় ঝুলানো চার কানিস্তারা। শালপ্রাংশু হেমেনদা বিবাহের শোভাযাত্রার অগ্রগামী, আমরা সব পেছনে। কানিস্তারার আওয়াজে যে যেখানে পেরেছে কয়েদী সিপাইরাও জমে নাতিদীর্ঘ শোভাযাত্রা বিপুল গভীর মধুর (!) মন্দ্রে জেলের বুক কাঁপিয়ে আর অফিসে চমক লাগিয়ে চলেছে। কিন্তু মুশকিল হল বর আর কনেকে নিয়ে। যেমন পোশাকে-পত্রে, তেমনি বাদ্যসমারোহে তাদের অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে যে এক-একজনে আর তাদের স্বস্থানে চেপে রাখতে পারছে না, ম্যাঁও ম্যাঁও ডেকে আঁচড়ে কামড়ে যেমন ক'রে পারে লাফিয়ে পড়বার জন্যে প্রাণপণ করছে। যাই হোক, বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল এবং সন্ধ্যায় বন্ধ হবার আগে পাড়ার কয়েদীদের প্রতি ইতর জনের মতো ব্যবহার করা হল।

আর একটি ঘটনা অন্য ধরনের। রাজসাহী জেলের বিভিন্ন ইয়ার্ডে সাত-আটজন রাজনৈতিক কয়েদী ছিলেন। আমরা গোপনে এঁদের খোঁজখবর রাখতাম, এবং প্রয়োজনমতো খাদ্য এবং অন্য জিনিসপত্র দিতাম। কানাঘুষো একটা খবর শুনলাম, এঁদের ভিতর একজন পালাবার চেষ্টায় বাইরে কাউকে চিঠি লিখেছিলেন, সেটা ধরা পড়েছে। হঠাৎ দেখা গেল, এঁদের অনেককে যাঁর যাঁর ইয়ার্ড থেকে সরিয়ে ফেলা হল, এবং এঁরা যে সব 'বিশেষ সুযোগ' পেতেন, তা বন্ধ ক'রে দেওয়া হল। বিশেষ সুযোগের মধ্যে তো বোধহয় পেতেন একটু পরিষ্কার ধরনের ভাত আর তরকারি। জাঙ্গিয়ার বদলে একটু লম্বা পায়জামা।

আর পরিশ্রম এঁরা করতেন নামমাত্র। তাছাড়া, এঁদের ভিতর তিন-চারজন একসঙ্গে থাকতেন, তাঁদের নিয়ে 'জালডিগ্রী'তে আলাদা আলাদা বন্ধ করতে শুরু করল। 'জালডিগ্রি' মানে একটা মানুষ যতটা লম্বা, তার চেয়ে ফুটখানেক লম্বা, এবং মোট গজখানেক চওড়া এক-একটা জায়গাকে লোহার শিক এবং তার দিয়ে এক একটা খাঁচার মতো ক'রে তৈরী আস্তানা—তার ভিতর পাশাপাশি চল্লিশ-পঞ্চাশজনকে রাত্তির বেলায় বন্ধ করে। এদের অধিকাংশই সাধারণ দাগী কয়েদী। তাদের সঙ্গে পাশাপাশি বন্ধ হওয়াটা রাজনৈতিক বন্দীদের পক্ষে বিশেষ আপত্তিজনক।

এঁরা আমাদের খবর পাঠিয়ে অনশন করতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা খবর পেলাম লম্বা পায়জামা ছাড়াতে গিয়ে জমাদার এঁদের কারও কারও প্রতি অপমানসূচক ভাষাও ব্যবহার করেছে। শুনে আমরা জেলারকে ডেকে পাঠালাম। জেলার বুঝল, আমরা সব জেনেছি। সে এল না।

আমরা তখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে লিখে পাঠালাম, রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে আমরাও অনশন শুরু করেছি।

জেলার বুঝল, ব্যাপারটা সুবিধার দাঁড়াচ্ছে না। যে রাজনৈতিক বন্দীটির পলায়ন-চেষ্টা নিয়ে এই সব ঘটছে, পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগে তাঁকে গোপনে অন্য জেলে সরিয়ে দিল। পরদিন অন্যান্য বন্দীদের যাঁর যাঁর জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে এল এবং কাপড় ইত্যাদি যেমন ছিল তেমনই সব দিয়ে দিল। কিন্তু হয়তো আমাদের জব্দ করার মতলবে আমাদের কোনো খবর জানাল না।

আমরা খবর পেয়েছি। কিন্তু হাঙ্গার স্ট্রাইকের নোটিশ দিয়ে হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছি, যতক্ষণ ওদের কাছ থেকে খবর না আসছে, আমরা তো ততক্ষণ খেতে পারিনে। এই ভাবেই দিনটি কাটল।

পরদিন সকালবেলা উপেন মুখার্জি এসে গিরীনদার ঘরে ঢুকল। গিরীনদা ধমকে উঠতেই ও-তো গিরীনদার হাত জড়িয়ে ধরল। গিরীনদা অমনি নরম হয়ে গেলেন। আমি চীৎকার ক'রে গাল পাড়তে পাড়তে গিরীনদার ঘরে ঢুকেই ঐ অবস্থাটা দেখে থেমে গেলাম। এর পর যোগেশ দরজায় পৌঁছে গাল দিতে শুরু করেছেন। গিরীনদা বললেন, যোগেশ, উনি ক্ষমা চেয়েছেন। যোগেশ থেমে গেলেন! কিন্তু ভূপতিদা ততক্ষণে এসে পৌঁছে গেলেন। গিরীনদা আর কয়-জনকে সামলান? ভূপতিদা বলতে শুরু করেছেন, গিরীনদা, আপনি ঐ ছোট

লোকটার সাথে কথা বলছেন ? He should be first kicked at, then talked to.

গিরীনদা বলছেন, থাম, ভূপতি।

উপেন মুখুজ্যে মৃদু হেসে বলে, ছেলেমানুষ, একটু বকতে দিন, গিরীনবাবু।

ভূপতিদা বাইরে থেকে ফেটে পড়লেন : No, I am not a child. I'm 28, and I have seen much of the world, much more than you have.

এর পর প্রবোধ, সতীশবাবু সবাই পৌঁছে পাইকারী হারে গালাগালি চালালেন। গিরীনদা তখন বেরিয়ে এসে সবাইকে শান্ত ক'রে উপেন মুখার্জিকে বিদায় করলেন।

আর একটি ঘটনা। ১৯২০ সালের গোড়ার দিক। গিরীনদারা তখন চলে গেছেন। ঝগড়াঝাটির আর দরখাস্ত লেখার পালা তখন আমার। ইতিমধ্যে নতুন নতুন স্টেট প্রিজনার সব অন্যান্য জেল থেকে এসেছেন। তার ভিতর অন্তরীণ আইন ভেঙে জলপাইগুড়ি জেলে মেয়াদ খেটে নতুন স্টেট প্রিজনার হয়ে এলেন ক্ষেত্র সেন (চট্টগ্রাম), আলিপুর থেকে এলেন চারু, মেদিনীপুর থেকে শরৎ গুহ (ফরিদপুর), ঢাকা থেকে কুন্তল ও নরেন ব্যানার্জি (ফরিদপুর) এবং হাজারিবাগ থেকে মনোরঞ্জন গুপ্ত ও রবি সেন। মোট আমাদের সংখ্যা দাঁড়ালো বারো। কিন্তু সে কথা পরে।

ক্যাসেল চলে গেছে, নতুন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছে দার্জিলিং জলপাই-গুড়ির চা বাগান অঞ্চলের কোনো মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট। নাম স্টর্ক, চেহারায়ও তাই। ক্যাসেল মাসিক পরিদর্শনে আসত—কখনো আমরা আগে 'গুডমর্নিং' বলতাম, কখনো সে-ও বলত। আমি তখন ১৬নং ছেড়ে ৭নং সেলে এসেছি, অর্থাৎ আমার সেলটাই ইয়ার্ডের মধ্যে প্রথম। আমি সেল থেকে বেরিয়ে বললাম, 'Good morning'। দেখলাম, কারও সম্ভাষণের জবাব না দিয়ে সোজা ইয়ার্ডের মাঝামাঝি একটা সেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ততক্ষণে সবাই এসে জমেছে। ও একটা ফাইল বের ক'রে বলে, 'চিঠি সেন্সর করা নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে আমি কয়খানা দরখাস্ত পেয়েছি। তার ভিতর এই একখানায় ভাষা রয়েছে 'indiscriminate interdiction of letters' আর 'unconscionable delay'—এটা কার দরখাস্ত ?'

যোগেশ বলেন, 'আমার।'

'কে এর মুশাবিদা ক'রে দিয়েছে ?'

যোগেশ বলেন, 'তা দিয়ে তোমার কাজ কি ? আমার সই রয়েছে, আমার দরখাস্ত।'

স্টর্ক বলে, 'পুলিশের বিরুদ্ধে এই রকম ভাষা যদি ব্যবহার কর, তোমাদের দরখাস্ত বিবেচনা তো করাই হবে না, পড়াও হবে না।'

আমি গুরুগম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করি, 'এমন কোনো আইন আছে ?'

আইনের কথা শুনেই সে পেছন ফিরে রওনা হল। তখন যত রকমের বচন আমাদের যার মুখে এল ঢিল ছোঁড়ার মতো ক'রে পেছন থেকে ছুঁড়ে মারা হল। ও আর ফিরে দাঁড়িয়ে জবাব দিল না।

বচন শুধু মৌখিকই হল না—পাতা-তিনেক তখনই লিখে ভারত সরকারের বরাবর পাঠানো হল। বিকেলে জেলার এসে অনুরোধ জানায়, দরখাস্তখানা ফেরত নিন।

আমি বলি, ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখুক।

এর পর থেকে পাঁচ মাসে পর্যন্ত আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দর্শন নেই। অথচ আইনে বলে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার ক'রে স্টেট প্রিজনারদের দেখতে আসবে।

স্টর্ক বদলী হয়ে গেল। তার জায়গায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এল পরবর্তী-যুগের স্বনামখ্যাত সিভিলিয়ান রীড সাহেব। আবার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পরিদর্শন শুরু হল।

অপর একটি ঘটনা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে নিয়ে। অ্যাশ সাহেব তখন বদলী হয়ে গেছে। তার জায়গায় এল মেজর গয়েল। পাঞ্জাবী। পরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও বাংলা সরকারের সার্জন জেনারেল হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, বউ হয়ে যে যত মার খায়, শাশুড়ী হয়ে সে তত মারে। এই লোকটি তার একটি দৃষ্টান্ত স্থল। উচ্চতর পদের কর্মচারীদের কাছে ধমক খেলে যতখানি কেঁচো হয়ে থাকত, নিজের অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রতি তত অন্যায় জুলুম করত। রাজসাহীতে এসেই কয়েদীদের প্রতি শাসন কড়া ক'রে তুলল। জেলে জেলার বংশের সঙ্গে ডাক্তারদের ঝগড়া চিরন্তন। গয়েল নিজে ডাক্তার হয়েও জেলারের কথায় ডাক্তারের সঙ্গে অকারণ বকাবকা করত।

রাজসাহীতে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমরা কি পরিমাণ পেতাম,

আগে বলেছি। গয়েল এসে কিছুদিন বাদে জেলারকে দিয়ে বলে পাঠাল, নতুন কাপড়জামা পেতে হলে পুরনো কাপড়জামা ফেরত দিতে হবে।

আমি বলি, দেব না।

জেলার পুনরায় এসে বলে, একটা পাত্র রেখে দেওয়া হবে, ছেঁড়া জামা-জুতো তার ভেতর ফেলবেন।

আমি বলি, যেখানে খুশি ফেলব।

আর কোনো উচ্চবাচ্য শোনা গেল না।

আমরা ওখানে যারা দু'বছর আড়াই বছর যাবৎ আছি, তাদের এক-একজনের দুটো তিনটে ক'রে কাঁঠাল কাঠের বাক্স হয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর জন্যে জেলে তৈরী চৌকিদারী ইউনিফর্মের কাপড়ের একটা একটা ক'রে ঘেরাটোপ হয়েছে। এখন নতুন যাঁরা এলেন, তাঁদের মধ্যে একজন কেউ এক সঙ্গে তিনটি ঘেরাটোপের অর্ডার দিয়েছেন।

একটা খাতায় প্রতিদিন আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসের ফর্দ যেত, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সই ক'রে দিলে জিনিসগুলো আমাদের কিনে বা তৈরি ক'রে দেওয়া হতো। গয়েল তো তিনটি ঘেরাটোপের অর্ডার এক সঙ্গে দেখে কেটে দিয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভারত গবর্নমেণ্টের কাছে পাঁচ পাতা দরখাস্ত—তাতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের রাজসাহী জেলে যতরকম অন্যায় জুলুমের কাহিনীও আছে।

আবার জেলারের দৌত্য। অনেক ধরাধরির পর খাতায় লিখে দিলাম, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কোনো জিনিস না দিতে পারে, কিন্তু খাতায় কিছু কাটতে পারবে না। কোনো দাবি অন্যায় বলে মনে হলে আমাদের ডেকে আলোচনা করবে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লিখে দিল, 'Agreed'। দরখাস্ত ফেরত নেওয়া হল। এর পর যে কয়মাস রাজসাহীতে ছিলাম, গয়েল সাহেবের সাথে আমাদের ভালো কাটে।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে 'brass'—বাংলায় কি বলব—'ঠ্যাটামি'? অনেক বছরের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, বিনাবিচারে বন্দী হয়ে থাকতে গেলে, ওর খানিকটা না হলে কর্তারা কাদার তলায় ঠেসে রাখতে চান—ন্যায়-যুক্তির উপরে মাথা তুলে না রাখলে, ন্যায়-যুক্তির তলায়ও ওর স্থান হয় না, কারণ বিনাবিচারে বন্দী ক'রে রাখার ব্যাপারটাই ন্যায়-যুক্তির সীমার বাইরের ব্যাপার। সেটাকে মনে মনে যে মেনে নিয়েছে, কর্তারা তাকে দিয়ে অনেক কিছুই মানিয়ে নেন।

আর সব ছোটখাটো ঘটনার উল্লেখে কাজ নেই। এখন এসে পড়ল আমাদের রাজনৈতিক চিন্তার জগতে দ্বন্দ্বের দিন।

একটা ধারণা আমাদের অনেকে পোষণ করতেন, দেশ যখন একেবারে শান্ত হবে, আমরা যদি খালাস হই, তবে তখনই হতে পারি। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, ঠিক উলটো। ধরপাকড় যখন চলেছিল, দেশ তখন ক্রমেই ঝিমিয়ে পড়ছিল। এরই যেন সীমারেখা টেনে দিল অ্যানি বেশান্তের ধরা পড়ায়। আবার মরা দেশে সাড়া জাগল। থার্মোমিটারের পারা দ্রুত উপরের দিকে উঠতে রইল। বাংলার রাজবন্দীদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ নেতা সুব্রহ্মণ্য আয়ারের 'সার' উপাধি ছাড়তে হল। মণ্টেগু মনে করেছিলেন, দো-আঁসলা ধরনের কিছু শাসন সংস্কার দিয়ে দেশকে ঠাণ্ডা ক'রে ফেলবেন। ফল উলটো ফলল। নরম-পন্থী কংগ্রেস গরম হয়ে উঠল, শাসন সংস্কার গ্রহণে আপত্তি করল।

কিন্তু আগুন জ্বলল রাওলাট আইনের প্রস্তাবে। যুগান্তর বিপ্লবীদলের নেতৃত্বে জার্মানি থেকে অস্ত্র আনিয়ে বিপ্লব-চেষ্টায় আমরা সফল হইনি। কিন্তু গান্ধীজিকে ভারতের রাজনীতিতে এক নতুন পন্থায় গণ-জাগরণ প্রচেষ্টার সুযোগ ক'রে দিতে পেরেছি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক মরণ-বাঁচন সংকটকালে আমরা তার শত্রু-শক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছি বলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন। এক আইনের খসড়া প্রণয়ন করল। এই আইন-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল। সহস্র বৎসরের ঘুমন্ত দেশের চেহারা ফিরে গেল।

এই উতলপাতলের মধ্যেই রাজনৈতিক বন্দী ও রাজবন্দীদের মুক্তি দ্রুত হতে লাগল। আজ না হয় দু'দিন বাদে খালাস হবই। কি করব তখন বাইরে গিয়ে?

চারু এলেন আলিপুর জেল থেকে। ব্যক্তিগত জীবনের সুতীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে দু'বছরের জেলের জীবনে। অন্তরের তলা অবধি কপোতাক্ষের জলের তলদেশের মতো স্পষ্ট। প্রীতি-স্নেহ কোথাও যেন কোনো সীমারেখা মানতে চায় না। এরই সঙ্গে নিজেকে গড়ে তুলবার আগ্রহ বেদনা এক মুহূর্তও অসাড় হতে জানে না। আদর্শের কাছে আত্মনিবেদন কবে কোন্ মুহূর্তে স্তিমিত হয়েছে, তারই জন্য ক্ষমাহীন আঘাতের পর আঘাতে দেখি, অমন সদা উদ্দাম, চঞ্চল, সহাস্য মূর্তিটিকে মুষড়ে তুলেছেন।

বলি, কিচ্ছু হয় নি।

যুগপৎ কান্না-হাসিতে সমতা ফুটে ওঠে। প্রশ্ন করেন, কি করব বাইরে গিয়ে?

কুন্তল এলেন ঢাকা জেল থেকে। এখানকার অবস্থা ছিল রাজসাহী জেলের

গোড়ার দিকের চেয়ে খারাপ ছাড়া ভালো নয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর গভীর অনুভূতির অপরূপ সামঞ্জস্যে গড়া এ মানুষটিও জেল জীবনে অন্তরের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ থেকে অব্যাহতি পাননি। অব্যাহতি পাননি, শুধু তাই নয়, ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। রামানন্দ স্বামীর কথার অনুকরণে বলা চলে, যে মানুষ যত গভীর, জেলের জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ তার তত বেশী। কিন্তু আপনাকে ভুলে থাকার প্রকৃতি, প্রবৃত্তি কুন্তলের মেদমজ্জায় এমন জড়িত যে নিজেকে খুলে ধরলেন আস্তে ধীরে। তার আগেই প্রশ্ন ক'রে বসলেন, কি করব বাইরে গিয়ে?

পড়াশোনা করার সুযোগ চারু অনেকখানি পেয়েছেন আগে হাজারিবাগ জেলে। ঢাকা জেলের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। কুন্তলের পড়াশোনা করার ক্ষমতা ছিল আমাদের অনেকের চাইতে বেশী। আগ্রহ দু'জনেরই সমান। রাজসাহী কলেজ থেকে বই আনিয়ে পড়তে শুরু করলেন। সারাদিন পড়াশোনা করেন। রাত্রে ঘরের এক কোণে পাটি বিছিয়ে তিনটি মাথা এক জায়গায় ক'রে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করি—রাত দু'টো বেজে যায়, তিনটে বেজে যায়।

সুক্ষমাত্র গুপ্ত সমিতির আয়োজনে আমাদের মতো যুগ-যুগের অসাড় দেশে বিপ্লব হয় না। জনসাধারণের ভিতর কাজ করা চাই। কি কাজ? কি ভাবে করব? কংগ্রেসে যোগ দেব? কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা সংস্কার ছিল। তার কারণ, আগেকার দিনে যে-কংগ্রেসকে আমরা চিনতাম, সে তো শুধু প্রস্তাব পাশ করার একটা সংঘ।

কিন্তু কংগ্রেস নতুন রূপ নিচ্ছে গান্ধীজির নেতৃত্বে। এখন শুধু প্রস্তাব পাশ করা নয়, কাজ করা, সে কাজ বিদেশী সরকারকে আঘাত হানার কাজ এবং দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা।

ইঙ্গিতটা আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হল যখন আমাদের দলের সত্যেন মিত্র প্রভৃতি মুক্তি পেয়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন।

কিন্তু আমরা তিনজন তো দলের সব নই, অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। অন্যত্র আর সবাই কি ভাবছেন কে জানে!

সমস্যার অনেকটা সমাধান হল ইতিমধ্যে যখন মনোরঞ্জনদা এসে পড়লেন হাজারিবাগ জেল থেকে। সেখানে সুরেন ঘোষ, অরুণ গুহ, সাতকড়ি ব্যানার্জি প্রভৃতি দলের প্রধান প্রধান কর্মী আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা একটা মোটামুটি সিদ্ধান্তে এসেছেন। দেখা গেল, চিন্তার ধারা তাঁদের আর আমাদের এক।

সিদ্ধান্তও একই। তবে সেখানে তাঁরা একটা চলবার পথের ইঙ্গিত দিতে পেরেছেন, এখানেও আমাদের কাছে মনোরঞ্জনদা সেটা স্পষ্ট ক'রে তুললেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনের স্তরে স্তরে আমাদের জীবন পথ খুঁজেছে। এই তার শুরু। আনন্দ পেলাম এই ভেবে যে, আমাদের যাঁরা যাঁরা বিভিন্ন স্থানে ছিলেন, তাঁরা পথের সব দ্বন্দ্বের পরে মোটামুটি একই সমাধানে পৌচেছেন।

সমস্যা তখনও রইল দু'টি: প্রথম, গান্ধীজির অহিংসা। কিন্তু এ বাধা দুরতিক্রম্য বলে কারও মনে হয়নি। কারণ জেলে চিন্তার বিকাশের যে সুযোগ জুটেছিল তাতে বুঝলাম, বিপ্লবের প্রথম ও প্রধান শক্তি জাগ্রত জনগণের স্বাধীন হবার মরিয়া আগ্রহ, অস্ত্র নয়। যে-জাতের (সেদিন পর্যন্ত) সেই আগ্রহই জাগেনি, সে অস্ত্র পেয়েই বা কি করবে? তাছাড়া, জাতকে জাগাবার কালে একথা প্রচার ক'রে বেড়ানো চলে না যে, জাগ্রত জাত অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করবে। অহিংসাকে তাই আমরা নীতি বা policy হিসাবে গ্রহণ করি, গান্ধীজির মতো ধর্ম হিসাবে নয়।

দ্বিতীয় বাধা, জেলে আমরা যারা ছিলাম, তারাই দলের সব নয়। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর যাঁরা দলের নেতৃস্থানীয় হয়ে দাঁড়ালেন—যথা, যাদুগোপাল মুখার্জি, অমরেন্দ্র চ্যাটার্জি, অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী, নলিনী কর—এঁরা তখনও পলাতক। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা না ক'রে দলের নীতি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হতে পারে না। কিন্তু এ বাধাও সাময়িক। খালাস হয়ে গেলে এঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে সিদ্ধান্ত পাকা করা শক্ত হবে না।

অনুশীলনের সঙ্গে পার্থক্য আমাদের এইবারে পাকা হয়ে দাঁড়াল। তাঁরা হয়তো গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে সমরায়োজনের উপায়ের কথা তখনও ভাবছেন। কাজেই তাঁদের কাছে অর্থের সমস্যাই প্রথম ও প্রধান সমস্যা। তাঁরা ভিন্ন পথ ধরলেন।

অপ্রীতিকর তুচ্ছ ঘটনা রাজসাহীর জেল-জীবনে অনেক ঘটেছে। কিন্তু পড়াশোনা আর আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যে সেগুলোকে আমরা উপেক্ষা ক'রে চলেছি। ইতিমধ্যে প্রতুলবাবু খালাসের আগে অন্যত্র বদলী হয়ে গেছেন। পরে মনোরঞ্জনদার সঙ্গে এলেন রবি সেন। দু'জনে একটা হৃদ্যতা হয়েছিল হাজারিবাগ জেলে। সেখানে ৬৪ দিনের হাঙ্গার স্ট্রাইকের কালে একই সেল ব্লকে ছিলেন আমাদের মনোরঞ্জনদা ও অরুণদা এবং অনুশীলনের রবিবাবু ও নরেন ভট্টাচার্য (রাজসাহী)। ওখানকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উইলসন এঁদের চারজনকে

ঠাউরেছিল হাঙ্গার স্ট্রাইকের নেতা। তাই জোর ক'রে নল চালিয়ে খাওয়াতে এসে এঁদের ঘুঁষিঘাষি মারত, এবং প্রতিদানে জোড়াপায়ের লাথিও খেয়ে যেত।

এই সবের ফলে রবিবাবু সব ব্যাপারে মনোরঞ্জনদার পরামর্শ নিতেন এবং মনোরঞ্জনদাও রবিবাবুকে না জানিয়ে কিছু করতেন না। রবিবাবুর সংস্পর্শে সতীশবাবুর ভিতর আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দিল, প্রবোধ তো দলাদলিতে কোনো সময়েই রস পেতেন না। অনুশীলনের আর একজন নতুন এসেছিলেন ঢাকা জেল থেকে—নরেন ব্যানার্জি। জেল-জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে তাঁর ভিতর এসে পড়েছিল এক সর্বব্যাপী ঔদাসীন্য। জেলের এই অর্ধসন্ন্যাসী খালাসের পর পাবনার 'সৎসঙ্গে' যোগ দিয়ে পাকা সন্ন্যাসীই হয়ে যান। পরে যোগ দেন পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে।

ব্যক্তিগত জীবনে আমরা শান্তি পেলাম এবং সে-শান্তি খালাসের দিন পর্যন্তই বজায় ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনের পার্থক্য বরং গভীর হবার আশঙ্কা দিন দিন বেড়ে চলল।

গোপনে তখন আমরা অমৃত বাজার, বেঙ্গলী প্রভৃতি সব রকম কাগজই পাই। তাতে দেখি, ওদিকে আন্দামান থেকে বারীনবাবু, পুলিনবাবু প্রভৃতি খালাস হয়ে এলেন, এদিকে জেল ও অন্তরীণ থেকে শত শত বন্ধুরাও মুক্তি পাচ্ছেন। এর ভিতর লক্ষ্য করছি, অনেকের থাকবার আশ্রয় নেই, জীবিকার উপায় নেই। তা নিয়ে আলোচনা আন্দোলনও চলছে। দেশের নেতারাও কারও কারও উপায়ের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন।

গবর্নমেণ্টের তরফ থেকেও দেখা গেল, Y. M. C. A-র ও. আর. রাহার নেতৃত্বে এবং সি. সি. চ্যাটার্জি, এস. আর. দাস প্রভৃতি গণ্যমান্য লোকের সহযোগিতায় মুক্ত রাজবন্দীদের জন্য একটা ফ্রী কিচেন জাতীয় মেস প্রতিষ্ঠিত হল বেনেপুকুরে। এই মেসের বিশিষ্ট উদ্যোগী নলিনী কিশোর গুহ।

ক্রমে দেখা গেল, আমাদের বন্ধু যাঁরা খালাস হচ্ছেন তাঁদের ভিতর প্রায় কেউই এ মেসের কাছ ঘেঁষলেন না, বরং কংগ্রেস-ঘেঁষা হয়ে দাঁড়ালেন। এই মেসে আশ্রয় পেলেন প্রায় সবই অনুশীলনের লোক, আর এই মেসের ভিত্তিতেই কয়েক মাসের ভিতর পুলিন বিহারী দাসের সঙ্গে যোগাযোগে গড়ে উঠল "ভারত সেবক সংঘ",—এর দু'খানি প্রচারপত্র পরে বের হল "হক্ কথা" ও "শঙ্খ"। নলিনীবাবু এ দু'খানার সম্পাদক। এর প্রচার কংগ্রেস ও অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে।

এগুলি অবশ্য হয় আমাদের খালাসের পরে। কিন্তু বেনেপুকুরের মেসটাকেই, এমনকি অনুশীলনের যোগেশ ও আশু কাহালি পর্যন্ত, রাজনৈতিক বন্দীদের আত্মসম্মানের দিক থেকে সুনজরে দেখতে পারেননি। পালং-এর আশুবাবু রাজসাহী জেল থেকে প্রায় সবাই খালাস হয়ে যাবার পর রাজসাহীতে আসেন। খবরের কাগজের খবর পড়তে পড়তে গভীর দুঃখে তিনি একদিন বলেন, ওরা এখানে গিয়ে ভিড় জমিয়েছে কেন? এর চেয়ে খবরের কাগজ ফিরি ক'রে খেতে পারেনি?

এদিকে খালাসের গতি দ্রুততর হতে হতে অবশিষ্ট প্রায় সব কয়জন এসে জুটেছেন রাজসাহীতে। একদিন দুপুরবেলা জেলার এসে বলে, অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী নেলসন, আর আই. বি-র ডি. আই. জি ডিকসন সাহেব এসেছেন। আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন, অফিসে চলুন।

আমরা কয়েকজন বেরিয়ে পড়ে আমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছি, বাদবাকীরা তৈরী হয়ে আসছেন। কুন্তল তখন বলেন, দেখ, এ লোক দুটোর কিন্তু একটা বাতিক আছে।

কুন্তল যে কাহিনী বললেন, তা হল এই: ঢাকা জেল থেকে কুন্তল বদলী হবার কয়েক দিন আগে এরা দু'জন সেখানে যায়। সর্বশেষ কুন্তলকে অফিসে ডাকে। সেখানে পৌঁছে দেখেন দু'জন দু'খানা চেয়ারে বসে আছে, আর কোনো চেয়ার নেই।

কুন্তল বলেন, চেয়ার কোথায়? নেলসন বলে, আমার সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলবে, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে বলতে হবে। কুন্তল টেবিলের উপর চেপে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে শুনি?

নেলসন বলে, আমি বাংলা গবর্নমেন্টের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী। কুন্তল জিজ্ঞেস করেন, তোমার সঙ্গে কথা না বললে কি হয়?

ও বলে, না বললে! তখন কুন্তল উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে বলেন, তোমার মতো অভদ্রের সঙ্গে আমি কথা বলিনে। বলে বেরিয়ে চলে আসেন।

কথাগুলো শুনতে শুনতে অফিসের দিকে একটা বটগাছের তলায় আমরা পৌঁচেছি। জেলারকে বললাম, যান, ভিতরে গিয়ে আগে চেয়ারের ব্যবস্থা করুন। জেলার বলে, সে হয়ে যাবে।

আমি বলি, হয়ে যাবে-তে কাজ নেই, আগে যান।

একটু বাদে জেলার মুখ কালো ক'রে ফিরে এসে বলে, সাহেব বললেন, দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে।

আমরা সেলে ফিরে এলাম, দু'একজন গেটের সামনাসামনি গিয়ে একটু বেয়ালের ডাকও শুনিয়ে এলেন। আবার, এই চেয়ারের প্রশ্নটাকে এত বড় ক'রে তোলাতে দু'একজন একটু অসন্তুষ্টও হলেন।

দিন তিনেক পরে খানিকটা সম্পাদকীয় মন্তব্যের সাথে খবরটা অমৃত বাজার পত্রিকায় বেরিয়ে গেল। বের করার কাজটা অবশ্য ছিল আমারই।

ষ্টিফেনসেন তখন বাংলা গবর্নমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী। কয়েকদিন বাদে খবর পেলাম, সে ঢাকা থেকে লঞ্চে ক'রে রাজসাহী আসছে। সে কিন্তু এই প্রশ্নটি তোলবারও সুযোগ দিল না। সোজা আমার ঘরের ভিতর ঢুকে আলাপ জমিয়ে তুলল। আমার ঘরে যখন ঢুকেছে, তখন আমার চেয়ারে ওকে আমিই বসালাম। রাজসাহীর বর্তমান কলা ও রাঘবসাহী সন্দেশও কিছু খেল। এবং আমাদের ভিতর যাঁর খুশি আমার খাটে বসে, যাঁর খুশি দাঁড়িয়ে আলাপ ক'রে গেলেন। সবার সাথেই দু'চার মিনিট ক'রে আলাপ করল। সবই প্রায় weather talk. ওরই ভিতর খালাসের জন্য আমাদের মন পরীক্ষা হয়ে গেল।

আমায় বলল, আপনাদের তিনজন ছাড়া আর সবাইকে তো খালাস দেওয়াই আমরা স্থির ক'রে ফেলেছি।

আমি বলি, একজন তো বুঝছি, এই গরীব বেচারি। আর দুজন কে?

ষ্টিফেনসেনের কথা ভালো বোঝা যেত না। একটা কার নাম বলল।

জিজ্ঞেস করলাম, কে?

Paresh, Amrit Sarkar, you don't know Paresh, of Anushilan?

আমি বললাম, Yes, আর একজন কে?

প্রশ্নটার জবাব এড়িয়ে ও অন্য কথা পেড়ে বসল।

ইতিমধ্যে মনোরঞ্জনদা ও রবিবাবু ঢাকা জেলে বদলী হয়ে গেছেন। তাঁদের মায়ের অসুখ—তাঁরা যথাক্রমে বরিশাল ও ময়মনসিং গেলেন। দু'জনারই মায়ের মৃত্যু হল; সঙ্গে সঙ্গে দু'জনারই বন্দী অবস্থাও ঘুচল।

চারু সেই বছরেই বি. এ পরীক্ষা দেবেন এবং শরৎ গুহ বি. এল। এই উপলক্ষে দু'জনাই ছাড়া পেলেন।

এরপর একদিন ডিকসন আবার এসে হাজির। ইতিমধ্যে ধড়ে বুদ্ধি এসে

গেছে। ইয়ার্ডের মধ্যে একা একা ঢুকে দাঁড়িয়ে আমার সাথে কথা শুরু করল। বলে, আমরা তো সব ছেড়ে দেওয়াই ঠিক ক'রে ফেলেছি। তবে বাইরে কাজকর্মের যোগাড় হচ্ছে না, এই যা অসুবিধা। বিজয় (বি. সি. চ্যাটার্জি) আমাদের খুব সাহায্য করছে, তবু পেরে উঠছি না।

আমি বলি, তা হলে কুন্তলকে আর প্রবোধকে ছাড়ছ না কেন? কুন্তলকে বিজয় নাগ (পণ্ডিচেরি আশ্রমের) তাঁর ব্যবসায়ে যোগ দিতে ডাকছেন, আর প্রবোধের জন্য তাঁর ভাই কাজ জোগাড় ক'রে রেখেছেন।

তাই নাকি? আমরা তো জানতাম না! দেখা যাক কি করতে পারি। এর পর সপ্তাহখানেকের ভিতর ওদের খালাসের হুকুম এল।

ওদের দু'জনকে অফিস থেকে বিদায় দিয়ে আমি আর সতীশবাবু হারাধনের দু'টি ছেলের মতো ফিরছি, জেলার বলে, আজকের রাতটিই মাত্র নির্জনতা ভোগ করতে হবে। কালই আবার তিনজন আসছেন।

নেই তো প্রায় কোথাও কেউ, আবার কে আসছেন?

পরদিন এলেন অধ্যাপক প্রভাস দে, আর পালং-এর আশু কাহালি ও রাইহরণ সেন।

সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে আনতে গেছি গেটে। প্রভাসবাবু সেলের দিকে আসতে আসতে হঠাৎ থেমে গিয়ে জেলারকে বলেন, ওখানে যাব না। জেলার বলে, চলুন, স্নান করুন, খান, তারপর হবে'খন।

প্রভাসবাবু বলেন, স্নান করতে কেন, মলত্যাগ করতেও ওখানে নয়।

আমি যত বলি, আমরা উপরেই থাকি, উনি যেন শুনেও শোনেন না।

প্রভাসবাবুর এই তৃতীয়বার রাজসাহী জেলে। প্রথমবারে ছয়মাস মাত্র তিনচারটি সেলের ব্যবধানে থেকেও বাল্যবন্ধু হরিশ শিকদারের সন্ধান পাননি। দ্বিতীয়বারে জেলার রায়সাহেব গুরুচরণ দত্তের উপর ক্ষেপে গিয়ে এক লাথিতে অ্যান্টিসেলের কাঠের দরজা ফাটিয়েছেন। আর এই তৃতীয়বার।

এরপর সপ্তাহ তিনেক একসঙ্গে আমরা পাঁচজন রইলাম। এমন সময় পাইকারীভাবে খালাসের পরওয়ানা এল। ১৯১৮ সালের নভেম্বরে যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খালাসের নীতি ঘোষিত হয়েছে। আর এখন ১৯২০ সালের ডিসেম্বর।

আমিই প্রথম রাজসাহী জেল ছাড়লাম। আগের দিন রাত্রে প্রভাস লাহিড়ী খবর পেয়ে দলবল নিয়ে এসে রাস্তা থেকে ডাকাডাকি ক'রে আমন্ত্রণ জানিয়ে

গেলেন। বছর চারেক আগে একদিন গৌহাটির পথে তাঁকে নলিনী ঘোষের সঙ্গে চন্দননগর থেকে ব্যাণ্ডেলে ট্রেনে চড়িয়ে দিয়েছিলাম।

পরদিন জেল থেকে বেরিয়ে প্রভাসবাবুর বাড়িতে উঠলাম। শহরটা দেখা হল। সন্ধ্যায় অনেকে মিলে নৌকায় পদ্মা বেড়ানো গেল। মুক্ত জীবনে প্রথম একটি শান্ত সন্ধ্যা, অন্তর যখন চঞ্চলতায় ভরপুর।

পরদিন কলকাতা রওনা হলাম।

দ্বিতীয়বার জেলে

২৫শে সেপ্টেম্বর। ১৯২৩ সাল।

উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠে রেখে চিকিৎসায় যত্নে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না, খরচেও কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না বলে চারুকে কয়েকদিন আগেই আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। অসুখ থাইসিস। বিখ্যাত সার্জন ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জি তখন হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট—যাদুদা তাঁর নামে একখানা চিঠি দিয়ে দিয়েছিলেন। সহজেই ভর্তি করা গেল। নিকটে এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে খাবারটা আনিয়ে দেওয়া হয়। সকালে ৮টার আগে একবার যাই, বিশেষ অনুমতি ছিল, তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিয়ে আসি।

সেদিনও তেল লাগাব বলে জামাটা ছেড়েছি, দেখি পঞ্চাননবাবু, আর তাঁর পেছনেই আর একটি লোক, একটু ঠাহর ক'রে দেখলাম আই. বি-র ইন্সপেক্টর ইসমাইল।

পঞ্চাননবাবু বললেন, দেখুন এরা কি বলছে, আপনাদের কার নামে কি পরওয়ানা আছে।

ইসমাইল এগিয়ে এসে বলে, আপনাকে সাহেব একবার নীচে ডাকছেন।

আমি বলি, কে সাহেব? তার দরকার থাকলে তাকে উপরে আসতে বলুন।

মিনিট-খানেক বাদে একটি সাহেবকে নিয়ে ফিরে এল। সে বলল, I have to take you under arrest.

আমি বলি, অপেক্ষা কর, আমি রোগীকে স্নান করিয়ে নিই।

ইসমাইল দাঁড়িয়ে রইল। সাহেবটা পঞ্চাননবাবুর সাথে নীচে চলে গেল।

চারুকে স্নান করাতে করাতে তাঁর সঙ্গে দু'চারটে কথা যা বলবার বলে নিলাম। ওঁর মনের আশঙ্কাটা স্পষ্ট করেই বললেন, এইবারে শেষ! সান্ত্বনা দিলাম, অযত্ন হয়তো হবে, কষ্ট হবে—অমুককে অমুককে খবর দিস, একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই।

মনে মনে আমিও জানি, কি হবে। দু'জনেরই ব্যথায় মন ভরে ওঠে, কিন্তু আশ্চর্য হই না কেউই।

কিছুদিন আগেই খবর শুনেছিলাম, বাংলায় কুড়িজনকে ৩নং রেগুলেশনে ধরবার জন্যে গবর্নর লর্ড লিটন ও টেগার্ট দিল্লী-সিমলা দৌড়াদৌড়ি করছে, ভারত গবর্নমেণ্ট রাজী হচ্ছে না।

খবরটা যাদুদাকে বললাম। তিনি বললেন, শাঁখারিটোলার মামলার সাক্ষী-সাবুদ যখন কোর্টে বের হতে থাকবে, তখনই তোমাদের ধরবে।

অসহযোগ আন্দোলন যখন চলছে তখন মিহির ঘোষ (নামটা একটু বদলে বলতে হল) বলে একজন পুলিশের এজেণ্ট প্রভোকেটর হিসেবে খুব গরম কথা বলে বিপ্লবী দল করছিল। ফাঁদে পা দেবার মতো নানাবিধ প্রস্তাব নিয়ে সে আমাদের অনেকের কাছেই এসেছিল। প্রেসিডেন্সি জেলের ৪৪ ডিগ্রীতে ১৯১৬-১৭ সালে তার সঙ্গে যে পুলিশের গুপ্ত যোগাযোগ ছিল, তা অনেকে জানতেন। কিন্তু জেনেশুনেও দু'তিনজন তার খপ্পর থেকে অব্যাহতি পাননি।

১৯২৩ সালে যখন স্বরাজ্য দল গড়ে উঠছে, তখন এই দল থেকে কলকাতায় ও আশপাশে কয়েকটা সামান্য ডাকাতি বা ডাকাতির চেষ্টা হয়। এর উদ্দেশ্য কি, আমরা অনেকে আন্দাজ করেছিলাম। আন্দাজেরও প্রয়োজন ছিল না। দৌলতপুরে ছাত্রজীবনে আমার এক বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন নিরন্ময় মজুমদার। প্রথমবার জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, ইনি সরকারী চাকরি করছেন। প্রাণটা এঁর এত ভালো যে এঁর অনুতাপ হতো : বন্ধুরা যখন জেল খাটছেন আমি তখন সরকারী চাকরি করছি। আমাদের ভালোবাসতেন বলেও বটে, আর এই অনুতাপের ফলে ইনি অনেক সময় সাধ্যের অতীত সাহায্যও আমাদের করতেন। ফলে, আই. বি-র সুনজরে পড়ে যান। ভূপেন চ্যাটার্জি এঁকে মাঝে মাঝে ডাকিয়ে নিয়ে নানাবিধ সদুপদেশ দিত।

প্রতিবাদে নিরন্ময় আমাদের কথা বলেন, ওরা তো এখন বিপ্লবী দলে কাজ করছেন না, করেন কংগ্রেসের কাজ। ভূপেন চ্যাটার্জি বলে, ঐটেতেই তো আমরা বেশী ভয় পাই ; কংগ্রেস, স্বরাজ্যদল—সবটায় ভিতরই এরা আছে, এইটেই আমরা চাইনে।

কাজেই মিহির ঘোষের দল যে ১৯২৩ সালে ডাকাতি শুরু করল, এবং তারই দলের শাঁখারিটোলা ডাকাতির সাক্ষীসাবুদের মারফত যখন লোকের ধারণা

জম্মাল যে দেশে বিপ্লবী কার্যকলাপ চলছে, তখন আমাদের ধরবে, এটা আমাদের কাছে খুব অপ্রত্যাশিত নয়।

ওদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগে যখন জেলে ছিলাম, তখন কাগজে পড়েছিলাম, লয়েড জর্জ আমেরিকার খোশামোদের অঙ্গ হিসাবে জর্জ ওয়াশিংটনের মর্মর মূর্তির পদপ্রান্তে ফুলের মালা দিয়েছিলেন। খবরটা পড়ে মনে হয়েছিল, জর্জ ওয়াশিংটনও তো ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন! যতীন মুখার্জিও দেশকে স্বাধীন করবার চেষ্টায় প্রাণ দিয়েছেন। তফাত, একজন সফল হয়েছেন, আর একজন চেষ্টা ক'রে ব্যর্থতার ভিতর প্রাণ দিয়েছেন। আজ ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী একজনার পায়ে ফুল দিচ্ছেন, আর আমরা যদি যতীন মুখার্জির স্মৃতিদিবস পালন করি, ওরা কি করে?

কাজটা করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ১৯২১-২২ সালের রাজনৈতিক বিক্ষিপ্ততার ভিতর কথাটা কারও কাছে পাড়াও যায়নি। ১৯২৩ সালে অনেককে বললাম। নিজেদের বন্ধুবান্ধব সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। অমরদা কথাটা দেশবন্ধুকে বললেন। দেশবন্ধু বললেন, 'নিশ্চয়! একটা জাহাজ চার্টার ক'রে আমরা সবাই মিলে বালেশ্বরে যাব এবং যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল, সেখানে একটা স্মৃতিমন্দিরের উদ্যোগ-আয়োজন ক'রে আসব।'

ইতিমধ্যে দিল্লীর বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশন এসে পড়ল, এবং স্বরাজ্য দলের প্রোগ্রাম পাশ করানো নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে কথাটা ওখানেই চাপা পড়ে গেল।

আমরা কয়েকজন কিন্তু স্থির করলাম, ওখানেই কথাটা চাপা পড়তে দেওয়া হবে না। বেশী আড়ম্বর না করতে পারি, কিন্তু সর্বত্র আমরা নিজেদের মতো ক'রে যতীন্দ্রনাথের স্মৃতিতর্পণ করব। তাছাড়া কলকাতার যতগুলো কাগজে সম্ভব ছবি সমেত যতীনদার পরিচয় ও বালেশ্বর যুদ্ধের কাহিনী ছাপাতে চেষ্টা করব।

ইতিমধ্যে নতুন ক'রে আমাদের দল গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। মনোরঞ্জনদা ও নরেশদা উত্তরবঙ্গ ঘুরতে বেরিয়েছেন। আমি পূর্ববঙ্গ ঘুরে এসে যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবে গেছি। এইবারেই ভগৎ সিং-এর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এর পরই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু। তখন তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তাঁর বাবা সর্দার কিষেণ সিং-এর সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় ছিল। আমি যেদিন যাই, সর্দারজী সেইদিনই তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে ও সপ্তদশ বর্ষের

পুত্রকে গ্রামের বাড়ি থেকে খবর দিয়ে লাহোর শীশমহল রোডের এক বাড়িতে আনান। যুবক ভগৎ সিং প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র, যতীন্দ্রনাথ ও বালেশ্বরের যুদ্ধের কাহিনী শোনেন। ৯ই সেপ্টেম্বরের আর বেশী দেরি নেই। ভগৎ সিং আমায় বলেন, যতীন্দ্রনাথের কিছু ছবি এবং বালেশ্বর সম্পর্কে লেখা যা পারি, যেন পাঠাই। কাশীতেও তখন আমাদের ভালো দল ছিল। এইভাবে ১৯২৩ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বাংলা থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত বালেশ্বর দিবস পালন করা হয়। কলকাতার প্রায় সমস্ত দেশী কাগজে যতীন্দ্রনাথের ছবি, জীবনী ও বালেশ্বরের যুদ্ধের কাহিনী প্রকাশিত হয়। অমরদা ঐ দিনেই 'স্বদেশ' বলে একখানা দৈনিক কাগজ বার করেন। তার প্রায় সব পাতা জুড়ে এই দিন ঐ সব ছবি ও কাহিনী ছাপা হয়।

এর পর কয়েক দিনের মধ্যেই 'ইংলিশম্যান' কাগজে পর পর দু'টি প্রবন্ধ বের হয়। তার মর্মকথা এই—বালেশ্বর স্মৃতি দিবস যে এইভাবে উদ্‌যাপিত হল, তার অর্থ এই যে, বিপ্লবীরা আবার দল গড়তে শুরু করল।

তার পর ধরপাকড় সম্পর্কে গুজবটা যে সত্যি হতে আর বাকী নেই, সে ধারণা আমাদের কারও কারও ছিল।

তবু যাদুদাকে বললাম, আমি তো রোগীর শুশ্রূষা করি, আমায় ধরবে না।

যাদুদা নিজেকে হয়তো বাদ দিয়েছিলেন। আমরাও কাকে ধরবে, কাকে ধরবে না, সে সম্বন্ধে কিছু ঠাহর করতে পারিনি। তাই যাঁকে যাঁকে খবর দেবার কথা চারুকে বললাম, তাঁদের ভিতর যাদুদা ও অমরদাও ছিলেন।

আর. জি কর হাসপাতাল থেকে ওদের গাড়ি ক'রে আমায় যখন লালবাজারে নিয়ে গেল সেখানে যাঁদের হাজির দেখলাম তাঁদের ভিতর যাদুদা, অমরদাও রয়েছেন। আর আছেন উপেনদা, মনোরঞ্জনদা, ভূপতিদা, জ্যোতিষ ঘোষ, মনোমোহন ভট্টাচার্য, আর অনুশীলনের রবি সেন, অমৃত সরকার ও রমেশ চৌধুরী।

ঘরে ঢোকামাত্র প্রচুর অভ্যর্থনা। অভ্যর্থনার মালমশলা—কয়েকটা ঠোঙা ভরা খাবার, আর—উপেনদা যখন রয়েছেন—প্রচুর হাসি-ঠাট্টা।

তারই ভিতর গম্ভীর হয়ে গেলেন যাদুদা, অমরদা ও মনোরঞ্জনদা। যাদুদা জিজ্ঞেস করলেন, চারুকে কেমন দেখে এলি? মনোরঞ্জনদা বললেন, তোমার ওরা প্রেসে (সরস্বতী প্রেস) আশা করেছিল। মনোমোহন বললেন, এইবারে চারুটা মরবে।

যাদুদা বললেন, চারুর নামেও বোধহয় ওয়ারেণ্ট ছিল। আমায় গাড়ি থেকে নামাবার আগেই, আমার পাশের গাড়িতে অমরদা ছিলেন, ব্যামফোর্ড তাঁকে জিজ্ঞেস করছিল, Where's Bhupen Babu?

অমরদা বললেন, He must be nursing Charu.

তখন এসে আমায় জিজ্ঞেস করে, How is Charu?

তখন বললাম, তার অবস্থা শঙ্কাজনক। ও একটু বিশদ ক'রে প্রশ্ন করল, তারপর বলল, Excuse me for a minute, please. একটু পরে একখানা গাড়ি বেরিয়ে গেল, তখন আবার আমার পাশে এসে গল্প শুরু করল। বুঝলাম, তোমায় ধরতেই গেল।

এরপর একে একে টেগার্টের কাছে ডাক পড়ল। নাম জিজ্ঞেস করার পর আমায় জিজ্ঞেস করে, Were you doing anything particular these days.

আমি বলি, If I have anything to say, I shall say before the court.

ও বলে, You won't be produced before any court, you will be incarcerated under Regulation III of 1818.

আমি বলি, Thank you.

একে একে এনে একখানি ভ্যানে তোলে। উপেনদা টেনে টেনে বলেন, 'মনোরঞ্জন, পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা…।' সকলে এক চোট হাসলাম। মনোরঞ্জনদা ও অরুণদা তখন অনিলবরণ রায়ের সঙ্গে একত্রে 'সারথি' বলে সাপ্তাহিক কাগজ বের করতেন। কাগজখানার উপরে লেখা থাকতো—

পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা
যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চির-সারথি, তব রথচক্রে
মুখরিত পথ দিন রাত্রি।

নিয়ে চলল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। পথে পথে "বন্দেমাতরম্" চিৎকার ক'রে গলা ভেঙে ফেললাম। আর উপেনদা মাঝে মাঝে খুব হাসাচ্ছেন।

জেলে ঢুকে স্নানাহার সেরে ম্যাজিস্টেরিয়াল সেলের সামনের মাঠটায় গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছি, আর ধরপাকড় কেন, আর কাকে কাকে ধরবে, ইত্যাদি গবেষণা করছি, এমন সময় জীবনে যতগুলো ভুল করেছি, তার একটি তালিকা

ক'রে বসলাম। যাদুদাকে আলাদা ক'রে ডেকে বললাম, এইবার জেলে এমন-ভাবে চলতে হবে যাতে ওদের (অনুশীলনের) সঙ্গে ভবিষ্যতে মেশা যায়। প্রতুলবাবু নেই, রবিবাবু ও অমৃত সরকার আছেন, অনেকটা সহজ হবে, কিন্তু রমেশবাবু আছেন। জেলে মিলমিশের শর্তাশর্তির কথা কিছু নেই, ভালো ব্যবহার।

অনুশীলনের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর এত তফাত যে মিলমিশ ওঁদের সঙ্গে আমাদের হতে পারে না, বরং সে-চেষ্টায় অনিষ্ট হবে, একথা বুঝেও তখনও বুঝিনি, বারবারই অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পেয়ে বসেছে, আর মিলমিশের কথা বলেছি। আমার কথাতেই যে মিলমিশের পরবর্তী চেষ্টা হয়েছিল, তা কিছু নয়, কারণ সে চেষ্টা যখন হয় তখন আমি বর্মার জেলে। কিন্তু গোড়াতে ঐ যে একটু উৎসাহ দেখিয়েছিলাম, তার জন্য আজও অনুতাপ হয়।

এই উৎসাহটুকু দেখাবার একটু কারণ ছিল। ধরা পড়ার কিছুদিন আগে থেকে প্রতুলবাবু ও রমেশবাবু আমার কাছে যাওয়া-আসা করছিলেন। তখন এঁরা 'ভারত সেবক সংঘ' করার দরুন বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে অপাংক্তেয়। প্রতুলবাবু একদিন আমায় বলেন, ও যা করতে গিয়েছিলাম, দেশের ভালো হবে বলেই তো করতে গিয়েছিলাম!

এরপর আমি চেষ্টা করি, এবং তার ফলে কয়েকদিন ওঁদের কয়েকজন ও আমাদের কয়েকজনে মিলে আলোচনা হয়। তারপর তো ধরাই পড়ি। কিন্তু দেশের ভালো হবে বলে ওঁরা এই সময়ে মিলতে এসেছিলেন—একথাটা যে কতো অসার, সেটা বুঝি ১৯২৮ সালে খালাসের পর। এসেছিলেন তখন স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হচ্ছে বলে।

অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে অনুশীলনের ওঁরা যখন Citizen Protection League-এর* নীতি মেনে ও সাহায্য নিয়ে 'ভারত সেবক সংঘ' গড়ে কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন, আমাদের বন্ধুবান্ধবদের ভিতর অনেকেই তখন নিজেদের পরিচিত কর্মী ও অসহযোগী ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক ও আইন ব্যবসায়ীদের টানে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কংগ্রেসের কাজ শুরু করেন। তার ভিতর সুরেন ঘোষ ময়মনসিংহে, মনোরঞ্জন গুপ্ত, সতীন সেন, অশ্বিনী গাঙ্গুলী বরিশালে, জীবন চ্যাটার্জি ও জিতেন কুশারী ঢাকায়, পূর্ণ দাস ফরিদপুরে, সূর্য সেন চট্টগ্রামে, বসন্ত মজুমদার ও ললিত বর্মন ত্রিপুরায়, ক্ষিতীশ চৌধুরী

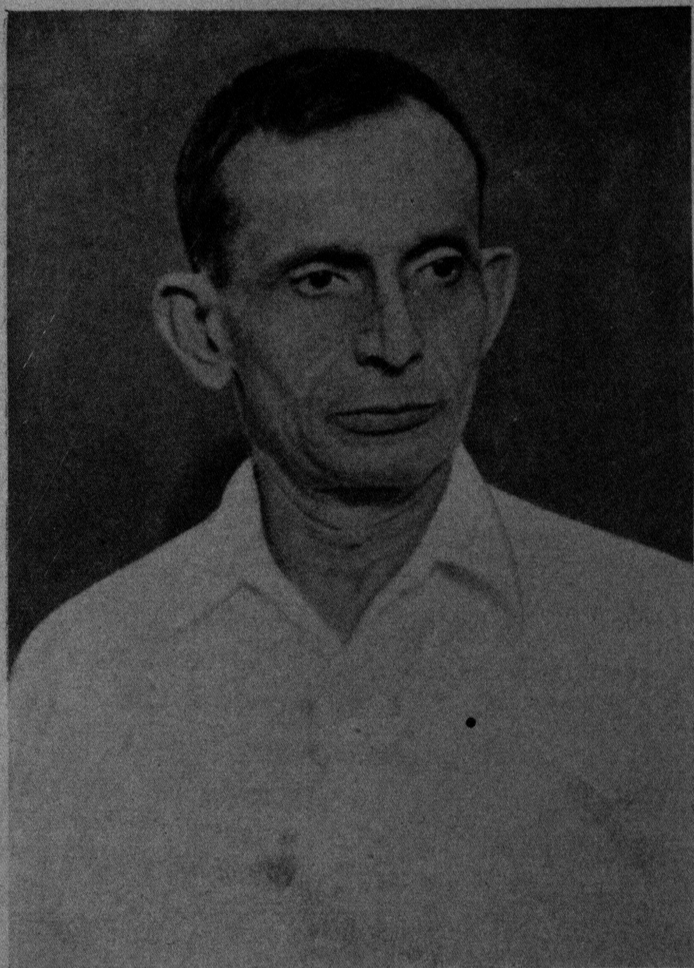
* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

নোয়াখালিতে, যতীন রায় উত্তর বঙ্গে, কালিপদ বাগচী রংপুরে, বিজয় রায়চৌধুরী গাইবাঁধায়, ক্ষিতীশ সরকার সিরাজগঞ্জে, ডাঃ আশুতোষ দাস ও ভূপতি মজুমদার হুগলীতে, জিতেন মিত্র বর্ধমানে, হরিকুমার চক্রবর্তী ২৪ পরগনায় ও বিজয় রায় যশোরে বসেন এবং আমি খুলনায় বসি। হাওড়ার হরেন ঘোষ পরে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। বীরভূমের জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জির সঙ্গে পুরানো গুপ্ত সমিতির দিনে প্রথমে অরুণদার এবং পরে কুন্তলের যোগাযোগ ছিল। ইদানীং বাঁকুড়ার অনিলবরণ রায় সরস্বতী প্রেসে মনোরঞ্জনদা ও অরুণদার সঙ্গে থাকতেন। ফলে জেলার কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

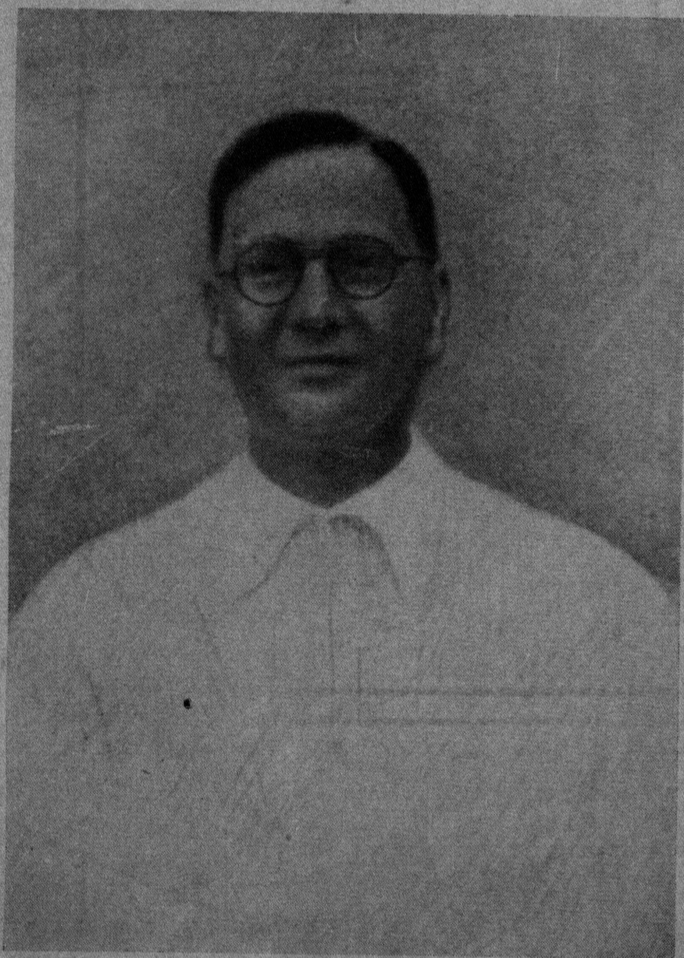
বিপিন গাঙ্গুলী ও জ্যোতিষ ঘোষ আমাদের থেকে একটু পার্থক্য অনেক সময়েই বজায় রাখছিলেন, কিন্তু পূর্বে বিপ্লবী দলে এবং এখনও কংগ্রেসে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা ছিল। সেই হিসাবে বিপিনদা একদিকে যেমন ২৪-পরগনার কংগ্রেসের সঙ্গে, অপর দিকেও তেমনি যতীনদা (মুখার্জি) ও অমরদার সঙ্গে সম্পর্কিত নদীয়ার বিপ্লবী দলের বসন্ত বিশ্বাস, মন্মথ বিশ্বাস, জ্ঞান বিশ্বাসদের অনুগামী অনন্তহরি মিত্র ও তারকদাস ব্যানার্জির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। এঁরা ওখানে তখন কংগ্রেসের কাজ করছেন। আর, জ্যোতিষবাবুকে আমি অমৃতসরে ডাঃ কিচলুর আশ্রমে বসিয়ে সর্দার কিষেণ সিংদের দলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসি, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন ভূপতিদা আবার তাঁকে ডেকে নিয়ে হুগলী কংগ্রেসে বসান।

এছাড়া বরিশালে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রতিষ্ঠিত শংকর মঠ যুদ্ধের সময় থেকেই ছিল। অসহযোগের সময় আমি কুন্তল, চারু ও কিরণ মুখার্জিকে নিয়ে দৌলতপুরে সত্যাশ্রম করি। সাতকড়ি ব্যানার্জি ও রসিকলাল দাস করেন আবদালপুর (ডায়মণ্ডহারবার) সত্যাশ্রম, জিতেন কুশারী বাহেরক (বিক্রমপুর) সত্যাশ্রম, যতীনদা (রায়) বগুড়া গণমঙ্গল, অমরদা উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠ, ভূপতিদা হুগলী বিদ্যামন্দির, সূর্য সেন চট্টগ্রাম সাম্যাশ্রম। এসব প্রতিষ্ঠান স্থায়ী প্রচার ও গঠন-কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়।

এই সবের ফলে বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে কংগ্রেসের সংগঠন যা গড়ে উঠেছিল, তা প্রধানতঃ আমাদের যুগান্তরের বন্ধুবান্ধবদের হাতেই গড়ে উঠছিল। এদিকে কলকাতায় সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, অরুণ গুহ, সুরেশ দাস প্রভৃতি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন।



জীবন চ্যাটার্জি



যাদুগোপাল মুখার্জি

অপরদিকে কাউন্সিলে যাবার প্রোগ্রাম নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যেই মতবিরোধ দেখা দেয়। অনেক বন্ধুর সঙ্গে সেই থেকেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের গোড়াতেই দেশবন্ধু একটি আদর্শ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। আমাদের উপস্থিতিতে একদিন তিনি প্রশ্ন করেন, কাকে এর ভার দেওয়া যায়? আমার পাশেই বসেছিলেন সুভাষের ঘনিষ্ঠতম বাল্যবন্ধু কৃষ্ণনগরের হেমন্ত সরকার। আর ছিলেন আমাদের তিনজনেরই বন্ধু অরবিন্দ মুখার্জি। হেমন্তকে বলি, সুভাষকে খবর দিলে কেমন হয়? হেমন্ত তখনই প্রস্তাব করেন। দেশবন্ধু সুভাষের সবিশেষ পরিচয় নেন। রাত্রে এ নিয়ে বাসন্তী দেবীর সঙ্গেও কথা হয়। এর পরই দেশবন্ধু সুভাষকে খবর দেন। সুভাষ তখন আই. সি. এস পাশ ক'রে কেম্ব্রিজ ট্রাইপোজের জন্য চেষ্টা করছে।

বঙ্গীয় সর্ববিদ্যায়তন আর বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠবার সুযোগ পেল না। জেলে যাবার হিড়িকে সব ভেসে গেল। সবাই জেল থেকে ফিরে আসার পর স্বরাজ্যদল গড়ার মাতামাতি লেগে গেল। স্বরাজ্যদল গঠনে সুভাষ ছিল দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্ত।

যাদুদা এর আগেই পলাতক জীবন থেকে ফিরে এসেছেন এবং ডাক্তারী পাশ ক'রে কলকাতাতেই আছেন। সুভাষ একদিন তাঁর কাছে গিয়ে হাজির কাউন্সিল প্রবেশের পক্ষপাতী এবং কাউন্সিল প্রবেশের বিরোধী জেলাগুলির হিসাব নিয়ে। যাদুদাকে তিনি দেখালেন ময়মনসিংহ থেকে মধুবাবু (সুরেন ঘোষ), বরিশাল থেকে মনোরঞ্জনবাবু ও হুগলী থেকে ভূপতিবাবু যদি মত দেন, তা হলেই কাউন্সিল প্রবেশের পক্ষপাতীরা জয়লাভ করেন।

আমাদের ভিতর জীবন চ্যাটার্জি ছিলেন এদিকে সবচেয়ে উৎসাহী, তারপর সত্যেনদা, কুন্তল, চারু, অরুণদা, যাদুদা ও আমি। মনোরঞ্জনদা ছিলেন সবচেয়ে বিরোধী। যাদুদা মধুদা ও ভূপতিদাকে ডেকে আলোচনা করেন; তাঁরা নিজের নিজের জেলার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে মত দিলেন। মনোরঞ্জনদার কিন্তু মত পরিবর্তন হয় ১৯২৩ সালে জেলে যাবার পর।

ইতিমধ্যে ময়মনসিংহ ও হুগলী জেলার সমর্থন পেয়েই দেশবন্ধুর দিকে সংখ্যাধিক্য হয়ে গেল। স্বরাজ্যপার্টির প্রোগ্রামকে এই সমর্থন দিয়েও কিন্তু আমরা স্থির করেছিলাম, আমরা অধিকাংশ কর্মীরা কাউন্সিল অ্যাসেমব্লিতে

যাব না—সুভাষ, সত্যেনদা প্রভৃতি বন্ধুরা যেতে চাইলে তাঁদের সমর্থন করব।

যাই হোক, স্বরাজ্যদল গঠনের ভার কিন্তু প্রায় সবটাই পড়ল আমাদের উপর এবং সেটাই স্বাভাবিক। প্রতুলবাবুদের এই সময় আমাদের সঙ্গে মিলন কামনাও তেমনি স্বাভাবিক।

'ভারত সেবক সংঘের' কংগ্রেস-বিরোধিতার ফলে তখনকার দিনের সদ্যোজাত 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এঁদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চালাতে থাকে। তার ফলে এঁরা বুঝতে পারেন যে, আমাদের সঙ্গে অন্ততঃ সাময়িক মিল না হলে বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে আর। এঁরা দাঁড়াতে পারবেন না।

তাঁদের এই মনোভাব যখন থেকে বুঝতে পারি, তখন থেকেই ঐ দিনের ঐ সামান্য একটি কথার অনুশোচনা আজও মনে রয়ে গেছে। কারণ, ঐ মিলন চেষ্টার—শুদ্ধমাত্র চেষ্টারই—ফল বাংলার পক্ষে ভালো হয়নি।

সদ্য ধরা পড়ার উত্তেজনা নানা কথায়, হাসিতে, আমোদে চাপা দেবার চেষ্টা চলছে, এমন সময় অফিসে ডাক পড়ল আমাদের পাঁচজনের—যাদুদা, জ্যোতিষ-বাবু, রবিবাবু, অমৃত সরকার ও আমি। জেলখানার জীবনের এই ছিল এক চূড়ান্ত ট্রাজেডি। হাসি-কান্নার ভিতর দিয়ে যা হোক একটা সংসার গড়ে ওঠে, যার ভিতর মায়া-মমতার সম্পর্ক কোনো পরিবারের ভিতর যা থাকে তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। অথচ বদলীর টান যখন পড়ে, তখন একটা দীর্ঘশ্বাস চাপবারও অবকাশ মেলে না।

ট্যাক্সি যখন হাওড়ার পুলে উঠছে, যাদুদাকে ইঙ্গিতে দেখালাম, গোপীনাথ সাহা কলকাতার দিকে আসছেন। এই শেষবার গোপীকে দেখলাম।

মেদিনীপুর জেল। রাত্তির বেলায় ভাত, ডাল যা জোটাতে পারল খাইয়ে-দাইয়ে বিশ ডিগ্রীতে বন্ধ ক'রে যখন জেলার, জমাদার চলে গেল, তখন নতুন নতুন মশারি টাঙ্গাতে গিয়ে দেখি, তার সবই আছে, শুধু চাল নেই। পাঁচ জনেরই ঐ একই অবস্থা। এক রাত্রির জন্যে সেই ১৯১৮ সালের রাজসাহী জেলের অভিনয়—সারা রাত গরমে আর মশার কামড়ে এ-সেল থেকে ও-সেলে পরস্পরকে ডাকাডাকি আর চেঁচামেচি ক'রে কাটানো গেল।

পরদিন সকালে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এল—ইয়ং সাহেব আই. এম. ডি—মোগল বাদশাই ধাঁজ-ধরন! সব শুনে জেলারকে ডেকে বললেন, হরপ্রসাদ, এঁদের কি এখানে রাখা চলে? আর কোথায় ভালো জায়গা আছে বল।

জেলার হরপ্রসাদ মিত্র পুরানো জেলার, তার ইচ্ছা আমাদের ওখানেই রাখে। ইয়ং একটা ওআর্ডের নাম বলতে ও বলে, সেখানে আমার প্রায় ৪০ জন কয়েদী থাকে, তাদের শোবার সব ঢিপি বাঁধা রয়েছে, তা ছাড়া ওঁরা কি সে জায়গা পছন্দ করবেন ?

বাধা পেয়ে বাদশাই মেজাজ আরও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে : ৪০ জন কয়েদীর জায়গা করতে আমাদের আটকাবে না। মাটির ঢিবি ভেঙে ফেললেই গেল। আর, I know they will like the place, that place is infinitely better than this.

আমরা কোনো গতিকে সেল-ছাড়া হতে চাই। আর জায়গাটা সত্যি সত্যিই ভালো। সেই দিনই আমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। সেই থেকে জায়গাটার নাম হয়ে গেছে স্টেট ইয়ার্ড।

আমরা এগারোজন যেদিন কলকাতায় ধরা পড়ি, সেই দিনই ঢাকায় ধরা পড়েন সতীশ পাকড়াশী। আর দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিয়ে বোম্বে হয়ে কলকাতায় ফিরে ধরা পড়লেন জীবন চ্যাটার্জি। এঁরা দু'জনও কয়েক দিনের মধ্যে মেদিনীপুর জেলে এলেন। ক্রমে অন্যত্র থেকে বদলী হয়ে মনোরঞ্জনদা, ভূপতিদা, মনমোহন ভট্টাচার্য, রমেশ চৌধুরী। এঁরা সবাই এসে মেদিনীপুরে জমলেন।

ইতিমধ্যে আমাদের প্রতি কি রকম ব্যবহার করা হবে, তার আইন বিধিবদ্ধ ক'রে পাঠাল তখনকার দিনের ইন্স্পেক্টার জেনারেল অফ প্রিজন্স্, কর্নেল টমসন। লোকটি ছিল যেমন ভারতীয়-বিদ্বেষী, তেমন অসৎ। হুকুম হল, আমাদের খাওয়া দেবে কয়েদী-খানা এবং পোশাকও কয়েদীর পোশাক।

ইয়ং সাহেব অবাক হল। খবরটা আমাদের কাছে গোপন ক'রে আই. জি-র কাছে প্রতিবাদ পাঠাল, সেক্রেটারিয়েটে তার এক বন্ধুর কাছেও চিঠি দিল। আই. জি-কে জানাল, বিনা বিচারের বন্দীদের এরকম খাওয়া-পরা দেওয়া সঙ্গত হবে না। তাছাড়া ৩নং রেগুলেশনের ৬ ধারায় বলে যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাজ-বন্দীদের স্বাস্থ্যের জন্য দায়ী। হুকুম অনুযায়ী খাদ্য দিলে, বিশেষতঃ চা, সিগারেট যারা খেতে অভ্যস্ত, তাদের তা বন্ধ করলে, স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ইয়ং সাহেব এসে হাজির। আমরা তখন মুখ-হাত ধুচ্ছি, রাত্রের মতো বন্ধ হব। বললে, দেখুন আমি যা করবার তা করেছি, আমার

conscience এখন clear. আমায় বলেছে, Carry out Government orders. কাল থেকে আমায় তাই করতে হবে।

রাত্রে নিজেদের মধ্যে গভীর আলোচনা হল। ভোরে ঘর খুলে দেওয়ামাত্র রোজকার মতো বাইরে বেরিয়ে বেড়াচ্ছি। এক বালতি লপ্‌সি এনে দরজায় রেখে গেল—কয়েদীর খানার ভোরের সংস্করণ।

সিপাই দাঁড়িয়ে ছিল. বালতিটাকে একটা লাথি মেরে কাত ক'রে ফেললাম। অন্য অনেক দিনই আমার ভাগের লুচি-হালুয়া কয়েদীদের দিয়ে ওদের লপ্‌সি আমি খাই। শুধু যে খেতে ভালো লাগে তাই নয়, হাজার হাজার কয়েদী রোজ যা খায়, তা খেয়ে একটা তৃপ্তিও পাই। জীবন, অমৃতবাবু প্রভৃতিও প্রায়ই আমার সঙ্গী হন। আজ কিন্তু দেখামাত্রই লাথি মেরে ফেলে দিলাম।

ঘরে এসে বলতে ভূপতিদা চটে উঠলেন, বললেন, খাবে না তো খাবে না, ফেলে দেবার কি প্রয়োজন ছিল?

বুঝলাম, বয়সের সুবুদ্ধি বিপ্লবীর আত্মসম্মানবোধের ঘাড়ে চেপে বসতে শুরু করল।

একটু বাদে জেলারও এসে ঠিক ঐ ভাষায় ঐ প্রশ্নটিই করল। বললাম, ফেলেছি বেশ করেছি, যান, যা পারেন করুন গিয়ে।

সে গিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে বলে কিন্তু উলটো কথা শুনল: ফেলবেই তো! তুমিই বা ঐ লপ্‌সি পাঠাতে গেছ কেন? ভোরের খাবার আমাদের লপ্‌সিই দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তাছাড়া কয়েদীর রান্নাঘর থেকেই বা ওঁদের খাবার রান্না হয়ে যাবে কেন? গুদামে ডাল আটা আছে, গুড় আছে। তাই আমরা ওঁদের পাঠিয়ে দিতে পারি, ওখানে কাজ করবার কয়েদী আছে, তারা রুটি ক'রে দেবে। প্রয়োজনমতো medical ground-এ আমি কাউকে কাউকে চা-ও দিতে পারি।

এরপর জেলারকে নিয়ে আমাদের ঘরে এসে পরিষ্কার চাল, ডাল, বাগান থেকে টাটকা তরিতরকারি ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থা ক'রে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে গেল, গবর্নমেণ্টের কাছে একটি ফর্দ তৈরি করে পাঠিয়েছে, যদি সেটাতে গবর্নমেণ্ট সম্মতি জানায়, তা হলে দৈনিক এক টাকা এক আনার ভেতর আমাদের মোটামুটি ভালো খাবার ব্যবস্থা হবে।

এদিকে আমাদের কয়েদী আহার চলল। গিরীনদার নামে সেইদিনই একটা টেলিগ্রাম গেল, Given convict diet. Make outside arrangements.

গিরীনদা টেলিগ্রাম পেয়ে বুঝলেন, বাইরের ব্যবস্থা মানে বাইরে থেকে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা নয়। পরদিনই খবরটা 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' বেরিয়ে গেল।

ষ্টিফেনসন তখন বাংলা গবর্নমেণ্টের হোম মেম্বার। স্টেট প্রিজনারদের জন্ত কয়েদী-খানার হুকুম কি ক'রে গেল, অনুসন্ধানে বের হল, ম্যাকআলপিন বলে একটা সেক্রেটারী ছিল, তার এক সই নিয়ে টমসন অর্ডারটি চালু করেছে।

ষ্টিফেনসন চট ক'রে ইয়ং সাহেবের সেই এক টাকা এক আনার ফর্দ পাশ ক'রে দিল। কাপড়-চোপড়েরও এক আধা-কয়েদী গোছের ফর্দ এল। এ পর্যন্ত ইয়ং সাহেবের মেজাজ আমাদের সম্বন্ধে শরীফ।

আমরা কিন্তু খাদ্য ও কাপড়-জামার ফর্দ সম্বন্ধে আপত্তি ক'রে গবর্নমেণ্টের কাছে লেখালেখি শুরু করলাম। সেটা ইয়ং সাহেবের তেমন পছন্দ হল না। 'তুমি সব কিছু করতে পার, তুমিই সব কিছু ক'রে দেবে' এই বলতে পারলে বাদশাই মেজাজ ভালো থাকত। যাই হোক, এখন পর্যন্ত চলনসই রকমেই সব চলল, ভেতরের উষ্মা বাইরে প্রকাশ পেল না।

ইতিমধ্যে বাংলা কাউন্সিলের নির্বাচন হয়ে গেল। দেশবন্ধুর এবং স্বরাজ্য-পার্টির জয়জয়কার!

নির্বাচনের পর সত্যেন মিত্র, অনিলবরণ রায় ও অরুণ গুহ এলেন আমাদের সঙ্গে পার্টির প্রোগ্রাম আলোচনা করতে। সত্যেনদা ও অনিলবাবু যাদুদা, মনোরঞ্জনদা প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা করতে রইলেন। পার্টির আমার জানার ভিতর কোথায় কি আছে না আছে আমি অরুণদাকে বলে দিলাম।

এত লোকের সঙ্গে একসঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ! আই. বি তুলকালাম ক'রে ছাড়ল। সবার সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের অনুমতি আগে থেকে ছিল না। কিন্তু মোলাকাতের ওখানে একজন ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ ছিল। ইয়ং সাহেব তার অনুমোদনে সবার সঙ্গেই দেখা করিয়ে দিল। এর পর ইয়ং সাহেব এবং ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে অনেক কৈফিয়তের ঝক্কিতে পড়তে হল। ক্রমে মোলাকাতের আইন-কানুনের নানাবিধ কড়াকড়ি দেখা দিতে লাগল।

শীতকাল এসে গেল। আমাদের আলোয়ানের প্রয়োজন। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট একটি আলোয়ান আনালে, আমরা বললাম, একটি আনালে চলবে না, কয়েকটি আনাবে, আমরা তা থেকে পছন্দ ক'রে দিলে সেই অনুযায়ী সবার জন্যে আসবে। ইয়ং সাহেব বলে পাঠাল, পছন্দ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের; আমরা বললাম, পছন্দ আমাদের।

ইয়ং সাহেব জিদ ছাড়ল না। আমরাও আধা-কয়েদী কাপড়ের ফর্দ এইবারে তুলব। সরকারের কাছে দরখাস্ত গেল, আমরা কয়েদী নই, পছন্দ আমাদের।

বাদশাই মেজাজ এইবারে ক্ষেপে উঠল।

খাওয়া-দাওয়ার জন্য যে-ফর্দ ইয়ং সাহেব পাশ করিয়ে এনেছিল, তা নিয়ে আমাদের আপত্তি ছিল এবং সে-আপত্তিও সরকারকে জানানো হয়েছিল। ইয়ং সাহেব এইবার প্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লেগে গেল, তার ব্যবস্থায় ত্রুটি নেই। একদিন তিনটি বাঙালী ভদ্রলোককে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা দেখাবার জন্য ডেকে নিয়ে এল। এঁদের একজন ঝুনো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, একজন রায়বাহাদুর, আর একজন সিভিল সার্জনের জামাই।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটটি জিজ্ঞেস করেন, খাদ্য তালিকায় অভাব কিসের?

আমি বলি, দুধ, ফল, মিষ্টি ইত্যাদির। মাছের পরিমাণ কম।

ফল? বাড়িতে কি ফল খান?

কেন? আম, কাঁটাল, আনারস, কলা, পেঁপে···

পেঁপে? আপনার বাড়ি কোথায়?

বাড়ির পরিচয় বলি।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের জেরা: সেখানে আমি ছিলাম, সেখানে তো পেঁপে হয় না।

অমৃত সরকার জিজ্ঞেস করেন, আপনার বাড়িতে বেগুনের চাষ হয়?

জ্যোতিষবাবু গম্ভীরভাবে বলেন, You have no right to cross-examine a gentleman. আমাদের দিকে ফিরে বলেন, Friends, let us retire.

এর পর যার মুখে যা এল, ভদ্রলোকদের নির্বাক হয়ে কিছু সময় দাঁড়িয়ে শুনতে হল। জানলা দিয়ে দেখছি, ইয়ং সাহেব বেলতলায় পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে মাথা দোলাচ্ছে, আর হাতের রুল দিয়ে নিজের পায়ে মারছে। ভাবটা, এই নিমকহারামদের সাথে কেউ পারবে না—এত করলাম এদের জন্য, এখন আমি যা কিছু করেছি, তারই বিরুদ্ধে কথা!

নিজেদের পছন্দমতো কাপড় চাই, ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাগিদও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ইয়ং সাহেব এতে বাধা দিচ্ছে। কাজেই সরকারের অনুমোদনও পাওয়া যাচ্ছে না। এর পর একটা তাগিদ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সরকার থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু কাপড়-জামা দিয়েছিল এক একটি পুঁটলি বেঁধে

অফিসে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হল। এর আগে মাঝে মাঝে অন্নবর্জন ধর্মঘট হয়েছে, এইবারে এসে গেল বস্ত্রবর্জন। ধরা পড়ার সময়ে যার যা ধুতি-জামা সঙ্গে ছিল, তাই রইল সম্বল।

ইয়ং সাহেব কিন্তু পুঁটলিগুলো অফিস থেকে ফেরত দিল, বলে পাঠাল, না পরতে হয় না-পরবে, পুঁটলিগুলো আমাদের ঘরেরই এক কোণে জমা থাকবে।

আমরা পুঁটলিগুলো দেয়ালের উপর দিয়ে জেলেরই আর এক অংশে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। জেলখানায় এটার নাম হল mutiny বা বিদ্রোহ—যা নাকি ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে সিপাইরা করেছিল!

পরদিন স্নানের বেলার আগে একে একে অফিসে ডাক পড়ল—যাদুদা, ভূপতিদা, সতীশ পাকড়াশী। যে যায় সে কিন্তু আর ফেরে না। আমরা স্নানের প্ল্যাটফর্মে ওঁদের প্রতীক্ষায় বসে আছি। ডাক পড়ল অমৃত সরকারের। বলে দেওয়া হল, এখন স্নানের বেলা হয়েছে, যাঁরা গেছেন তাঁরা না ফিরলে আর কেউ যাবেও না, এবং খাবেও না।

তা-ই হল। জেলখানায় দেখা গেছে, লড়াই যে ভাবেই শুরু করা হোক, শেষ পর্যন্ত অনশনটি প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে।

বিকেল বেলায় আবার অমৃতবাবুর ডাক পড়ল, তখন তাস খেলা হচ্ছিল—চারজন খেলছিলেন, আর আমরা সবাই মোক্তারী করছিলাম। বলে দেওয়া হল, যাঁরা গেছেন তাঁরা না ফিরলে আমরা আর কেউ যাব না।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওআর্ডের দরজা চিচিংফাঁক হয়ে গেল, আর ঢুকল ইয়ং, জেলার, বড় জমাদার, এবং তাদের পেছনে পেছনে জন ত্রিশ সিপাই।

তাস খেলা চলছে।

ইয়ং সাহেব চোখ এবং ব্যাটন ঘুরিয়ে বলে, You অমৃতা সারকার, will you or will you not obey orders?

অমৃতবাবুরও চোখ দুটো বেশ ঘুরত, বললেন, তোমার brute force তো সাথে করেই নিয়ে এসেছ, তা-ই চালাও।

দু'জন সিপাই এসে দু'দিক থেকে ধরল, উনি চললেন।

একে একে এই অভিনয় আমাদের সবার বেলাতেই হল। সবাইকেই নিয়ে চলল সেই বিশ ডিগ্রীতে—সেলে।

আমি, জীবন, আর অমৃতবাবু খুব হাসছি। দরজা থেকে বেরিয়ে দেখি, একটা ওআর্ডে কয়েদীরা বন্ধ হচ্ছে। বলি, 'বন্দে মাতরম্'।

সকলেই বলেন, 'বন্দে মাতরম্'।

সেলে বন্ধ হয়েছি। ভারী বুটের শব্দ ক'রে ইয়ং সাহেব ছুটতে ছুটতে আসে। প্রথম সেলেই আমি। জিজ্ঞেস করে, 'Did you cry Bandemataram ?'

'Yes, I did.'

আর দাঁড়াল না। পরের সেলে জীবন। তাঁকে দেখিয়ে পেছনে বড় জমাদারকে হিন্দিতে বলে, এই তো চেহারা! মশলার মতো পিষে ফেলতে পারলে না ?

সব সেলের সামনে ঘুরে রাগে গর গর ক'রে বেরিয়ে গেল। যাদুদাদের তিনজনের কিন্তু তখনও খবর পেলাম না। রাতের বেলায় জানলাম, সংলগ্ন আর একটা সেল-ব্লকে তাঁরা আছেন।

ডেভিস বলে একজন আই. সি. এস তখন মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সেই রাত্রেই ইয়ং সাহেব ক্লাবে ডেভিসের সঙ্গে দেখা ক'রে বলে, এরা জেলে মিউটিনি করেছে, প্রয়োজন হলে আমি এদের গুলি করতে পারি কি না ?

ডেভিস বলে, ভারত গবর্নমেণ্টের বন্দী এরা, গুলি-ফুলি ক'রে কাজ নেই। সে অনেক হাঙ্গামার ব্যাপার। শুনলাম, বিদ্রোহের জন্যে আমাদের নাকি সাজা হয়েছে, একমাস ক'রে সেল-বাস করতে হবে।

সেলে অনাহারে দিন কাটে। সকাল-সন্ধ্যায় বেড়াবার মাঠে যাদুদাদের সঙ্গে ফাঁকে ফাঁকে দেখা হয়। পরামর্শ হয়। গোপনে বাইরে খবর পাঠানো হয়।

চারদিনের দিন শোনা গেল লর্ড লিটন আসছে। যাদুদার ছোট ভাই ধনগোপালের সঙ্গে মিস ম্যাক্‌লাউডের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। মিস ম্যাক্‌লাউড এক উচ্চবংশীয়া বৃদ্ধা আমেরিকান মহিলা। ইনিই নাকি চিকাগো কংগ্রেসে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা করার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন। শেষ জীবনে ইনি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ধনগোপালের *My Brother's Face* পড়ে এদেশে এসে যাদুদার সঙ্গে আলাপ করেন। জেলেও একবার দেখা ক'রে গেছেন। তখন এক মজার ব্যাপার হয়েছিল। যাদুদার সঙ্গে বিলিতি নামের কে একজন 'মিস' জেলে দেখা করতে আসছেন শুনে, একজন মুসলমান অ্যাসিস্টাণ্ট জেলারের মনে খটকা লাগে। জেলারটি গোপনে পাত্র বুঝে ঠিক ভূপতিদা ও মনোমোহনকেই জিজ্ঞেস করে। তাঁরাও ইশারায় ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন, ব্যাপার গোলমেলে। তারপর দেখা যখন করতে এসেছেন, তখন ছুটতে ছুটতে এসে বলে, 'যান! ইনি তো যাদুবাবুর ঠাকুরমাও হতে পারতেন।' খুব হাসাহাসি হল।

আমাদের সাজা ও অনশনের খবরটি কলকাতার কাগজে বেরিয়ে গেছে। বৃদ্ধা যখন শুনেছেন, যাদু উপবাসে আছেন, ছুটে গেছেন লর্ড লিটনের কাছে। গবর্নরেরও তখন মেদিনীপুর, বাঁকুড়া যাবার কথা। জেলে গিয়ে যাদুদাকে ডাকল।

যাদুদাকে আমাদের ইআর্ডে নিয়ে সব শুনে লিটন বলে, আপনারা অনশন ছাড়ুন, সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকেও যা করবার আমি করব, আপনারাও জেলের আইন মেনে চলবেন।

কাপড়ের পুঁটলিগুলো ইতিমধ্যে আমাদের ঘরে এসে পৌঁছে গেছে। দেখে যাদুদা ইয়ং সাহেবকে বলেন, ওগুলো সরিয়ে নাও।

মুখ গুমরে বলল, সরিয়ে নেবে।

আমাদের সবাইকে সেল থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমরা আবার খেতে শুরু করলাম,—অনশন ছিল আমাদের পৃথক করার জন্য ও সেল-বাসের জন্য। কাপড়ের পুঁটলি কিন্তু ইয়ং সাহেব আর ফিরিয়ে নিল না। সেল-বাসের সাজার সঙ্গে আমাদের আরও সাজা ছিল চিঠিপত্র লেখা এবং দেখাসাক্ষাৎ করা বন্ধ।

সে-সাজার মেয়াদ ফুরিয়ে গেল। তবু চিঠিপত্র আমরা লিখলাম না। কাপড়ের পুঁটলিগুলো ফিরিয়ে নিল না; সরকারের তরফ থেকেও আমরা যে কয়েদী নই, বিনাবিচারের বন্দী—এ স্বীকৃতি মিলল না—ওদের পছন্দ ও ফর্দ অনুযায়ী আমাদের কাপড় নিতে হবে।

মনের ভিতর একটা গুমট জমে ছিল। বাইরেও আমাদের চিঠিপত্র কেউ না পাওয়াতে একটা গুমট জমেছে। সেটা আমরা কাটতে দিতে চাইনি। চিঠির সংখ্যা বাড়ানোও আমাদের একটা দাবি।

তাছাড়া এ-ব্যাপারটা নিয়ে আরও বিরক্তির কারণ ছিল। অবস্থা প্রথমত যখন গোলমালের দিকে চলছিল, আমাদের কারও কারও চিঠিতে এক-আধটু খবর দেবার চেষ্টা থাকত। পুলিশ চিঠিগুলো আটক ক'রে লিখত, চিঠিতে মিথ্যা খবর আছে। আমরা পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মংকটনকে চ্যালেঞ্জ ক'রে একে একে অনেকগুলো চিঠি দিলাম। কোনো জবাব মিলল না। তখন আমি লিখলাম, I call you a cad. তুমি যদি মনে কর, তুমি ভদ্রলোক, আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ক'রে প্রমাণ কর, আমাদের কোন্ চিঠিতে কি মিথ্যা ছিল।

এরও জবাব এল না।

ইতিমধ্যে টেগার্ট-ভ্রমে গোপী একদিন আর্নেস্ট ডে-কে হত্যা করলেন। গোপী একটি লোককে বিশ্বাস করেছিলেন। সে-ই এই ভ্রম ঘটিয়ে দিল। লোকটির নাম আবারও বলতে হবে। কিন্তু তার আসল নামটি বলব না। ধরুন, তার নাম টুনু সেন। ব্যাপারটি রহস্যজনক। এ যেন টেগার্ট নিজেই নিজের হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল। অথচ আর্নেস্ট ডে-কে না মেরে কয়েকদিন আগে পার্সি ব্রাউনকেও মারতে পারতেন। গোপীর সুতীব্র আগ্রহের সুযোগ নিয়ে টুনু যে-কোনো সাহেবকেই টেগার্ট বলে দেখিয়ে দিয়েছিল।

এই হত্যা উপলক্ষে গোপী তো ধরা পড়লেনই, ফাউ-স্বরূপ Regulation III-তে সেইদিন ধরল অরুণ গুহ, সতীশ চক্রবর্তী, অতুল ঘোষ, কিরণ মুখার্জি ও গোপেন রায়কে।

চারুর এদিকে আর. জি. কর হাসপাতালে অবস্থা ক্রমে খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও আর দীর্ঘকাল রোগীকে রাখতে অনিচ্ছুক। খাওয়া-দাওয়ারও অসুবিধা হচ্ছিল, দেখাশোনা করার লোকেরও অভাব ঘটছিল।

দেখে-শুনে অরুণদা সরস্বতী প্রেসের বাড়িতে তাঁকে এনে রাখেন। সরস্বতী প্রেস তখন সবে আরম্ভ হয়েছে। প্রেসের বাড়িতে থাইসিস্ রোগী রাখার অসুবিধা সর্বরকমেই। সে অসুবিধা মেটান তিনি প্রাণের দরদ দিয়ে।

সন্ন্যাসীর দেওয়া ওষুধে ভালো কিছু হচ্ছিল না। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে চুনার পাঠানো স্থির হল। সঙ্গে গেলেন দৌলতপুর সত্যাশ্রমের দুইজন কর্মী—ময়মনসিং শেরপুরের জগদীশ নাগ এবং যশোর বিদ্যানন্দকাঠির অমূল্য রতন দাস। অরুণদা ও অতুলদা নিজেরা যা' পারেন দেন, বন্ধুবান্ধবের কাছেও সংগ্রহ ক'রে পাঠান।

এখন তো এঁরা দুজনও ধরা পড়লেন। অতুলদাদের আর্থিক অবস্থা তখন শোচনীয়। তবু তাঁর ছোট ভাই অমর তখন সাহায্য করতেন। অন্য বন্ধুরাও যা' পারতেন দিতেন। থাইসিস্ রোগীর খরচ এভাবে জোটা শক্ত, তবু চলত।

চুনারেও অবস্থা খারাপ বই ভালো হল না। অমূল্যর শরীর খারাপ হচ্ছিল। জগদীশও অনেক কাল চারুর সঙ্গে রয়েছেন। এঁদের জোর করেই চারু যথাক্রমে বাড়িতে ও আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন। অন্য একজন আশ্রম কর্মী ফরিদপুরের কৃষ্ণদাস চক্রবর্তী ও উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠের কর্মী বরিশালের অনন্ত (ভোলা) চক্রবর্তীকে সাথে নিয়ে চারু চুনার ছেড়ে ভাওয়ালী চলে গেলেন।

সেখানেও উন্নতি কিছু হল না। আমার চিঠি না পেয়ে আমাদের অবস্থা চারু বুঝছিলেন। মাঝে মাঝে ছোট এক-একখানি চিঠি দিয়ে নিজের খবর এক-একবার জানাতেন। ওঁর চিঠি পড়ে যাদুদা, মনোরঞ্জনদা, জীবন সবাই গম্ভীর হয়ে যেতেন। এমনি একখানা চিঠির শেষে তুলে দিয়েছিলেন :

স্মরণের আবরণে
মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনেরে
কে রাখিতে পারে।

চিঠিখানা পড়ে মনোমোহন বললেন, এই শেষ!

সত্যিই শেষ। আর কোনো চিঠি আসেনি। পরে কৃষ্ণদাস লিখেছিলেন, এই সময়ে চারুদা একদিন বলছিলেন, ভূপেনদার সঙ্গে যদি একবার দেখা হতো আরও ছয়মাস বাঁচতাম।

চিঠি বন্ধ রাখার আলোচনা যখন হয়, সতীশদা তার ঠিক আগেই ঢাকা জেল থেকে মেদিনীপুরে এসে পড়েন। আলোচনার রাত্রে তিনি বলেন, সবার কথাই তো আমরা জানি, চিঠি লেখার প্রয়োজন থাকলে এক ভূপেনের আছে, আর কারও কাছে নয়। মত নেওয়া প্রয়োজন তারই।

আমি বলি, আমার জন্য ভাববেন না। জেলে বসে চারুকে লিখবার আমার কি আছে? না লিখলেও সে আমায় ভুল বুঝবে না। তার অন্য ব্যথা আমি তো চিঠি দিয়ে মেটাতে পারব না।

চিঠি বন্ধই রইল।

এদিকে ইয়ং সাহেবের সাথে আমাদের বিবাদ নিয়ে গবর্নমেন্ট থেকে এক Inquiry Commission করল। বিভাগীয় কমিশনার মিঃ জে. এন. গুপ্ত ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডেভিস তার সদস্য। ব্যাপার কি বলতে আরম্ভ করতেই মিঃ গুপ্ত বাংলায় বললেন, "আমি বিভাগীয় কমিশনার, কিন্তু বুঝছেনই তো বাঙালী, ক্ষমতা-টমতা বিশেষ কিছু নেই, now let us know what happened.'

ইয়ং সাহেবের সমস্ত নাটকীয় ব্যাপার অভিনয় করেই দেখানো হল। শুনে ব্যাপারটা তাঁর বুঝতে দেরি হল না, বললেন, I'll ask the Superintendent not to lose temper and advise you to observe jail rules.

শুনলাম, অন্য সুপারিশের সঙ্গে এই কমিটিই গবর্নমেন্টকে বলে, রাজবন্দীদের

জেলে রাখা সব দিক থেকেই অনুচিত, বরং এদের হিজলীতে রাখা উচিত। হিজলীর কথা ইয়ং সাহেব আমাদের কাছে আগে বলেছিল। গবর্নমেণ্টও এরপর আমাদের ওখানে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু জলাভাবের দরুন সেটা তখন ঘটে ওঠেনি। পরে টিউব-ওয়েলের ব্যবস্থা ক'রে ১৯৩১ সালে ওখানে বিনাবিচারের বন্দীদের নেয়।

মাসের পর মাস যায়, শীতের প্রকোপ নিদারুণ। কাপড় নেই, জামা নেই, আলোয়ান নেই, জুতোও প্রায় নেই। বিছানার চাদর, আর একখানি ক'রে সুজনি সম্বল। রাত্তির বেলায় তার সঙ্গে এক-একখানি ক'রে কয়েদীর কম্বল জুড়ে নিই। দিন কাটে।

স্ফূর্তির কিন্তু অভাব নেই। আমাদের কাজ করার জন্য যে কয়জন কয়েদী ছিল তাদের ভিতর কৃষ্ণদাস বলে একজন ছিল—মেথরের কাজ করত। দাগী কয়েদী—পেশা পকেটমার। ছোট্ট মানুষটি, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু চেহারায় লাবণ্যের অভাব নেই। চলাফেরা সাধারণতঃ মন্থর, প্রয়োজনে অতি ক্ষিপ্র, কিন্তু সর্বদাই কাঠবিড়ালীর মতো নিঃশব্দ। রসিক লোক। সদ্য বিদেশ থেকে আগত এবং এদেশে বহুদিনের বাসিন্দা মেমসাহেবের চরিত্র বর্ণনা করল একদিন, স্বভাবসিদ্ধ মৃদু ভাষায়: হাওড়া স্টেশনে হাত থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটি টেনে নিয়ে ছুট দিতেই যে মেমসাহেব 'O my God!' বলে হাঁ ক'রে থাকবে, বুঝতে হবে সে নতুন এসেছে। পালানো ভারী সুবিধে! আর এদেশে পুরানো হয়ে গেছে যে মেম সাহেব নিউ-মার্কেটে তার ব্যাগে টান পড়তে না পড়তেই বলবে, চোর, চোর, পাকড়ো পাকড়ো!

দু'চারদিন ধরে অমৃতবাবু ওকে নিয়ে ঘরের পেছনে কি শলা-পরামর্শ করেন। তারপর একদিন বেলা ১০টা আন্দাজ সবাই যার যার জায়গায় শুয়ে বসে পড়াশোনা করছি—হঠাৎ দরজার কাছে আওয়াজ হল, Good morning, Babus! চমকে যেমন সেদিকে সবাই তাকিয়েছি, কে একজন মাথা থেকে টুপি খুলে আবার বসাতে বসাতে বলছে, I am the টাট্টি-General, I come from Madras. বলেই লজ্জায় হোক বা বড় অফিসারের কর্তব্যসাধনের জন্যই হোক চটপট আমাদের ঘরের ভিতরকার পায়খানায় ঢুকে পড়ল। বিস্ময় ভেঙে ইতিমধ্যে আমরা সব হাসতে হাসতে দম নিচ্ছি, ও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে মুখ নিচু ক'রে বলে, I find it all very neat and clean. Good morning! বলে ছুটতে ছুটতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মেথরের কাজ করতে জেল থেকে

চুন, আলকাতরা, পাট, কয়েদীর ছেঁড়া কাপড় জাতীয় দু'চারটা জিনিস পেত। তা থেকেই মাদ্রাজী সাহেবের পোশাক তৈরী হয়েছে। উপদেষ্টা অমৃতবাবু।

সতীশ পাকড়াশী কৃষ্ণদাসকে সাতিশয় যত্নসহকারে বোলশেভিজম বোঝান। যাদুদা একদিন ওর পরীক্ষা নিতে গিয়ে বলেন, কারও ঘরে কিছু থাকবে না, কিন্তু যার যা প্রয়োজন, তা সে পাবে, কেমন হল বল্ তো রে, কেষ্ট?

ধীরে ধীরে ও বলে, বাবু, সবই তো হল ভালো! কিন্তু শালা চোরের বড় মুশকিল হল!

কেন রে?

সবাই সব পাবে, কিন্তু ঘরে কিছু না থাকলে চোর ব্যাটা কি পাবে?

যার যেখানে ব্যথা!—যাদুদা উচ্চ হেসে বলেন।

যাদুদা, ভূপতিদা, সতীশ পাকড়াশী, জীবন এবং আরও কেউ কেউ মিলে এক যাত্রার দল খুলেছিলেন। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপন খুলে গান ধরতেন, "নিদাঘে শীতল সিরাপ···।"

গান ধরে যাদুদা আলোকিত ঘরে একটি লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে চলতেন, আর নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে গাইতে গাইতে দলটি পেছনে। ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পরিক্রমা।

গোলমাল লাগবার আগে কয়েদীর খানা থেকে অব্যাহতি পেয়ে আমাদের অবস্থা যখন একটু উন্নতির দিকে তখন জেলার হরপ্রসাদ মিত্রের মনোভাবের ব্যাখ্যান ক'রে ভূপতিদা একটি গান বেঁধেছিলেন, প্রথম দু'টি লাইন মনে পড়ে:

'মেদিনীপুর জেলে লেগেছে রেকুইজিশন-হাওয়া
দেখি নাই, কভু দেখি নাই এমন বিনামা-চাওয়া।'

ইদানীং নতুন duet শুরু হল—

'ইয়ং সাহেব গেলেন'

'কোথায় গেলেন?'

'গেলেন ক্ষেপে।'

পড়াশোনা বিশেষ নেই, সুযোগও কম। বইপত্র প্রায় পাইনে। রাত্রে যাত্রা-গান ভঙ্গের পর প্রায় পাশার উৎসাহ জাগে। আমি রস পাইনে, ঘুম তার চেয়ে মিষ্টি লাগে। শুয়ে পড়ি। অমৃত সরকার পেছনে লাগেন, জীবনও সঙ্গে থাকেন।

ঘুমাব এমন সময় বালতি-ভরা জলের ঢেউ খেলে গেল নারকেল ছোবড়ার

গদির উপর দিয়ে। এরপর থেকে খেলোয়াড়দের কারও না কারও খাট দখল ক'রে চুপটি ক'রে শুয়ে পড়ি। একরাত্রে খেয়াল চাপল, সব খাটেই জল থৈ থৈ! তারপর সারারাত ধরে যাত্রার পালা।

ওদিকে দরখাস্তের পর দরখাস্ত চলেছে। হঠাৎ একদিন ইয়ং সাহেবের বদলীর হুকুম এল।

তার জায়গায় রাজনৈতিক বন্দীদের বন্ধু টমসনের কারসাজিতে এল মানরো। আমাদের মধ্যে দু'চারদিনের মধ্যেই সে নাম পেল 'তিলেখচ্চর'। ছিল পাগলা গারদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। অত্যন্ত সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত—ঘরে ঢুকেই আলমারির পেছনে উঁকি দিয়ে দেখে পিস্তল লুকানো আছে কি না, থুকদানির চুন পা দিয়ে নেড়ে চেড়ে বিপজ্জনক জিনিসের সন্ধান করে।

যে কোনো জিনিস চেয়ে পাঠাই, জেলারকে বলে, দেখ, আইনে আছে কি না। জুতো মেরামতের কথা আইনে নেই, বরং নতুন জুতো কিনতে রাজী, জুতো মেরামত করিয়ে দেবে না। জিভ-আঁচড়া আইনে নেই, তা দেবে না। জিনিসপত্র চেয়ে পাঠাই একটা খাতায় লিখে, খাতা অফিসে আটকে রেখে দিল। শ্লেটে লিখে পাঠাই। শ্লেটের কথা তো আইনে নেই, তাও একে একে সবগুলি আটক করল। আটকাতে চেয়েছিল দরখাস্তের কাগজও। একজন অ্যাসিস্টাণ্ট জেলার বলে, সেটা পার না সাহেব, আসল আইনেই আছে যতো খুশি দরখাস্ত ওঁরা করতে পারেন।

প্রতি ব্যাপারে রোজ দু'চারখানা ক'রে দরখাস্ত যায়। ষ্টিফেনসন তো পেয়ে আগুন, Who sent Maj. Munroe there?

অসহযোগের সময় মানরো বরিশাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। গীতা ও কোরান নিয়ে সেখানে এমন কাণ্ড করেছিল, যার ফলে লাটসাহেবের Executive Council-এর স্যার আবদার রহিমকে জেল বিভাগ ছাড়তে হয়।

বিশ দিনের ভিতর মানরো সাহেবের মেদিনীপুরের খেলা শেষ হল। টেলিগ্রাফে বদলী হয়ে গেল। মেজাজ এত খারাপ হয়ে গেল যে পরবর্তী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বাড়ির চাবিটি পর্যন্ত না দিয়ে সরে পড়ল।

সবে ভোর হয়েছে। কেউ কেউ মুখ ধুচ্ছেন, এমন সময় দেখি, জেলারকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলেন Maj. Denham-Whyte—নতুন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

বললেন, চাটগাঁয় টেলিগ্রাম পেলাম, মেদিনীপুর যাবার আগে সেক্রেটারিয়েটে এসে সব কাগজপত্র দেখে যেও। What are those miles

length of petitions about? Who is the gentleman who wanted a tongue-scraper?

বললাম, আমি।

জেলারকে জিজ্ঞেস করলেন, একটার দাম কত?

ছ'পয়সা, কি দু'আনা।

একটু মুখ টিপে হেসে বেরিয়ে গেলেন।

একে একে যা' চাই সবই আসতে লাগলো। সরকারী চিঠি এল: খাদ্যের জন্য দৈনিক বরাদ্দ একটাকা চার আনা, তার ভিতর আমরা যা পারব আনিয়ে নেব। কাপড়, জামা ইত্যাদি পাব নিজেদের পছন্দ মতো। ঝগড়ার পর পাঁচমাস কেটে গেল। শীত গিয়ে তখন বেশ গরম পড়ে গেছে।

ডেনহাম-হোয়াইট্ আসেন, এক-এক দিন অনেকক্ষণ ধরে গল্প করেন। তাঁর স্ত্রী মাঝে মাঝে নিজে হাতে বয়ে আমাদের জন্য অনেকগুলো ক'রে বই নিয়ে আসেন, আর আনেন চকোলেট।

যাদুদা পলাতক হবার আগে মেডিক্যাল কলেজে ডেনহাম-হোয়াইটের ছাত্র ছিলেন। এখানে মাঝে মাঝে বাইরের রোগী সম্বন্ধে ভূতপূর্ব ছাত্রের সঙ্গে আলোচনা ক'রে আনন্দ পান। জেল হাসপাতালে কোনো কোনো দিন সাথে ক'রে নিয়ে যান বিশেষ বিশেষ রোগী দেখাতে।

মনোরঞ্জনদা আর ভূপতিদা একদিন বড় আঘাত দেন। আলোচনার মধ্যে বলেন, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ওরা ঢাকার তাঁতীদের আঙুল কেটে ফেলেছিল।

Don't say, they were so bad!

এঁদেরও ধৈর্যের অভাব নেই, স্নানের সময় চলে গেছে, আমরা সব খেতে বসেছি, তখনও আলোচনা চলছে।

বর্মার পথে

২৯শে মে, ১৯২৪ সাল।

সবে রোদ উঠেছে। কেউ কেউ ভোরের খাবার দিতে বলেছেন, দেরিতে ঘুম থেকে ওঠার দল মুখ ধুচ্ছেন—সবাই প্রায় স্নানের প্ল্যাটফর্মের কাছাকাছি আড্ডা জমিয়েছি। প্রবেশ করল দু'জন অ্যাসিস্টাণ্ট জেলার, হাতে কতকগুলো ক'রে শাদা কাগজ।

মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝে জিজ্ঞেস করি, কার কার বদলী?

জেলার দু'জন হেসে ফেলল, নাম বলল—আমি, জীবন, সতীশদা ও জ্যোতিষবাবু।

কোথায়?

কিছুই জানিনে। এখান থেকে আপনাদের কলকাতায় পাঠাবার হুকুম। তারপর কোথায় পাঠাবে বলতে পারিনে।

পাঁচ মাস ধস্তাধস্তির পর এই সেদিন থেকে মেজর ডেনহাম-হোয়াইটের কল্যাণে একটু স্বস্তিতে আছি। এরই মধ্যে আবার ছাড়াছাড়ি! ছাড়াছাড়ি নয় শুধু—অনির্দেশ যাত্রা!

আমরা যারা যাব, তারা যতখানি বিচলিত হলাম, তার চেয়ে বেশি বিমর্ষ হয়ে পড়লেন যাঁরা রয়ে যাবেন তাঁরা।

কিন্তু হায়, নাই যে সময়! আমাদের সঙ্গে জিনিসপত্র যার যা যাবে, জেলাররা তার ফর্দ ক'রে ফেলল। মনোমোহন ও অমৃতবাবু সব গুছিয়ে প্যাক ক'রে দিলেন, বন্ধুরা তাড়াতাড়ি রান্নার আয়োজন ক'রে খাইয়ে বিদায় দিলেন।

কোথায় যাচ্ছি, তা নিয়ে সবারই মনে দারুণ উৎকণ্ঠা—অফিসে জেলারকে জিজ্ঞেস করলাম—ফল নেই জেনেও। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জিজ্ঞেস করলাম—অত শিক্ষিত, অত ভালো লোক, অসত্য বলতে পারবেন না, আশা করেছিলাম।

একথাও বলতে পারতেন, বলা আমার পক্ষে অন্যায় হবে, আমায় জিজ্ঞেস করবেন না। কিন্তু বললেন, Haven't the least idea, probably to Cox's Bazar অভ্যাসটা মজ্জাগত বলেই হয়তো নি যাবাদী বললে ইংরেজ জাত অত খাপ্পা হয়।

ইতিপূর্বে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে যখন আমাদের গুরুতর রকমের ঝগড়া চলছিল, তখন আমাদের কোথায় পাঠানো যায়, তা নিয়ে ভারত ও বাংলা গবর্নমেন্ট মিলে নানাবিধ আলোচনা চালিয়েছিল। ইদানীং সরকারী কাগজ-পত্রে দেখেছি, আমাদের মরিশাস, আন্দামান অথবা অন্য কোনো দ্বীপপুঞ্জে পাঠাবার প্রস্তাবও বাংলা সরকার করেছিল। কিন্তু বিলাতের সরকার মানবে না আশঙ্কা ক'রে ভারত সরকার ঐ প্রস্তাব চাপা দেয়। এই সময় মেজর ডেনহাম-হোয়াইট দার্জিলিং-এর কোনো জায়গা—সম্ভবত: তাকৃদার জঙ্গল অথবা কক্সবাজারে পাঠাবার সুপারিশ করেছিলেন। আমাদেরও সে কথা বলেছিলেন। সেই কথারই রেশ টেনে এখন কক্সবাজারের নাম করলেন।

কিন্তু আশ্চর্য, আমরা জেল ছাড়বার পরক্ষণেই জেলের প্রায় সব অফিসারেরা আমাদের বন্ধুদের বলেছিল যে আমরা বর্মায় পাড়ি মারছি। আরও আশ্চর্য, বর্মার জেলে পৌঁছে দেখলাম, আমাদের বদলীর পরোয়ানা ভারত গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী সই করেছে ১৯২৪ সালের ১৬ই জানুআরি।

গাড়ি খড়্গপুরে পৌঁছালে দেখলাম, প্ল্যাটফর্ম খালি ক'রে রেখেছে, আমাদের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতে দিল না। একজন পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হাজির ছিল, সে সোজা স্টেশনের দোতলার ঘরে নিয়ে যায়।

বিকেলের দিকে যখন হাওড়ায় পৌঁছালাম, ভাবছিলাম, প্রেসিডেন্সি বা আলিপুর জেলে নিয়ে যাবে, অথবা হয়তো শিয়ালদায় নেমে অন্য কোনো জেলের পথে। সঙ্গে যে ইউরোপিয়ান ইনস্পেক্টরটি ছিল, সে কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালাদের বলল, লালবাজার।

আমি জীবনকে বলি, স্টেট প্রিজনার, লালবাজার বলে কি হে? সতীশদা ও জ্যোতিষবাবু একটু হাসেন।

লালবাজারে তো মালপত্রসহ ঢুকিয়ে দিল একটি ঘরে চারজনকেই। বিছানা বিছিয়ে বসে গভীর গবেষণা করি—জেল থেকে উলটো-পথে থানায় কেন? তবে কি মামলা?

কিছুদিন আগেই চট্টগ্রামে রেল কোম্পানীর টাকা ডাকাতি হয়ে গেছে। কার

মুখ দিয়ে নামটা প্রথম বের হল, ঠিক মনে নেই, তবে যে নামটি চারজনেরই মনে বিরাজ করছিল, সে 'টুনু সেন'।

সতীশদা বললেন, 'নির্ঘাত।'

জ্যোতিষবাবু আমার আর জীবনের সাথে খুব হাসছিলেন ; বললেন, এবারে রক্ষে নেই।

আমরা সবাই মোটের উপর সিদ্ধান্ত ক'রে নিলাম, চাটগাঁয়ে একটি ষড়যন্ত্রের মামলা হবে, এবং তাতে রাজসাক্ষী দাঁড়াবে টুনু সেন।

খবর নেবার জন্যে উচাটন হয়ে পড়লাম, আর কাকে কাকে অন্য কোনো জেল থেকে অথবা নতুন ক'রে ধরে নিয়ে আসে একসঙ্গে চাটগাঁয় চালান দেবার জন্যে।

একজন রাইটার কনস্টেবল আমাদের খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্বতলাশি করছিল। তাকে বার বার জিজ্ঞেস করি, আর কাউকে এনে অন্য কোনো ঘরে রেখেছে কি না। বার বার সে বলে, না।

সন্ধ্যার পর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলে, দুজনকে এনেছে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে। প্রেসিডেন্সি জেলে দুজনাই ছিলেন—পূর্ণদা ও বিপিন গাঙ্গুলী—আমরা আগেই জানতাম। তাঁদের আর একটা ঘরে নিয়ে বন্ধ করল।

এবারে আমাদের সন্দেহের অবকাশ রইল না যে, টুনু সেনের কল্যাণে আমাদের ষড়যন্ত্রের মামলায় পড়তে হবে। কারণ, আমাদের পুরানো পাপীদের মধ্যে ঠিক এই ছয়টি লোকেরই টুনুর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কাজের যোগ।

এখানে টুনুর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের ইতিহাসটা সংক্ষেপে বলছি। এই প্রসঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক পরিণতির ইতিহাসেরও কিছু কথা প্রকাশ পাবে।

টুনু চট্টগ্রামের লোক। সূর্যবাবু (সেন) বি-এ পাশ করেন বহরমপুর কলেজ থেকে ১৯১৭ সালে। এখানে প্রথমে অতুলদার, পরে সতীশদার হাতে একটি ভালো দল গড়ে ওঠে। সতীশদা ১৯১৪ সালের গোড়ায় কলকাতায় চলে আসার পর দলটি দেখাশোনা করতেন স্থানীয় ছাত্রকর্মী অমর ব্যানার্জি। এই দলের দেবেন সিংহ ছিলেন সূর্যবাবুর সহপাঠী। সূর্যবাবুকে দলে টানতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন, তিনি অন্য কোনো দলে আছেন। সূর্যবাবুও ওঁর কাছে জানতে পারেন, যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে ১৯১৪-১৫ সালে জার্মানীর সাহায্য

নিয়ে যে বিপ্লবের আয়োজন হয়, তাঁদের দল সে চেষ্টায় যোগ দিতে অস্বীকার করে। সূর্যবাবু চট্টগ্রামে ফিরে তাঁর বন্ধুদের সে-কথা জানান। তার ফলে, তাঁর বন্ধুদের ভিতর তাঁর সঙ্গে যাঁরা আসেন, টুনু তাঁদের অন্যতম।

টুনু এর পর চলে যায় লড়াইয়ে ৪৯নং বেঙ্গলী রেজিমেণ্টে। ১৯১৯ সাল নাগাদ ফিরে আসার পর সূর্যবাবু তাঁকে কলকাতা পাঠান এবং বলে দেন ১৯১৪-১৫ সালে যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কাজ করত এমন কোনো দলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। প্রথমেই ধরে নেওয়া হয়, ফরিদপুরের কোনো দল নিশ্চয় ছিল; কারণ, যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে শহীদ হন ফরিদপুরেরই তিনজন—চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন। কিন্তু টুনু কলকাতায় প্রথমটা ফরিদপুরেরই একজন অন্তরীণ-মুক্ত কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করে; তিনি ঢাকা অনুশীলনের লোক। কিছু দিনের ভিতর সে নিরাশ হয়। পরে পূর্ণদার খালাসের পর তাঁর সঙ্গে আলাপ করে।

আমি খালাস হয়ে রাজসাহী থেকে যেদিন কলকাতায় এসে পৌছাই, সেইদিন শিয়ালদ স্টেশনেই পূর্ণদা এর কথা আমায় বলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলেন, তাঁর পক্ষে তো যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়। আমি এখন যা ব্যবস্থা করবার করি। দু'একদিনের ভিতরই ওর সঙ্গে আলাপ হয়।

এর কয়েকদিন পরেই কংগ্রেস অধিবেশন হয় নাগপুরে। গান্ধীজি সেখানে অসহযোগ প্রস্তাব পাশ করেন। গান্ধীজির সমর্থক হিসাবে মুক্ত রাজবন্দীদের ভিতর আমরা যারা ঐ কংগ্রেসে যাই তার ভিতর জ্যোতিষবাবু, গিরীনদা, পূর্ণদা, ভূপতিদা, কুন্তল ও আমি একসঙ্গেই যাই ও থাকি। টুনু আমাদের সঙ্গে যায় এবং আমার ও কুন্তলের নাগপুরের খরচপত্র আংশিকভাবে চালায়।

আমি যখন খালাস হয়ে আসি তখন পর্যন্ত যুগান্তর দল অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে কি মনোভাব গ্রহণ করবে সে সম্বন্ধে পাকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। দলের নেতৃস্থানীয় যাঁরা সদ্য জেল থেকে তখন মুক্ত হয়ে এসেছেন তাঁদের ভিতর হরিদা (হরিকুমার চক্রবর্তী), মধুদা (সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ) ও মনোরঞ্জনদা আমার উপর ভার দেন গান্ধীজির সঙ্গে আলাপ ক'রে আন্দোলনের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা কতটা তা বুঝতে এবং তাঁদের জানাতে। এই সময় বিভিন্ন জেলার বহু ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সংকল্প নিয়েছেন এবং আমাদের উপর চাপ দিচ্ছেন মফস্বলে গিয়ে তাঁদের নিয়ে কাজ করতে।

নাগপুরে গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।* তাঁর সময় সংক্ষেপ। আমি সোজা প্রশ্ন করি, আপনি বলেছেন, এক বছরে স্বরাজ দেবেন। একথার অর্থ কি এই যে, দেশ আপনার কার্যধারা গ্রহণ করলে আপনি কংগ্রেসকে স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের পার্লিয়ামেণ্ট বলে ঘোষণা করবেন?

গান্ধীজি বলেন, Yes, exactly thar's my idea.

আমি বলি, তা যদি হয়, তাতেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে, আমরা তা মনে করিনে। তার পরও ইংরেজের সঙ্গে অস্ত্রের সংঘাত হবেই, কিন্তু এর কম কোনো পদক্ষেপ এখন নিলে আন্দোলন তৎক্ষণাৎ একটা বৈপ্লবিক স্তরে উঠবে। সেই হিসাবে এই এক বৎসরের জন্যে আমরা সম্পূর্ণভাবে আপনার নেতৃত্ব মেনে কংগ্রেসের কাজ করব। কিন্তু এই এক বছরে ওরকম কিছু না হলে আমরা পুরনো পন্থায় ফিরে যাব। সে অধিকার আমাদের থাকবে।

গান্ধীজি খুশি। কিন্তু বলেন, অহিংসাকে policy হিসাবে না নিয়ে যদি তোমরা principle হিসাবে নিতে পারতে আমি আরও সুখী হতাম। আমি বলি, তা আমরা পারিনে। এ নিয়ে আরও অনেক আলোচনা হয়। কালেলকর, কৃপালনী প্রভৃতি তখনকার বড় নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদী কয়দিন ধরে নীরবে বসে সে আলাপ-আলোচনা শোনেন।

এরপর সুরেশ ভট্টাচার্য, বাদল (সত্যব্রত দাশগুপ্ত), প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখ উত্তরবঙ্গের বন্ধুরা বলেন, গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনা করলেন। আমাদের পক্ষে এটা একটা পথ সন্ধানের সময়। ভালো হয়, যদি আপনি এখন একবার শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গেও আলাপ ক'রে আসেন। এঁরা যাঁর কাছে যা ছিল দিয়ে আমার ও কুন্তলের যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন। টুনুও যা ছিল দিয়ে দেয়।

শ্রীঅরবিন্দ আমাদের বিগত কয়েক বছরের কাজকর্ম সম্পর্কে আমার কাছে জেনে নেন। গান্ধীজিকে আমি যে কথা দিয়ে এসেছি তা সমর্থন করেন। সঙ্গে সঙ্গে বলেন, নিজেদের ভাসিয়ে দিও না। গান্ধী একটা মস্ত শক্তি নিয়ে এসেছেন। এ-বন্যার জল সরে যাবার পরও যা অবশিষ্ট থাকবে তা আশ্রমজাতীয় কতকগুলি ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন স্থানে ক'রে সেখানে ধরে রাখতে চেষ্টা

*এই সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিবরণ শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত "গান্ধী পরিক্রমায়" "বিপ্লবী গান্ধী ও ভারতের বিপ্লবান্দোলন" নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে পাওয়া যাবে।

ক'র। তাঁর এই উপদেশের ফলে ও যুগপ্রভাবে দেশের নানাস্থানে এই ধরনের বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

এর পর থেকে যুগান্তর দল মোটামুটি বাংলার সর্বত্র কংগ্রেসের কাজের ভিতর দিয়ে ও আশ্রম গড়ে বৈপ্লবিক সংস্থাকে যে ভিত্তি দিতে সক্ষম হয় তা বৃথা যায়নি। ১৯৩০ সাল থেকে যেমন কংগ্রেস আন্দোলনে তেমনি বৈপ্লবিক আন্দোলনে দলের ক্রিয়াকলাপ তুলনাহীন।

১৯২২ সালের গোড়ার দিক। অসহযোগ আন্দোলন তখন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। অত্যাচারে ক্ষিপ্ত নিরস্ত্র জনগণ উত্তরপ্রদেশের চৌরিচৌরা বাজি গ্রামে কিছু পুলিশকে হত্যা করেছে। অহিংসার এই ব্যত্যয়ে মর্মাহত গান্ধীজি আন্দোলন বন্ধ রাথার নির্দেশ দেন। এতে তিনি নেতৃস্থানীয়দের কিছু বিরাগভাজন হন। স্তিমিত আন্দোলনে জনগণও ভগ্নোৎসাহ। এই সুযোগে ইংরেজ সরকার গান্ধীজিকেও গ্রেফতার করে। ইতিমধ্যে নাগপুরে আমার দেওয়া সময়-সীমা শর্তের এক বৎসরও কেটে গেছে। তাছাড়া অতুলদাও দু'একবার আমায় বলেছেন, পুলিশের দৃষ্টি এখন অন্যদিকে, এই সুযোগে কিছু অস্ত্রসংগ্রহের চেষ্টা ছাখ্।

বোধহয় ফেব্রুয়ারীতে আমি যাই চট্টগ্রামে। সঙ্গে থাইসিস রোগী চারু। আছি স্বর্গবাবুর সঙ্গে তাঁর সাম্যাশ্রমে। তাঁরই অনুরোধে টুনু আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। প্রায় তিন মাসের মতো সময় আমি ওখানে কাটাই। এর ভিতর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন বসে ওখানে। দেশবন্ধু জেলে। বাসন্তী দেবী সভানেত্রী। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য বিভিন্ন জেলার যুগান্তর দলের নেতৃস্থানীয় অনেকে তখন ওখানে। এই সুযোগে দলের এক গোপন সম্মেলন ডাকি। উপস্থিত থাকেন অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিপিন গাঙ্গুলী, জ্যোতিষ ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন রায় (উত্তর বাংলা), ডাঃ আশুতোষ দাস (শ্রীরামপুর-আরামবাগ), সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র দাস, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপতি মজুমদার, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় ও সূর্য সেন। মোট আমরা বারো জন। কথাটা আমিই পাড়ি। গান্ধীজির কাছে দেওয়া এক বছর পেরিয়ে গেছে, এখন আমাদের পার্টি-প্রোগ্রামের পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। প্রস্তাব হল, গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করা হবে। কিন্তু উপস্থিত তার ব্যবহার হবে না। একমাত্র মনোরঞ্জনদার আপত্তি, আর সবাই মত দিলেন।

ভোটের জোরে পার্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণের রেওয়াজ আমাদের ছিল না। সুতরাং সকলেই অল্পবিস্তর বিব্রত বোধ করলেন। যতীনদা তখন পুরোপুরি

গান্ধীনীতি গ্রহণ করেছেন। তিনি একটু উপহাস ক'রে বললেন, মনোরঞ্জন যে আমার চেয়েও অহিংস হয়ে গেছে।

উপেন শীল ও রাখাল দে এই দুজনকে সূর্যবাবু সঙ্গে দিলেন। তাঁদের সঙ্গে চারুকে কুমিল্লায় রেখে কলকাতা এলাম। যাদুদাকে সব বলতে তিনি বললেন, মনোরঞ্জনের জন্য ভেবো না, তোমরা সুযোগ মতো অস্ত্র সংগ্রহ করতে থাক। মনোরঞ্জনদা পরে মত বদলান।

ইতিমধ্যে টুনু খবর নিয়ে এল, কিছু রাইফেল ও রিভলভার পাওয়া যেতে পারে। নিয়ে নিতে বললাম। তখন চারু কলকাতায় এসেছেন, তাঁর অসুখ বেড়েছে। শ্যামবাজারে যতীন মিত্র লেনে ছোট একটা বাড়ি থেকে অমরদা 'আত্মশক্তি' কাগজ বের করেন। পরে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে ভালো ঘর পেয়ে কাগজের অফিস সেখানে সরিয়ে নেন। যতীন মিত্র লেনের বাড়িতে আমি রইলাম চারুকে নিয়ে। আমাদের বন্ধু হৃষিকেশ মুখার্জি নিকটের এক স্কুলে হেড মাস্টার, তিনিও ওখানে থাকেন এবং ভাড়া টানেন।

বিকেলের দিকে একদিন আমি ও চারু রয়েছি দোতলার ঘরে, হঠাৎ নিচে তুমুল মোটরের হর্ন। ছাদে বেরিয়ে দেখি, তখনকার দিনের একখানি খোলা ট্যাক্সি। তারই পাঞ্জাবী ড্রাইভার হর্ন বাজিয়ে চলেছে, পেছন দিকে বসে এক কোণে টুনু, অপর কোণে একখানি শতরঞ্চি জড়িয়ে বাঁধা যে-বস্তু, চোখে পড়তেই বুঝলাম কি।

ছুটে নিচে গিয়ে দরজা খুলে দেখি, টুনুর মুখ ফ্যাকাশে, ঘামছে অনর্গল ধারায়, আর রুমাল দিয়ে বার বার চোখ-মুখ মুছছে।

ও যে এত ভীতু আর নির্বোধ হতে পারে, কখনও ভাবিনি। অনেক আগে দলে এসেছে, তারপর যুদ্ধে সৈন্যের কাজ করেছে!

মুখে কিছু না বলে বললাম, নেমে এস। নিচের ঘরে ঢুকে বলি, এসব তোলবার তোমার অন্য জায়গা নেই, আমায় আগে বলনি কেন? এখন ট্যাক্সি নিয়ে যাও, যত ঘুরিয়ে যত দেরি ক'রে পার ওকে ছেড়। দরকার হয়তো বল, টাকা দিচ্ছি।

বলল, না, টাকা আছে।

ট্যাক্সিওয়ালার বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হবার কথা নয় যে, ঐ শতরঞ্চিতে কি বাঁধা আছে। তাছাড়া গলির দক্ষিণ দিকের মোড়ের বাড়িটাতে থাকতো আমার এক পুরানো সহপাঠী। প্রথমবার ধরা পড়ার আগে থেকে শুনেছি, সে

আমায় ধরার চেষ্টায় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। তবে সময়টা এমন যে পাড়ায় প্রায় লোকই হয় বাড়ির বাইরে, নয়তো ঘুমিয়ে।

রোগীর ঘর, স্ক্রু ড্রাইভার জাতীয় কোনো কিছুও নেই, ভোঁতা একটা ছুরি নিয়ে দু'জনে মিলে বন্দুক দুটো অনেক কষ্টে খুলি। রাইফেল নয়, একনলা ও দোনলা দু'টো বীচলোডিং বন্দুক। কি করব ভাবছি, হঠাৎ এসে পড়লেন জীবন। অবস্থা সব শুনে স্বভাবসিদ্ধভাবে চট ক'রে বেরিয়ে গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই এলেন, সঙ্গে মুন্সিগঞ্জের আমাদের কর্মী শংকর মহলানবিশ, কোথা থেকে একটি ঝাঁকা আর লুঙ্গি ও গামছাও নিয়ে এসেছেন। ইতিমধ্যে বন্দুক দু'টো খুলে রিভলভার আর গুলিসহ একটা তোশক আর ঐ শতরঞ্চিতে ভদ্রস্থ ক'রে বাঁধা হয়েছে। ঝাঁকা-মুটের মাথায় সেগুলো গেল কলেজ স্কোয়ারে রোহিণী মুখার্জির দোকানে এবং সন্ধ্যার পর অন্য লোক নিয়ে গেল ডিকসন লেনে রায়-সাহেব প্রিয়নাথ দাসের বাড়িতে। রায়সাহেবের ছেলে সুবোধ আমাদের কর্মী, তখন ধানবাদ মাইনিং স্কুলের ছাত্র।

সে অন্য কথা। টুনুর চরিত্রের এই একদিক ধরা পড়ল। অন্যদিকে আমরা প্রত্যেকে লক্ষ্য করেছি, ওর অনর্গল মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস এবং আমাদের প্রত্যেকের আস্থাও এর ফলে হারিয়েছে।

আজ সন্ধ্যায় আমাদের সেই সব নোট মিলানো হল। পরে শুনেছি, ম্যাণ্ডালে জেলে এইসব নিয়ে জীবন, পূর্ণদা ও সতীশদার সঙ্গে সুভাষের আলাপ হয় এবং শরৎবাবু তখনকার বেঙ্গল কাউন্সিলে প্রশ্ন তোলেন, টুনু এজেন্ট প্রভোকেটর কিনা।

এ জিনিসটি আমার ভালো লাগেনি। এ ওদের লোক, এ কি ওরা কখনও স্বীকার করবে? ঘরের গলদের বিহিত ঘরেই করার নিয়ম। পূর্ণদা ম্যাণ্ডালে থেকে আলিপুর জেলে আসার পর এই প্রশ্ন হয়। আমাদের ধারণা হয়, পূর্ণদা প্রশ্ন পাঠান। পরে আমি বর্মা থেকে ফিরে এসে যাদুদাকে পাই ও তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি ঐ সময়েও আলিপুর জেলে ছিলেন। তিনি বলেন, তিনি এ সবের বিন্দুবিসর্গ জানেন না।

পূর্ববাবুও বিরক্ত হন। ১৯২৮ সালে খালাসের পর আমার সাথে দেখা হতে বলেন, কাজটা অন্যায় হয়েছে। আমিও সেকথা স্বীকার করি। তখন তিনি বলেন, অনেক দিন থেকে টুনুবাবুর ধরন-ধারণে তিনি সন্দিহান। কিন্তু আপনি জানেন, আরও কারো কারো দুর্বলতা আমাদের চাপা দিয়ে চলতে হচ্ছে। এ

লোকটি resourceful—ইচ্ছা করলে অনেক অনিষ্ট করতে পারবে। সেই কারণে ওর সম্পর্কে তিনি একটি নীতি মেনে চলছেন—to utilise him without taking him into confidence. আমাকেও এই নীতি মেনে চলতে বললেন।

বিশেষ ক'রে টুনুর মতো ধূর্ত লোকের সঙ্গে এরকম নীতি মেনে চলা খুব শক্ত। তবু ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ঐ নীতি মেনে চলার এক ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু আমি ধরা পড়ার পর আর সম্ভব হয়নি, বিশেষতঃ চট্টগ্রামের নেতৃস্থানীয় দু'জন যখন আমার আশ্রয়ে থেকে আমায় না জানিয়ে গোপনে টুনুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন।

আমার নিজের ধারণা, আমি বাইরে থাকলে টুনুর পক্ষে ওদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ এবং সব জেনে নেওয়া শক্ত বলেই টুনুর প্রয়োজনে এবং উপদেশে ১৯৩০ সালের ১০ই জুন আমায় ধরে। এরপর এক মিথ্যা অজুহাতে অন্য লোকের সাহায্যে ওঁরা দুজন টুনুকে চন্দননগরে দুই দিন নিয়ে যান। টুনু একরাত্রি ওখানে কাটিয়েও আসে। ফলে বাড়ির চৌহদ্দি জানা এবং নকশা করা টেগার্টের পক্ষে বেশ সহজ হয়। চন্দননগরের ঐ বাড়ি তল্লাশের পর টেগার্ট গবর্নমেণ্টকে যে রিপোর্ট দেয় তা থেকেও এটা বেশ স্পষ্ট হয়।

এই নয় শুধু, ডালহাউসি স্কোয়ারে যে বোমা ব্যবহার হয়, সে বোমা কে কোথায় তৈরি করেছে তাও ঐ সূত্রেই জানতে পায় এবং ঐ বোমা পড়ার দু' ঘণ্টার ভিতরেই ডাঃ নারায়ণ রায়ের বাড়ি ও ল্যাবরেটরিতে পুলিশ হানা দেয়। এই নতুন সূত্র টেনে পাঁচদিন পরে আর যে স্বীকারোক্তি বের হয় শুধু তারই জন্যে ওরা অপেক্ষা করছিল। তা না ক'রে সঙ্গে সঙ্গে চন্দননগরে তল্লাশি করলে টুনুর উপর সন্দেহ আসার সম্ভাবনা ছিল। এ ছিল ওদের পুরানো ধারা—যত বিপদের সম্ভাবনাই থাক, নিজেদের লোকটিকে বা আসলে সংবাদের উৎস ওরা বাঁচিয়ে চলত।

সে যাই হোক ১৯২২-২৩ সাল থেকেই ওর প্রতি সন্দেহে আমরা যে ভুল করিনি, পরে তা প্রমাণ হয়। গোপীকে বিভ্রান্ত ক'রে প্রথম এক সন্ধ্যায় হগ মার্কেটে গবর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের বিখ্যাত প্রিন্সিপ্যাল পার্সি ব্রাউনকে হত্যা করাতে চেষ্টা করে, পরে আর্নেস্ট ডে-কে হত্যা করায়; পলাতক সেজে পণ্ডিচেরি গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবী কাজের সঙ্গে যোগ কতটা, তা বুঝতে চেষ্টা করে, শ্রীঅরবিন্দ দেখা করেননি; ১৯২৫-২৬ সালে পুলিশ ওকে বিভিন্ন জেলে ঘোরায় ও অল্প-

বয়স্ক সহকর্মীদের দিয়ে স্বীকারোক্তি করাতে চেষ্টা করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফল হয়; চট্টগ্রামের ১৯৩০ সালের উত্থানের আয়োজন সম্পর্কে কিছু খবর হয়তো পুলিসের কাছ থেকেই পায় এবং ওখানে গিয়ে যতটুকু বুঝতে পারে তা পুলিশকে জানিয়ে দেয়; বাংলার জেল ও ক্যাম্পগুলো থেকে ১৯৩১ সালে পুরানো রাজনৈতিক কর্মী জনকতককে ৩নং রেগুলেশনে বাংলার বাইরে চালান ক'রে দেবার পর দলে ভাঙন ধরাবার কাজে বিভিন্ন ক্যাম্পে ও জেলে বিভিন্ন ধরনের যেসব লোক লাগায় টুনু তাদের অন্যতম।

টুনু প্রথম হয় মেদিনীপুরবাসী একজন আই. বি কর্মচারীর source বা গোপন খবরের উৎস। এর সম্পর্কে পূর্ববাবু যে-নীতি মেনে চলতে আমায় বলেন, সেই নীতি মেনে চলার পক্ষে অনুকূল হবে মনে ক'রে টুনুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ভার দিই মনোরঞ্জন রায় নামে এক কর্মীর উপর। টুনু ঐ আই.বি কর্মচারীটির স্বদেশ প্রেম সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা গায় মনোরঞ্জনের কাছে এবং তার সঙ্গে আলাপ করতে চেষ্টা করে। টুনু তখন হয়েছে খোদ টেগার্টের চর। এই ধরনের adventurer বাংলার বিপ্লবী দলে কম জুটেছে। আগে যে মিহির ঘোষের নাম করেছি, তার কথা আবার বলতে হবে। আধুনিক ভাষায় দু'জনেরই অবদান প্রায় সমান সমান। ফলে, দু'জনের যে প্রতিযোগিতা তারই নিদর্শন ফুটে ওঠে আরও বছরখানেক পরে—টুনুর উত্তেজনায় ও আয়োজনে মিহিরের দোকানে বোমা পড়ে। ইতিমধ্যে আমি ও জীবন বর্মার বেসিন জেল থেকে সেক্রেটারী অব স্টেটের কাছে এক দরখাস্ত পাঠাই, তার নকলের সঙ্গে দেশবন্ধুর কাছে যে চিঠি দিই, তাতে মিহিরের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনেক কথা ছিল, দেশবন্ধু সে চিঠিও প্রকাশ ক'রে দেন। ফলে মিহির সরাসরি আই. বি-র চাকরি নিয়ে যুক্তপ্রদেশে চলে যায়।

এসব পরের ঘটনা। সেই রাত্রে যখন আমরা চারজনই পাকা ধারণা করে বসলাম যে ষড়যন্ত্রের মামলার আসামী হয়ে আমরা চাটগাঁয় যাচ্ছি, যার কাছে যা চিঠিপত্র ছিল, যার খাতায় রাজনৈতিক লেখা যা-কিছু ছিল, সব ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেললাম। জীবন সেগুলোকে একটা মগের ভিতর সাবান-জলে গুলে পায়খানায় ঢাললেন।

রাত ভোর হবার আগেই বহু জুতার শব্দ সিঁড়িতে। একজন আই. বি অফিসার ঘরের দরজায় এসে বলে, আপনারা মুখহাত ধুয়ে নিন। এখনই বের হতে হবে।

এপর্যন্ত সব মিলে যাচ্ছে—ভোরবেলায় চাটগাঁ এক্সপ্রেস ছাড়ে।

থানার সামনে খোলা একখানা ভ্যানে তুলে দিল—পেছনে অন্যান্য ভ্যানে অগণিত পুলিশ—ভ্যানগুলোর মুখ দেখি গঙ্গার দিকে। বললাম, আউটরাম ঘাট, আজ শুক্রবার, তাহলে তো রেঙ্গুন ?···আজ অবশ্য চাটগাঁর জাহাজও ছাড়বে। (তখনকার দিনে কলকাতা থেকে চাটগাঁ পর্যন্ত সপ্তাহে একখানা ক'রে জাহাজ যেত।)

কুমার মজুমদার বলে একজন আই. বি অফিসার সঙ্গে। পূর্ণদা তাকে জিজ্ঞেস করেন, বলুন না মশাই, কোথায় যাচ্ছি ?

সে বলে, ঐ তো ভূপেনবাবু বললেন।

ঘাটে গিয়ে দেখি, আরও পুলিশ দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, জেটির সামনে কাউকে দাঁড়াতে দেয়নি। গ্রীনফিল্ড বলে একজন স্পেশাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ আমাদের রক্ষীদলের চার্জে। ডাক্তার দাঁড়িয়ে—তিনি আমাদের বুকে হাত ছুঁইয়ে পরীক্ষা করবার আগে জিজ্ঞেস করেন, 'Are all these six gentlemen going to Rangoon ?'

গ্রীনফিল্ড একটু থতমত খেয়ে বলে, 'Yes.'

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে হাসি।

মনে পড়ে পনেরো বছর আগেকার কথা। বর্মার দিকে এমনি ক'রে পাড়ি মেরেছিলেন আর তিনজন বাঙালী : শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সতীশ চ্যাটার্জী ও মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। তার আগে লালা লাজপৎ রায় ও সর্দার অজিত সিং। আরও একজনকে ছয় বৎসরের কারাদণ্ড ভোগ করতে বর্মায় যেতে হয়েছিল, তিনি লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক।

জাহাজে উঠে দেখি, ব্যবস্থা হয়েছে : আমি ও সতীশদা থাকব এক কেবিনে, জ্যোতিষবাবু ও জীবন এক কেবিনে এবং পূর্ণদা ও বিপিনবাবু এক কেবিনে। প্রত্যেক কেবিনে একজন ক'রে আই. বি সাব-ইনস্পেক্টর, দরজায় একজন ক'রে সঙ্গীনধারী পুলিশ। আর কেবিনগুলোর ঠিক সামনে কয়েকজন জমাদার, হাবিলদারসহ আরও জন-কুড়ি পুলিশ। আর গ্রীনফিল্ড দূরে—তার প্রথম শ্রেণীর কামরায়। আমাদের মালপত্রগুলো রইল পুলিশের হেফাজতে।

নোঙর তুলে জাহাজ ঘুরিয়ে ছাড়তে অনেক সময় নিল। আমরা একে একে ডেকের উপর এসে জমলাম—আই. বি-র লোকগুলো পিছনে। খিদিরপুরের নীচে গ্রীনফিল্ডের ইঙ্গিতে ওরা আমাদের কেবিনে ডেকে নিয়ে এল। একটু

বাদে আবার যথারীতি ডেকে এসেই বসলাম। ওরা তখন বলে, আপনারা যার যার ব্যাচের বাইরে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবেন না!

একটু হাসি—মনে মনে বলি, তেমনি সুবোধ বালকই পেয়েছ! আমরা ছ'জন একসঙ্গেই ঘুরি, কথাবার্তা বলি। ওরা গ্রীনফিল্ডের সাথে পরামর্শ ক'রে এসে বলে, আপনারা মেদিনীপুর থেকে যে চারজন এসেছেন, তাঁরা একসঙ্গে কথা বলতে পারেন, আর ওরা দুজন আলাদা। তিনজন অফিসার—কুমার মজুমদার, জয়নারায়ণ মিত্র এবং ভুজেন সরকার। এর ভেতর ভুজেনটিই পেছনে ফিঙে হয়ে লেগে থাকে। বার বার এসে বলে, আপনারা একসঙ্গে কথা বলছেন—সাহেব দেখলে আমাদের চাকরি যাবে।

ভারি আমাদের দুঃখু হবে!—মনে মনে বলি।

কিন্তু এই খেলা বেশীক্ষণ চলল না। সাগর দ্বীপ পার হবার আগেই পূর্ণদার বমির বেগ শুরু হল; বলেন, খাবার ঘরে কি মাংস খেতে দিয়েছে, আমার বেজায় অভক্তি লাগছিল। তিনি শয্যা নিলেন। সতীশদা আর জ্যোতিষবাবু অসুস্থ মানুষ—তাদের তো কথাই নেই। বিপিনবাবু মুখে কিছু বলেন না, বাইরেও কম আসেন—তাঁর গুরুগম্ভীর মর্যাদাবোধেও তিনি বিছানা থেকে ওঠাটা তেমন পছন্দ করেন না। খানিকটা রাত অবধি ডেকে ঘুরে বেড়াই বা ডেক-চেয়ারে বসে কাটাই আমি ও জীবন। খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে গা বমি বমি কম করে।

ওদিকে অফিসারদের মধ্যেও জয়নারায়ণ ও কুমার ফ্ল্যাট—একমাত্র ভুজেনই কর্তব্যপরায়ণ।

পরের দিন কড়াকড়ি কেটে গেল। গ্রীনফিল্ড ডেক-টেনিসে মেতে উঠল। কুমার ছিল সাহিত্য-বাতিকগ্রস্ত। কি নাকি উপন্যাস লিখেছিল—শরৎবাবুর অনুকরণে বর্মা এনে ফেলেছে তার ভিতর। তাই উপরওয়ালাদের বলে বর্মার সাথে সাক্ষাৎ-পরিচয়ের এই সুযোগ নিয়েছে। ডেক-চেয়ারে একখানা খাতা হাতেই অনেক সময় কাটাতে চেষ্টা করে। কিন্তু মাথা ঘোরে। আমাদের কেবিনে এসে জয়নারায়ণের সাথে শুয়ে শুয়ে গল্প জোড়ে। এদের গল্পের ফাঁকে ফাঁকে আমার একটা পরিচিত গল্পের হারানো সূত্র খুঁজে পাই। গল্পটা এখানে বলব—দেশে বিপ্লব প্রচেষ্টার অপ্রকাশিত ইতিহাসের সেটা একটা অঙ্গ।

১৯২০ সালের ডিসেম্বরে খালাস হয়ে রাজসাহী থেকে যেদিন এসে কলকাতায় পৌছাই, সেই রাত্রেই চন্দননগরে যাই পলাতক অতুলদার সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে কুন্তল ও সুরেশ দাস।

অন্য নানা কথার পর অতুলদা একটি কাহিনী বলেন—কিছুকাল আগে থেকে মধ্যবয়স্কা একটি মহিলা গঙ্গার ধারে একখানি বাড়ি ভাড়া নিয়ে ওখানে আছেন। মহিলাটির বাবা কাশ্মীরী পণ্ডিত, মা ফরাসী, স্বামী একজন পাঞ্জাবী ডাক্তার—রেওয়া স্টেটে চাকরি করেন। মহিলাটি ইংরাজী ও উর্দুতে তোড়ের সাথে কথা বলেন, অন্য কি ভাষা জানেন বা না জানেন জানা নেই। নিজের পরিচয় দেন 'ম্যাডাম দাস' বলে। স্বামী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের ভক্ত। মহিলাটি বাংলা দেশে একখানি খবরের কাগজ বের করবেন বলে মালব্যজীর অনুরোধে স্বামীর অনুমতি পেয়ে বাংলায় এসেছেন।

আসলে কিন্তু এঁর মিশন ভিন্ন। রাওলাট রিপোর্টে 'রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র' বলে যে অধ্যায়টি আছে, তার নায়ক ছিলেন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও শেখ-উল-ইসলাম-ই-হিন্দ দেওবন্দের মৌলানা মহম্মদ হাসান একেন্দি। আলী ভ্রাতৃদ্বয়, ডঃ কিচলু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি আরও অনেকে এর ভিতর কাজ করেছিলেন; বিদেশে হেরম্বলাল গুপ্ত, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, এম. এন. রায় প্রভৃতি এঁদের সঙ্গে একযোগে কাজ করছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য এক অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারও গঠন করেছিলেন। তাঁদের তখনকার চেষ্টার ফলে টার্কি থেকে কতকগুলি অস্ত্র ও টাকা এসে জমে আফগানিস্থানে। আমানুল্লা গবর্নমেণ্ট সেগুলিকে দুই রাষ্ট্রের মাঝখানে যেসব উপজাতির দেশ আছে, সেখানে পাঠিয়ে দেন। এখন এইগুলিকে কি ক'রে দেশের ভিতর এনে ফেলা যায় ম্যাডাম দাস সেই চেষ্টায় ব্যাপৃতা।

তাঁর ধারণা, বাঙালী বিপ্লবীরা এই ধরনের কাজ আগে করেছেন, তাঁদের এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে, কাজেই একাজে তাঁদের সাহায্য পেলে বিশেষ সুবিধা হবে। সেই সাহায্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই তিনি বাংলায় আছেন। এখানে তিনি মৌলানা আজাদের নির্দেশমতো কাজ করেন।

দু'একজন মুক্ত রাজবন্দীর সঙ্গে ইতিপূর্বে আলাপ করেছেন, কিন্তু সুবিধা হয়নি। তিনি বলেন, তিনি খুঁজছেন অতুল ঘোষকে ও ভূপেন দত্তকে। শুনেছেন, এরা বিশ্বাসযোগ্য—পলাতক অতুল ঘোষকে পুলিশ বিশেষ ভয় পায়, আর ভূপেন দত্ত ধরা পড়ার পর পুলিশকে বেপরোয়া ধমক-ধামক করেছেন।

অতুলদা দু'একদিন দেখা ক'রে ম্যাডাম দাসের সব কথা জেনে নিয়েছেন। কিন্তু আর বেশী দেখা-সাক্ষাৎ করতে চান না: ম্যাডাম দাস ভালোও হতে পারেন, আবার স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চরও তো হতে পারেন। অতুলদা তখনও

পলাতক, পাঁচ হাজার টাকার হুলিয়া জারি আছে তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁর ধারণা, তাঁরই নাম যে অতুল ঘোষ, সেকথা ম্যাডাম দাস জেনেছেন—যদিও রাতে রাতে দেখা করেন বলে ম্যাডাম দাস তাঁর নাম দিয়েছেন মিঃ ব্যাট।

অতুলদা ম্যাডাম দাসের কাছে আর যাওয়া-আসা করতে চান না। আমরা আলাপ ক'রে যদি ভালো বুঝি, এই ব্যাপার নিয়ে যা খুশি করতে পারি।

ঐ রাত্রেই আলাপ ক'রে স্থির হল, ম্যাডাম দাস কলকাতা এসে মৌলানা আজাদের সঙ্গে আমার ও কুন্তলের আলাপ ক'রে দেবেন। তারপর আমরাই যা হয় করব, ম্যাডাম দাস আর ওর ভিতর থাকবেন না।

তাই হল। ইতিমধ্যে যাদুদা তাঁর পলাতকের আশ্রয়স্থল থেকে একবার এলেন, ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হল। গান্ধীজির সঙ্গে, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে, অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমার যা সব কথা হয়েছিল, সব শুনলেন। আমরা কাজের যে ধারা ধরতে চাই, তাতে অনুমোদন জানালেন। এই ব্যাপারটা সম্পর্কে বললেন, প্রকাণ্ড একটা জাতীয় আন্দোলন এসে পড়েছে, তোমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছ। ঠিক এই রকম বিদেশী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে তোমরা যদি জড়িত হয়ে পড়, সমস্ত আন্দোলনটিরই ক্ষতি হতে পারে। এই অস্ত্র ও টাকার লোভ তোমরা সংবরণ কর এবং মৌলানা আজাদকেও সেই রকম জানিয়ে দাও।

মৌলানা আজাদ ধুরন্ধর লোক। সব শুনে তিনি বললেন, কংগ্রেসের বিশেষ লাইনটি তাঁরাও ধরেছেন, কাজেই স্থির করেছেন, এ ব্যাপার থেকে তাঁরা হাত ধুয়ে ফেলবেন।

কিছুদিনের ভেতরই টের পেলাম, হাত তাঁরা ধুয়ে ফেলেননি। আমরা ও কাজ হাতে নেব না জেনে আর চারটি লোককে লাগিয়েছেন। এঁদেরও নাম বদলে বলছি : ফজলুল করিম, আবদুল গণি, আশুতোষ মিত্র ও মিহির ঘোষ।

মিহির ঘোষের কথা আগে বলেছি। জেল থেকে বেরিয়ে এসে সে যখন আমায় তার জালে ফেলতে চেষ্টা করে তখন দেখি, সবদিক থেকে সে লোকটি জঘন্য প্রকৃতির। তখনকার দিনের খিলাফতের এক আড্ডায় আমায় নিয়ে গেল, দেখালো, হাজার হাজার টাকার খেলা। আর এক জায়গায় দেখলাম, এমনি টাকা সে অবাধে আত্মসাৎ করল। মেয়েদের সঙ্গে ইতর ব্যবহারও চোখে পড়ল। পুলিশের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা আগেই জানি। কাজেই এগিয়ে চলি। ও কিন্তু আমার আশা ছাড়ে না

তখন সে কলকাতায় এক শরবতের দোকান করেছে। মৌলানা আজাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের কথা ও কিছু টের পায়নি। একদিন আমায় ডেকে বাদামের শরবৎ খাওয়াতে খাওয়াতে সীমান্ত প্রদেশের বাইরে জমা অস্ত্রের কাহিনী পাড়ে। কি ক'রে জানল সঠিক জানিনে। পুলিশ থেকেও মৌলানা সাহেবের পেছনে লাগাতে পারে; অথবা অসহযোগের দিনের ছাত্র-ক্ষ্যাপানো বক্তা ফজলুল করিম, আবদুল গণি ও আশুতোষ মিত্রকে একদিকে মৌলানা আজাদের সহকর্মীরা দলে টানতে চেষ্টা করছিলেন, অপর দিকে মিহিরও তার জালে টানছিল। আশুতোষ তো শেষ পর্যন্তই সেই জালে থেকে যায়।

সে যাই হোক, মিহির এখন আমায় বলে, মৌলানা তো প্রথমটা আমায় বিশ্বাস করেননি, পরে জওহরলালের কাছ থেকে পরিচয়-পত্র এনে মৌলানার বিশ্বাসভাজন হয়েছি। এখন আমরা চারজন যাচ্ছি, সীমান্ত প্রদেশের বাইরে অস্ত্র ও টাকা আনার ব্যবস্থা করব।

সর্বনাশ! পাছে কংগ্রেস আন্দোলন আঘাত খায়, এই আশঙ্কায় আমরা এই ব্যাপার থেকে সরে দাঁড়িয়েছি—আর এখন মৌলানা মহম্মদ আলি, শৌকৎ আলি, আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতি মিহির ঘোষের জালে জড়িয়ে পড়ছেন!

কুন্তল ভালো উর্দু বলতে পারতেন, তিনিই মৌলানার কাছে যাওয়া-আসা করতেন। মিহির সম্পর্কে ওকে সাবধান ক'রে দিয়ে এলেন। মৌলানা সাহেব বললেন, এর বিহিত যতটা পারা যায় করবেন।

শুনলাম, ওদের চারজনকে ডেকে তিনি বলেছেন, অস্ত্র আনতে হবেই, সে সব ঠিকই আছে, 'লেকিন' (মৌলানা সাহেবের প্রসিদ্ধ 'লেকিন') অস্ত্র এনে তো জমিয়ে রাখা চলবে না। আমাদের এমন দল নেই, যার ভিতর আসামাত্র অস্ত্র ছড়িয়ে দেওয়া চলে। আপনারা চারজন বেরিয়ে বাংলায়, বিশেষ ক'রে পূর্ব বাংলায় দল গড়ুন, তার পর অস্ত্র আনতে যাবেন।

ফজলুল করিমকে কিন্তু আলাদা ক'রে ডেকে মৌলানা সাহেব আলাদা কথা বলেন। ফলে, অপর তিনজন পূর্ববঙ্গে রওনা হয়ে যায়, ফজলুল করিম কলকাতায়ই রয়ে যায়। মিহিরও কম যায় না! সে ফজলুল করিমের গতি-বিধির খবর পাবার ব্যবস্থা রেখে পূর্ববঙ্গে যায়।

খবর পেয়ে মিহির যেদিন বিক্রমপুর থেকে কলকাতায় এসে পৌছাল, ফজলুল করিম সেই দিনই বা তার আগের দিন পেশোয়ার রওনা হয়ে গেছে। পুলিশে খবর পৌছে গেল।

এই পর্যন্ত খবর আগেই জানতাম। এখন কুমার ও জয়নারায়ণের গল্পের ভিতর থেকে খবর পেলাম, ওরাই যায় ফজলুল করিমের পেছনে পেছনে। তারপর সীমান্ত প্রদেশের পুলিশ ও মিলিটারীর সাহায্য নিয়ে যেখানে সেই অস্ত্র ও টাকা ছিল, সেইখানে ঐ সব সমেত ফজলুল করিমকে ধরে। ফজলুল করিম যা-কিছু জানত সব বলে দেয়। ফলে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ-বক্তৃতার একটা মামলা ছিল তাও তুলে নেওয়া হয়।

এই অস্ত্রের কিছু অংশ একটি দু'টি ক'রে এর-ওর মারফত বাংলায় আগে এসে পৌছে গিয়েছিল। ময়মনসিংয়ের আমাদের সহকর্মী পৃথ্বীশ বোসের হাতে কয়েকটা পড়ে এবং খুলনার সৈয়দ জালালুদ্দিন হাশেমী ও অন্য দু'একজন খিলাফৎ কর্মীর হাতে কিছু।

গল্পটা শোনার আমার প্রয়োজন ছিল। শোনবার জন্যে অন্যমনস্কতা বা ঘুমের ভানও করতে হচ্ছিল। কিন্তু নিশ্চিন্তে গল্প শুনেই জাহাজের দিন কাটছিল না। বিড়াল ছানা পার করার মতো চুপিচুপি বস্তা ভর্তি করে বর্মায় নিয়ে চলেছে। পুলিশের খবরদারি যতই থাক, খবরটা দেশকে ও দুনিয়াকে জানাতে হবেই।

জাহাজের বেতার বিভাগে কাজ করে, এমন একটি ছেলেকে পাওয়া গেল। তার উত্তরপাড়ায় বাড়ি; আলাপে জানতে পারলাম, উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠে এক-আধবার গেছে। আমাদের যে কোনো কাজ করতে পেলে খুশি হয়। কিন্তু এক কথায় তো কাজ নয়। আমাদের ছ'জনারই নাম-পরিচয় মুখস্ত করিয়ে দিতে হবে, রেঙ্গুনে কাকে কি বলতে হবে, এ সব শেখাতে সময় লাগে। জীবন ও আমি ফাঁকে ফাঁকে ধরি। ভুজেন সরকার পিছু ছাড়ে না। দেখছে, ঘুরে-ফিরে হয় ছেলেটি আমাদের কাছে আসছে, না হয় আমরা কেউ ওর কাছে যাচ্ছি। গোড়া থেকেই দেখছে, আমাদের বলে কোনো লাভ নেই। তখন ছেলেটিকে এক ফাঁকে ধরে বলেছে, 'সাবধান, এরা স্টেট প্রিজনার, আমরা আই. বি। এদের সঙ্গে যদি কথা বলেন, আমরা রিপোর্ট করলে আপনার চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে। ছেলেটি কথাটা আমাদের এক ফাঁকে জানাল। আমরাই তখন ওর থেকে দূরে দূরে থাকি। আমাদের জন্যে বেচারীর কেন অনিষ্ট হয়?

এরপর খুঁজে বের করা গেল আর একটি ছেলেকে। ভবানীপুরে বাড়ি। আই. এ পড়তে পড়তে অসহযোগ আন্দোলনের ভিতর পড়া ছেড়ে দিয়েছে। সুভাষের বাড়িতে আনাগোনা ছিল। এখন বর্মায় এক আত্মীয়ের কাছে বেড়াতে যাচ্ছে।

ভুজেন একেও ধমক-ধামক দিয়ে দমিয়ে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এ তো চাকরি করে না—বাটপাড়ের ভয় বিশেষ কাজে লাগল না। সবাই মিলে ছেলেটিকে সাথে নিয়ে ডেক-চেয়ারে বসা গেল। পূর্ণদা রীতিমতো বক্তৃতা দিয়ে আমাদের এক-একজনের নাম পাঁচবার সাতবার বলে বলে ওকে মুখস্থ করিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন, এবং প্রত্যেকের প্রায় জীবনের ইতিহাস বলে দিলেন। এ সব হল তিনটি আই. বি অফিসারেরই সামনে। কেবল গোপনে বলে দেওয়া হল—অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী তখন 'রেঙ্গুন মেল' কাগজের সম্পাদক—রেঙ্গুনে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আমাদের কথা সব তাঁকে জানাবে।

এত নাম-পরিচয় ছেলেটির মনে না-ও থাকতে পারে। পায়খানায় বসে টয়লেট পেপারে সব লেখা হল, বাথরুমের দরজায় ওর হাতে দিয়ে মোড় ঘুরতেই দেখি, ভুজেন সামনে। ছেলেটিরও পায়খানায় ঢুকে পড়তে দেরি হয়নি। ভুজেন দেখতে কিছু পায়নি, কিন্তু সন্দেহ করেছে। পেছনে পেছনে ঘুরে ক্রমাগত সওয়াল জবাব—কিছু লাভ হল না। আমরা রেঙ্গুন শহর ছাড়তেই না ছাড়তেই 'রেঙ্গুন মেল'-এর বিশেষ সংস্করণে বাঙালী রাজবন্দীদের গোপনে বর্মায় পাঠাবার খবর বেরিয়ে গেল—সব নাম-পরিচয় সহ। তবে বর্মার কোন্ জেলে কে গেল, তা বের হতে কয়েকদিন সময় লাগল।

সমুদ্রের উপর দ্বিতীয় দিনটি বেশ কাটল। বিকালের দিকটায় মেঘ ক'রে অন্ধকার হয়ে এল। সন্ধ্যা হতে না হতে সব কেবিনে ঢুকে পড়লাম। অনেক রাত্রে খুব ঝড় উঠল, জাহাজে সাইক্লোনের ঘণ্টিও বাজিয়ে দিল। একবার বাইরেটা দেখে এলাম। ডেকের উপর দিয়ে এদিকের ঢেউ ওদিকে ভেঙে গড়িয়ে পড়ছে, জাহাজ যেন ডুব সাঁতার দিয়ে এগিয়ে চলেছে। অনেকের বমি হল। আর বিশেষ কিছু নয়।

পরদিন খবর শুনলাম, আমাদের বই-কাপড়ের বাক্স সব ডেকের উপর ছেড়ে রেখেই পুলিশ-পুঙ্গবরা কর্তব্য সাধন করেছেন নিজ নিজ লোটাকম্বল নিয়ে সরে পড়ে। নোনাজলে বই-কাপড়গুলো শেষ হবে—hurricane deck-এ উঠে ওগুলোকে শুকিয়ে নেওয়া গেল।

বিকালের দিকে আবার মেঘ আর আঁধার জমল। জীবন আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কালো কালো ঢেউগুলো দেখছি, আর বন্ধু-বান্ধবের সম্বন্ধে অস্ফুটে দু'একটা কথা বলছি বা শুনছি। কুমার মজুমদার সাহিত্যচর্চার খাতা গুটিয়ে পাশে এসে দাঁড়াল। জীবনের উৎকণ্ঠা কানায় কানায় ভরে উঠেছিল আমার

উৎকণ্ঠার সাথে মিলে; শুধু নিজের হলে হয়তো চুপ করেই সয়ে যেতে পারতেন।

কুমার এসে একটু সহানুভূতির সুরে আলাপ জমাতে চেষ্টা করে: জেলেই তো বন্ধ করে রেখেছে, আবার পাঠিয়ে দিচ্ছে কোন্ বিদেশ-বিভুঁইয়ে, কালে-ভদ্রেও একবার আপনার জন কারও সঙ্গে দেখা হবে না।

জীবন বলেন, তার জন্যে ভাবছি নে। ভাবছি, একটি বন্ধুর কথা, বহুমাস হয় চিঠি পাইনে, চারু ঘোষ দীর্ঘকাল যাবৎ থাইসিসে ভুগছিলেন, ভাওয়ালিতে ছিলেন···

সম্প্রতি মারা গেছেন—এইতো? বলল কুমার।

মারা গেছেন?

আমি ঠিক বলতে পারি নে, আমার ভালো মনে নেই, কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে মনে হয় এই রকম কার একজনের কথা পড়েছিলাম। নামটা আমার ঠিক মনে নেই।

বুঝলাম সবই।

দাঁড়িয়েই রইলাম। জীবনও একটি কথা না বলে আমার হাতখানা ধরে দাঁড়িয়ে রইল—কতক্ষণ তা খেয়াল নেই।

সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গর্জন ও একটা গভীর নিস্তব্ধতা। আর সব নীরব আঁধার। রাত হয়ে গেছে। জীবন টেনে নিয়ে আসে কেবিনের দিকে। চলতে চলতে অনেক কাল আগের পড়া একটা কবিতার একটুকরো মনটা অকস্মাৎ আওড়াতে শুরু করল—

···Comes he thus, my friend?
Is this the end of all my care?
And circle moaning in the air
'Is this the end? Is this the end?'

রোজ রাত ভোর হয়। আজও হল।

রেঙ্গুনের ঘাট।

বর্মার আই. বি-র ছোটকর্তা যোগেন ভট্টাচার্য ঘাটে হাজির। আমাদের চার্জ বুঝে নিল। জিজ্ঞেস করে, ভূপেনবাবু কে?

আমি।

আপনি আর সতীশবাবু একসঙ্গে ছিলেন তো?

হাঁ।

কিন্তু এখন আপনি আর জীবনবাবু একসঙ্গে যাবেন।

কি হল আবার?

পরে আমরা টেলিগ্রাম পেয়েছি, আপনাকে আর সতীশবাবুকে একসঙ্গে রাখা চলবে না।

কে কোথায় যাব, এখনও বুঝলাম না, তবে এটুকু বুঝলাম, এই সুদূর বর্মামুলুকেও আমরা দুজনের বেশী একসঙ্গে বা এক জেলে থাকতে পাব না।

একখানি মোটর লঞ্চ এসে পাশে ভিড়ল। আমাকে আর জীবনকে তাতে তুলে দেওয়া হল। এখন সঙ্গী হল বর্মার পুলিশ। এতক্ষণ যা গোপন ছিল, আমাদের নিয়ে চলেছে যে এ্যাংলো-বার্মিজ রিজার্ভ ইনস্পেক্টরটি, সে তা খোলাখুলি বলে দিল—আমরা দু'জন যাচ্ছি বেসিন সেণ্ট্রাল জেলে। এখনি আর একখানা লঞ্চ ছাড়বে, তাতে যাবেন সতীশদা আর জ্যোতিষবাবু থেইটমিও সেণ্ট্রাল জেলে। পূর্ণদা আর বিপিনবাবু সারাদিন জাহাজেই কাটাবেন। সন্ধ্যায় ট্রেন ছাড়বে, সেই ট্রেনে তাঁরা যাবেন মৌলমিন ডিস্ট্রিক্ট জেলে।

এই ইনস্পেক্টরটি ছাড়া আর ছিল কয়েকটি গাড়োয়ালী পুলিশ আমাদের পাহারায়—যেমন বুদ্ধিমান এরা, তেমনি চমৎকার এদের ব্যবহার। নিজেদের নোকরিকে এরা ঘৃণা করে—বোঝে, নিজেদের দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ ক'রে পেটের খোরাক জোটাচ্ছে। যতবারই গাড়োয়ালী পুলিশের সাথে চলেছি, দেখেছি যেন এরা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ছোটখাটো কাজে আমাদের সাহায্য করে।

এর ঠিক বিপরীত ছিল আমাদের এ-যাত্রার পাচকটি। এ এক অভিনব পাচক—এমনকি, আমাদের রাজবন্দী জীবনের এত বছরের সামগ্রিক অভিজ্ঞতায়ও।

আমরা বিশিষ্ট কয়েকটি বাঙালী আসছি, পথে রেঁধে খাওয়াবার জন্য একজন পাচকের প্রয়োজন। প্রতিবেশীর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল—যোগেন ভট্টাচার্যের অনুরোধে সেই প্রতিবেশীই একে বলেছে আমাদের সঙ্গে আসতে। এই পরিচয় প্রথমটায় দিল আই. বি-র এই এ্যাসিস্টাণ্ট সাব-ইনস্পেক্টরটি। রিজার্ভ ইনস্পেক্টরটি বোধ হয় অতশত জানে না। আমাদের বলে, দেখুন, ও আপনাদের রেঁধে খাওয়াবে, যদি ভালো না রাঁধতে পারে, লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবেন,

আমি অন্য পাচক যোগাড় ক'রে দেব। আই. বি-র লোকটি অপমানটুকু অম্লান বদনে হজম করল। যদিও ভাদুড়ী নামক এই জীবটি যোগেন ভট্টাচার্যের ভাগ্‌নে।

সারাদিন কিন্তু ওর আই. বি পরিচয় আমাদের কাছে গোপনই রাখল। জীবন আর আমি অবিশ্যি বুঝে নিয়েছিলাম, কোন্ ধরনের একটি শিক্ষিত বাঙালী যুবককে যোগেন ভট্টাচার্য আমাদের সঙ্গে পাচক ক'রে পাঠাতে পারে।

দক্ষিণ বর্মার নদীনালা জঙ্গল সুন্দরবনের মতো এবং সুন্দরবনের মতোই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। ইনস্পেক্টর এবং লঞ্চের মাঝিরা বলল, রাত হবার আগেই খেয়ে নেবেন, তা না হলে এত পোকা হবে যে খেতে পারবেন না। আমরা কিন্তু খেতে বসলাম সন্ধ্যার পর। চারদিকের কাঁচের জানালা-দরজা বন্ধ ক'রে ভিতরের আলো খুলল। খাবার পর বেরিয়ে এসে দেখি ইঞ্চি-দুয়েক পুরু হয়ে চারপাশে পোকা জমেছে। তেমনি মশার উপদ্রব। বোধহয় ছদ্মবেশ পূর্ণাঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে ভট্টাচার্য ভাগনেকে বিছানা-মশারি পর্যন্ত আনতে দেয়নি। আমি আর জীবন একটা বিছানা খুলে দু'জনে শুয়ে পড়লাম, ওকে আর একটা বিছানা দিলাম। এটা ও ভাবতে পারেনি। এর পর সামান্য জেরাতেই রাতের অন্ধকারে ওর ছদ্মবেশ খুলে গেল, স্বীকার ক'রে ফেলল, ও মামারই অনুচর, তবে এখনও নভিশ। সে যে পেকে এ্যাসিস্টান্ট সাব-ইনস্পেক্টর হয়েছে, এ স্বীকৃতি পাই আরও কয়েক মাস পরে।

পরের দিন রাত্রিটাও লঞ্চেই কাটল। পথে তাজা মাছ কিনতে গিয়ে দেখলাম, এ-অঞ্চলের অধিকাংশ জেলে এসেছে পাবনা জেলা থেকে। পরদিন ভোরে বেসিনের ঘাটে আমাদের অভ্যর্থনা করল ওখানকার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গ্রাণ্টহাম।

আলাপ-পরিচয় উপলক্ষে বলল, Many years ago I had the honour to escort the great Tilak from Rangoon to Mandalay.

আমাদের জেলে পৌঁছে দিয়ে করমর্দন ক'রে বিদায় নিল।

জেলের ভিতর কোথায় থাকব, সাধারণতঃ আগে থেকেই স্থান নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। বেসিনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এক প্রান্তে দশটি সেল—সামনে অ্যান্টিসেল আছে, তারও সামনে আছে মস্ত বড় একটা দোতলা ব্যারাকের একটি সু-উচ্চ দেওয়ালের জানালা-দরজাহীন নীরেট দিক—আলো-বাতাসের প্রতি একটি প্রচণ্ড 'প্রবেশ নিষেধ' আদেশ।

সেই-ইয়ার্ডে ঢুকেই যাঁকে দেখলাম, তিনি ছিলেন সেই দিন পর্যন্ত ঐ দশটি সেলের সারা দিন-রাতের একমাত্র অধিবাসী। রাত্রে অবশ্য অন্য কয়েদীও এনে এখানে বন্ধ করা হয়, ভোরেই তারা চলে যায়।

এই বন্দীটির নাম স নে ডুন। বর্মার রাজাদের ভিতর বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল। ১৮৮৫ সালে যখন রাজা থিবকে পরাজিত ক'রে ইংরেজ সমস্ত বর্মা অধিকার করে, তখন বর্মার ঐসব রানীর গর্ভজাত পুত্র বা তাঁদের পুত্র, প্রপৌত্র অনেকে বর্মার বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছুকাল যাবৎ ইংরেজের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালান। ক্রমে পরাজিত হয়ে অনেকে বন্দী বা মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেউ কেউ শান রাজ্যের পথে চীনে চলে যান। এমনি এক রাজপুত্র স নে ডুনের পিতা।

বর্মার শান রাজ্যগুলির পূর্বদিকে চীনের ভিতরও কতকগুলি ছোট-বড়ো শান রাজ্য আছে। এরই কয়েকজন শান রাজা স নে ডুনের পিতাকে আশ্রয় দেন। স নে ডুনরা চার ভাই। তার ভিতর তিনি পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এবং সেখানে সামরিক শিক্ষাও গ্রহণ করেন। পরে ইন্ কু টি নামে একজন ধনাঢ্য চীনা বন্ধু ও কয়েকজন শান রাজার সাহায্যে স নে ডুন দশ হাজার রাইফেল সংগ্রহ করেন। চীন ও বর্মা উভয় দিকের শানদের মধ্যে অনেককে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেন। এ-কাজে বর্মার কোনো কোনো শান রাজাও

তাঁকে গোপনে সাহায্য করেন। পরে ১৯২৩ সালে স নে ডুন বর্মা আক্রমণ ক'রে ভামোর একাংশ অধিকার করেন। ভামোর ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ প্রথম আক্রমণে হটে গিয়ে সাদা নিশান উড়িয়ে দেয়। যুদ্ধবিরতির পর জিজ্ঞেস করে, আপনারা কেন আক্রমণ করেছেন? কি চান আপনারা? স নে ডুন বলেন, বর্মা আমাদের রাজ্য, আমরা তা ফিরিয়ে চাই।

ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ বলে, আপনাদের রাজ্য আপনারা ফিরে চান, সে তো স্বাভাবিক, কিন্তু এতে তো আমার এখতিয়ার নেই, এমন কি বর্মার প্রাদেশিক সরকারেরও না, ভারত গবর্নমেণ্টের অনুমতি প্রয়োজন। আশা করি, ভারত গভর্নমেণ্ট আপনাদের সঙ্গত দাবিতে আপত্তি করবে না। কিন্তু এর জন্য তো সময়ের প্রয়োজন।

কত সময়?

এক সপ্তাহ।

স নে ডুনের ছোট ভাই সঙ্গে ছিলেন। তিনি ও ইন্ কু টি সময় দিতে নারাজ। তাঁরা বলেন, ইংরেজ জাত খল। ওদের বিশ্বাস করবে না।

স নে ডুন বলেন, ইংরেজের ধর্ম ইংরেজের, আমাদের ধর্ম আমাদের। শান্তি ভিক্ষা ক'রে যদি সে শঠতা করে, আমি তাতে ঠকব না।

স নে ডুন সময় দিলেন। তাঁকে এই প্রাচ্য সততার খেশারত দিতে হল। সাত দিনের ভিতর ইংরেজের প্রচুর সৈন্য এসে পড়ল। তবু স নে ডুনের সৈন্যদলের প্রথম আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে ইংরেজকে বেগ পেতে হয়েছিল। পরে তিনি পরাজিত হয়ে ইংরেজের হাতে বন্দী হন। প্রথম বিচারে ফাঁসির হুকুম হয়। হাইকোর্ট থেকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। ইন্ কু টি'রও সেই সাজা হয়। ভাই পালিয়ে যান। কিন্তু পরে আবার শান রাজ্যে বিদ্রোহের আয়োজন করতে গিয়ে প্রচুর অর্থসহ ধরা পড়েন। রাজবন্দী হয়ে ইনি ছিলেন মিনজান জেলে এবং ইন কু টি তখন পর্যন্ত মান্দালে জেলে।

স নে ডুন সাধারণ কয়েদীর অশন-বসনের বেশি কিছু পাননি। বেসিন জেলের সমস্ত সাধারণ কয়েদীই তাঁর দুঃখে চোখের জল ফেলত। তখন পর্যন্ত কোনো রাজবংশীয়ের প্রতি এবং ফুঙির (ভিক্ষু) প্রতি বর্মার সাধারণ লোকের এই শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ছিল।

কর্নেল ন্যাপ তখন বর্মার ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ প্রিজন্স্। একবার বেসিন জেলে এলে স নে ডুন তাকে বলেন, গত বিশ্বযুদ্ধে কাইজার যদি তোমার দেশের

রাজাকে বন্দী করত, আর তার পর—আমি যে ব্যবহার পাচ্ছি, তা-ই যদি তিনি পেতেন—তোমার কেমন লাগত শুনি ?

ন্যাপ জিজ্ঞেস করে, কি আপনার অভাব-অভিযোগ আছে ?

স নে ডুন সেলবাস, আহার্য, বস্ত্র, বিছানা সব কিছুর কথা বলতে বলতে রাগের মাথায় নারকেল ছোবড়ার বালিশ নামক বস্তুটি ন্যাপের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দেন।

ইংরেজ জাতের পরদুঃখকাতর আর কল্পনাপ্রবণ হৃদয় নিয়ে কর্নেল ন্যাপ হুকুম দিয়ে গেল—এঁকে তুলোর বালিশ একটা দিও, কিন্তু কখনও অন্য কয়েদীদের সঙ্গে মিশতে দিও না।

স নে ডুনও সাধারণ অপরাধীদের সহিত একসঙ্গে থাকার কামনা করতেন না। কাজেই ঐ সেলগুলিতেই ছিলেন—যা আমরা এখন গিয়ে ওঁর কাছ থেকে কেড়েই নিলাম বলতে হবে। আমরা পৌছাবার আগেই ওঁর জন্য জেলের অন্য এক অংশে আর একটা সেল ঠিক ক'রে রেখেছিল। সেখানে উনি সেলেই থাকতেন, কিন্তু অন্য কয়েদীদের সঙ্গে সারাদিন একত্রে।

তিন বৎসর বাদে আর একবার আমি বেসিন জেলে যাই। তখন স নে ডুনের আর সে-চেহারা নেই। সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে থাকতে সে-আপত্তিও আর নেই। তাঁর ঐ শিক্ষিত মনও যেন মরে গেছে—সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে বাইরে থেকে গোপনে সংগ্রহ করা চুরুট-তামাকও খান। জেলের আবহাওয়ায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত শক্ত। এই দ্বিতীয়বারে স নে ডুনের সঙ্গে যখন-তখন গল্প করার সুযোগ ক'রে নিয়েছিলাম। কথা বলতে গিয়ে কোথায় যেন খচ্‌খচ ক'রে বিঁধত। মনে হতো, ওর এই দশার জন্যে আমরাই যেন দায়ী।

বেসিন জেলের সেলের চেহারা দেখেই তো আমার মুখ শুকিয়ে গেল। এক নিদারুণ ব্যাধির সর্বনাশ তখন মনটা জুড়ে থাঁথাঁ করছে। জীবনও ১৯১৬ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত যখন জেলে ছিলেন, থাইসিস্ সন্দেহে তাঁর তখন চিকিৎসা হয়েছে।

নাইকার নামে একটি ডেপুটি জেলার ছিল, এ ছাড়া আর যে-কয়জন অফিসারকে বেসিনে পেলাম—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রথম মাসখানেক কর্নেল ফুলার গুড, পরে মেজর স্কট, চীফ জেলার ভগবান সিং, আমাদের চার্জে জেলার একটি ইউরো-এশিয়ান, ডি কাস্ট্রো, দু'টি মাদ্রাজী ডাক্তার ডঃ ড্রাভিয়াম ও ডঃ পি কে কে নায়ার—সব কয়জনই অত্যন্ত ভদ্র।

কর্নেল ফুলার গুডকে জীবনের স্বাস্থ্যের ইতিহাস জানিয়ে বললাম, সেল-বাস পোষাবে না। বললেন, তাঁর হাত বাঁধা, ওঁর ও-জেলে অন্য কোনোরকম বাসস্থানও নেই। জীবনের স্বাস্থ্যও পরীক্ষা করলেন, আপাততঃ ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু ও-ব্যাধির ভয়ের কিছু যখন না থাকে তখনও আশঙ্কা মেটে না। গবর্নমেণ্টের সঙ্গে লেখালিখি শুরু করলাম।

জুন মাস। বেসিনে দিবারাত্রি মুষলধারে বৃষ্টি। ঘরের বের হবার উপায় নেই। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাঁশের ফ্রেমের উপর পুরানো খবরের কাগজ চাপিয়ে প্রকাণ্ড এক ছাতা তৈরি করালেন, ছাতার উপর ক্রুড অয়েল মাখিয়ে দেওয়া হল। সেলের সামনে সেল-ইয়ার্ডে সেই ছাতা বসিয়ে দেওয়া হল। আমরা দুজন তার তলায় দু'খানা ডেক চেয়ারে বসে বসে দিন কাটাতাম। পড়বার বইয়ের ভিতর ডেপুটি কমিশনারের কাছে পেলাম Sir George Scott-এর *Burma* আর দু'চার-খানা *Gazetteer*, অধিকাংশ সময় গল্প ক'রে কাটতো। মাঝে মাঝে ডি কাস্ট্রো ও ডাক্তার দু'টি আসতেন, তাঁদের সঙ্গে তাস খেলা হতো—জীবন তার সঙ্গে চা এবং এমন ভারি 'টা'য়ের ব্যবস্থা করতেন যে অনেক দিনই সন্ধ্যাবেলায় বন্ধ হবার সময় দেখা যেত, নিজেদের খাবার মতো খুব কমই আছে। উৎকলী পাচক যোগিয়া শুষ্ক মুখে এসে জানাত, জীবন আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসতেন, আমি জীবনের মুখের দিকে চেয়ে হাসতাম, তারপর মুখহাত ধুয়ে বন্ধ হতে যেতাম।

সকাল-বিকাল যেদিন বৃষ্টি একটু কম থাকত ডি কাস্ট্রো আমাদের জেলের workshop-এর এক প্রান্তে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। টিপটাপ বৃষ্টি হয়তো পড়ছে, শুধু ঘরের বার হওয়াই হতো, বেড়ানো আর হতো না, হয়তো একটা আতাগাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প হতো। বর্মার কয়েদীদের বুদ্ধির তারিফ করতেন। কি ক'রে কাক ধরে, চড়ুই ধরে গোপনে কয়েদীরা রেঁধে খায়, তার কাহিনী সব শুনতাম। চড়ুই ধরবার ফাঁদ দেখলাম। জমির থেকে দু'তিন আঙুল উঁচু ক'রে পাশাপাশি দু'টি খুঁটি পোতা রয়েছে—একখানা লম্বা বাখারি তার একটির সঙ্গে বেঁধে অপর খুঁটিটার গায়ে লাগিয়ে বেঁকিয়ে ধনুকের মতো ক'রে নিয়ে সেই বাখারির অপর মাথায় একটা লম্বা রশি কোনো কিছুর সঙ্গে আলগোছে বেঁধে রাখে। তারপর সেই ধনুকের সামনে ভাত ছড়িয়ে দেয়। যখন বিশ-পঞ্চাশটা চড়ুই এসে ভাত খেতে বসে, দূর থেকে রশির প্রান্তের গিট আস্তে খুলে দেয়, বাখারির ঘায়ে দশটা-পনেরোটা চড়ুই একসঙ্গে পড়ে যায়।

সেল-বাস ঘোচাবার উদ্দেশ্যে বর্মা সরকারের সঙ্গে লেখালিখির কথা বলেছি। একটা জবাব এল, বেশ ভদ্র ভাষায় আমাদের জানিয়ে দেওয়া হল, বর্মার জেলে ঘরবাড়ি এমনভাবে তৈরী যে, আমরা যে রকম থাকবার জায়গা চাই, সে-রকম জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়।

এক বারেই কিছু হবে না, সে তো জানা কথা—সরকারের সাথে কারবারে অধ্যবসায় চাই। দু'চারদিন পর পরই দরখাস্ত যেতে থাকলো। ফলে বেসিনে তিনমাসও পুরো থাকতে হয়নি। একদিন চীফ জেলার ভগবান সিং গোপনে এসে জানিয়ে গেলেন, আমাদের মান্দালে জেলে বদলীর হুকুম এসেছে। তিলক, লাজপৎ রায়, অজিত সিং নামের সঙ্গে মান্দালের নামটা জড়িত। মনে মনে গৌরব ও আনন্দ অনুভব করলাম অনেকখানি।

কিন্তু এর ভিতর আর এক নতুন ইতিহাস শুরু হল—যার ভূত আমার কাঁধে চেপে রইল বর্মা প্রবাসের তিনটি বছর ধরে।

বিলাতে প্রথম লেবার গবর্নমেণ্ট হল ১৯২৪ সালে। সমস্ত ভারতবর্ষ বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। মধ্যপন্থী রাজনৈতিকদের গ্রীবা আশায় উর্ধ্বদিকে উঠল। শিকে বুঝি ছেঁড়ে! শিকে ছিঁড়ে মাছ পড়বে, সে-আশা আমরা জেলে বসে করিনি। তবে এক-আধখানা আঁশ খসে পড়লেও পড়তে পারে।

কি অবস্থায়, কি কারণে, কি উদ্দেশ্যে ১৯২৩ সালে আমাদের ধরে, সে-কাহিনী আগে বলেছি। মিহির ঘোষকে দিয়ে ইংরেজের পুলিশ ভারতবর্ষে এক নতুন খেলা শুরু করল—যা রুশিয়াতে জারের পুলিশ করেছিল আজেভকে দিয়ে। জারের পুলিশ ঐ খেলা শেষ পর্যন্ত খেলেছে। ইংরেজও কেন খেলবে না, তার কোনো হেতু নেই। খেলুক, কিন্তু—আমি একদিন জীবনকে বললাম—এস, আমরা এটা বিলাতের লেবার গবর্নমেণ্টকে জানিয়ে দিই। ইংরেজ সরকারের ভদ্রতার মুখোশও খুলে দেওয়া দরকার, আমাদের মতো দেশী ভদ্রলোকদেরও ইংরেজের অন্যায় আচরণের অক্ষমতায় আস্থা নষ্ট করা দরকার।

জীবনের উৎসাহ ধরে না। জীবনকে বলে আমি দু'একদিন ধরে ভাবছি, কি লিখব, কি ভাবে লিখব। ভাবতে ভাবতে আমার উৎসাহ ক্রমে ঢিমে হয়ে এসেছে। কিন্তু যা একবার ভালো কাজ বলে মনে হয়েছে, সে কাজের উৎসাহে ভাঁটা পড়তে দিলে জীবন চ্যাটার্জি জীবন চ্যাটার্জিই হতেন না। এমন তাগিদ শুরু ক'রে দিলেন যে, একদিন তো ঝগড়াই ক'রে ফেললাম।

তারপর লিখতে বসলাম। দিনের বেলায় লেখা চলে না—কে এসে দেখে ফেলে ; মস্ত লেখা—রাত্রে রাত্রে লিখে শেষ করলাম।

কিন্তু লিখলে কি হবে? সরকারী কর্মচারীদের হাতে যা দেওয়া হবে, তা বিলেত তো দূরের কথা, দিল্লী-সিমলা পর্যন্তই পৌছায় কিনা কে জানে?—যদিও আইনে আছে ৩নং রেগুলেশনের বন্দীদের দরখাস্ত কেউ কোথাও আটক করতে পারবে না।

আসল কাজ যা, তা হল, যা লিখে পাঠাব তা কোনো গতিকে খবরের কাগজে বের ক'রে দিতে হবে। রোজ এত লুচি-মাংস খাওয়ানো হচ্ছে ডাক্তারদের। প্রথম আশা করা গিয়েছিল তাদের দিয়েই হয়তো কাজটা হয়ে যাবে। ডাঃ ড্রাভিয়ামকে নিয়ে পড়লাম আমি, ডাঃ নায়ারকে নিয়ে জীবন। ডাঃ ড্রাভিয়াম ক্রীশ্চিয়ান, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের প্রগাঢ় ভক্ত। এঁরা এক ধরনের নীতিকে অনুসরণ করেন—যার অর্থ দাঁড়ায় ভারতবর্ষের মাটির রস খাবার আগে এঁরা ইংরেজের নুন খেয়েছেন। তবে ইনি তার ভিতর চরিত্রের পরিচয় দিয়েছিলেন। সব সরকারী চাকরই চাকরিতে ঢোকবার দিন থেকে বলে, এ ভালো লাগে না, ছেড়ে দেব। এই কথা মুখে নিয়ে শেষ দিন পর্যন্তও কিন্তু চাকরিই করে। নিঃসন্তান ডাঃ ড্রাভিয়াম আমাদের বলেছিলেন, নিজের ডিসপেন্সারী করার মতো টাকা হাতে হলেই চাকরি ছেড়ে দেবেন। আমরা বর্মায় থাকতে থাকতেই ইনি চাকরি ছেড়ে হেনজাদা জেলায় জালুন বলে একটা জায়গায় প্র্যাক্‌টিস শুরু করেন। পরে ইনি বর্মার বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিলেন বলে শুনেছি।

ডাঃ নায়ার বর্মার প্রায় সব অবিবাহিত ভারতীয়দের মতোই স্ফূর্তিতে জীবন কাটান। তিনি কোনো ঝামেলার ভিতর যেতে রাজী হলেন না।

আমরা হাল ছাড়িনি। চীফ জেলারকে বলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি নিয়ে রোজ রাত্রে রাত্রে অফিসের টাইপরাইটার আনানো হতো। জীবন একটা একটা ক'রে হরফ ধরে ধরে ২৪ পৃষ্ঠায় সমস্তটা নকল করলেন কয়েক দিন ধরে। একটা নকল রেখে দেওয়া হয়েছিল যদি ডাক্তারদের দিয়ে পাঠানো যায়।

তা যখন গেল না, তখন ভিজিটিং কার্ডের চেয়ে একটু বড়ো সাইজের টুকরো কাগজে ইংরেজি ছাপার অক্ষরে সমস্তটা পেনসিলে নকল ক'রে ফেললাম। শরৎবাবুর 'বিরাজ বৌ'-এর হিন্দী সংস্করণ একখানা আমাদের কাছে ছিল। বইখানার মাঝখান থেকে অনেকগুলো পাতা ঠিক ঐ সাইজেই কেটে ফেলে

একটা পকেট সৃষ্টি করা হল, তার ভিতর ঐ টুকরো কাগজগুলো পুরে দিয়ে সমস্তটাকে একটা বুকপ্যাকেট ক'রে বাঁধা হল। একজন সিপাই রেঙ্গুন যাচ্ছিল, তাকে কিছু কাপড়-জামা বক্‌শিশ দিয়ে প্যাকেটটা তাকে দিয়ে দেওয়া হল হেনজাদায় ডাকবাক্সে ফেলবার জন্য। উপরে ঠিকানা দেওয়া রইল বিক্রমপুরের পল্লীগ্রামের কোনো বৃদ্ধ ভদ্রলোকের—জীবনের পরিচিত। তিনি ঐ লেখাটা লোক মারফত কলকাতায় দেশবন্ধুকে পাঠিয়ে দেবেন।

কয়েক মাস আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। ইতিমধ্যে আমাদের ঐ সব দরখাস্তের ফলে মান্দালে জেলে বদলী হয়েছি। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্যাপ্টেন স্মিথ, চীফ জেলার মিঃ রিচার্ডস্‌ শুধু ব্যবহারে নয়, আসলেই খুব ভদ্র। আমাদের চার্জে প্রথম ছিল লেটন বলে একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান জেলার। দৈনিক খাবার খরচ দুজনের ৪৲ টাকার ভিতর ৩৲ টাকাই চুরি ক'রে আমাদের সে খাওয়াতো পোড়া ডাল আর ভাত। একদিন তো জীবন ডালের বাটি ছুঁড়ে মারলেন, মুখে আর কোটে ডালমাখা হয়ে লেটন বেরিয়ে গেল। তার জায়গায় এলেন একজন বর্মী জেলার মং বা শীন। বন্ধুত্ব যার সঙ্গে হয় বর্মীরা এক কথায় তার জন্যে প্রাণ দিতে পারে। এই ভদ্রলোক খাঁটি বর্মী এবং আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বও হল প্রগাঢ়। ভদ্রলোকের দুর্ভাগ্য—কানে শুনতে পান অতি কষ্টে।

জেলখানার কর্মচারীদের, সিপাইদের খাইয়ে-দাইয়ে আমরা অনেক সময় অনেক কাজ করিয়ে নিতাম বটে, কিন্তু খাওয়ানো-দাওয়ানোটা ওখানে নিজেদের প্রাণের প্রয়োজনে। আর জীবন যখন ছিলেন, এদিকটায় কখনও ত্রুটি হতো না। পাশের ইয়ার্ড থেকে মান্দালে হাঙ্গামার একজন ফুঙি (ভিক্ষু) রাজনৈতিক বন্দীকে একদিন ডেকে খেতে বসিয়ে দিয়েছেন, হঠাৎ অসময়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে পড়েছেন। সিপাই দুজনার চোখমুখ শুকিয়ে গেছে। জীবন চট ক'রে ফুঙিকে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়লেন, আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কথাবার্তা বলে বিদায় করলাম।

একদিন ভোরে আমাদের দেখতে এল রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ রাটলেজ। প্রথম কথাই বলে, 'You are very happy here !'

আমরা বলি, 'Will you step into my shoes ?'

ক্যাপ্টেন স্মিথ তো ওর পেছনে দাঁড়িয়ে হাসিতে প্রায় ভেঙে পড়েন।

বেশ দু'চার কথা শুনিয়ে দেওয়া গেল।

ওকে বিদায় ক'রে ক্যাপ্টেন স্মিথ হাসতে হাসতে ফিরে এলেন। বল্লেন,

ঠিকই বলেছেন! আমি তো এ অবস্থায় দু'দিনও থাকতে পারতাম না। আমি অনেক সময় ভাবি, আপনারা বছরের পর বছর এভাবে কি ক'রে কাটান।

আইরিশ ঔপন্যাসিক জর্জ বার্মিংহাম ক্যাপ্টেন স্মিথের প্রতিবেশী ও বাল্যবন্ধু। তাঁর বই অনেকগুলোই এনে দিলেন। লেখার রসিকতাটা চমৎকার লাগত।

মং বা শীনের তাস খেলার ঝোঁক বিষম, তেমনি পাঞ্জাবী ডাক্তার মুলরাজের। খেলা হত, খাওয়া-দাওয়াও চলত। মং বা শীনকে বলতে না বলতেই রাজী হয়ে গেলেন, চাঁদপুরের নগেন রায় মান্দালে শহরে বিখ্যাত ব্যবসায়ী, তাঁর কাছে আমাদের কথা বলে সপ্তাহে দু'দিন তিনদিন *Forward* কাগজ নিয়ে আসতেন। তাতে সব রকম খবর পেতাম। *Forward* তখন নতুন বেরিয়েছে। এর পর যখন সুভাষচন্দ্র, সত্যেন মিত্র প্রভৃতি মান্দালে জেলে যান, খবর প্রকাশে এবং আরও নানাভাবে এই নগেনবাবু বিস্তর সাহায্য করেছিলেন।

একদিন হঠাৎ ক্যাপ্টেন স্মিথ হাসতে হাসতে এসে খবর বলেন, 'আমি গবর্নমেণ্টের কাছ থেকে এক অদ্ভুত order পেয়েছি। আপনাদের সমস্ত বই-কাগজ আলমারিতে ডবল তালা লাগিয়ে বন্ধ রাখতে হবে। একটার চাবি থাকবে আপনাদের কাছে, আর একটার আমার অফিসে। অফিসে খবর পাঠালে আমার কর্মচারীরা এসে যখন যে বই-কাগজ প্রয়োজন বের ক'রে দেবে, আবার আপনাদের কাজ হয়ে গেলে এসে বন্ধ ক'রে রাখবে। আমি জানি, এ order কাজে খাটানো চলে না। তবে আই. জি আসছেন। তার আগে একটা আলমারি আপনাদের ঘরে এনে রেখে দেব। জিজ্ঞেস করলে বলবেন, বই-কাগজ সব বন্ধ থাকে।'

জীবন আর আমি পরস্পরের মুখের দিকে তাকাই। বুঝলাম, ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে। অত কারিগরি কারসাজি কোনো কাজে লাগেনি—বিরাজ বৌ-এর শাড়ির আড়াল থেকে সেক্রেটারি অফ স্টেটের কাছে মেমোরিয়াল ধরা পড়ে গেছে।

ইতিমধ্যে ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর এসে গেছে। প্রথম বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছে। সুভাষ বোস, সত্যেন মিত্র, অনিলবরণ রায়, সুরেন ঘোষ, অমর ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ বাহাত্তর জন একদিনে ধরা পড়েছেন। দেশবন্ধু অসুস্থ হয়ে তখন মারীতে। তিনি অর্ডিন্যান্সে যাঁরা ধরা পড়েছেন, তাঁদের নাম দেখেই বুঝেছেন বিপ্লবান্দোলন দমনের জন্য এ অর্ডিন্যান্স নয়, এ অর্ডিন্যান্সের

উদ্দেশ্য স্বরাজ্য পার্টির অঙ্কুরে বিনাশ। আমাদের মেমোরিয়ালেরও অন্যতর প্রতিপাদ্য তা-ই।

দেশবন্ধু অসুস্থ শরীরে মারী থেকে কলকাতা চলে এলেন। তিনি তখন কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট। নিজের বাড়িতে এ. আই. সি. সি-র সভা ডেকে এলেন। ঘোষণা করলেন, আমি প্রমাণ করব এ অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য কি।

আমাদেরও ব্যস্ত হয়ে উঠবার কারণ ঘটল। এ. আই. সি. সি-র সভার আগে আমাদের মেমোরিয়াল দেশবন্ধুর হাতে পৌছানো চাই।

এক খাতা জুড়ে আবার সবটা নকল করা হল। মং বা শীনের মারফত নগেনবাবুর শরণাপন্ন হলাম। নগেনবাবু বিপদ, ঝুঁকি এবং অর্থব্যয় সবই হাসি-মুখে কাঁধে তুলে নিলেন। খাতাখানি নিয়ে কলকাতা রওনা হলেন।

কিন্তু উদ্যোগ-আয়োজন ক'রে রওনা হতে যে সময় গেল তাতে আমাদের আশঙ্কা হল মিটিং শেষ হবার আগে যদি খাতা আদৌ পৌছায় তা পৌছাবে অব্যবহিত আগে। প্রাসঙ্গিক কথাগুলো তাই লাল কালিতে দাগ দিয়ে দিলাম।

গান্ধীজি মানেননি যে, অর্ডিন্যান্স স্বরাজ্য দলের প্রতি আক্রমণ। তিনি উঠে যাবেন, তখনই হাওড়ায় গিয়ে ট্রেন ধরবেন।

এমন সময় এ. আই. সি. সি সভার রুদ্ধদ্বারের সামনে নগেনবাবু। ভলান্টিয়ার ঢুকতে দেবে না।

'দেশবন্ধুকে বলুন, আমি মান্দালে জেল থেকে জরুরী কাগজ নিয়ে আসছি।'

দেশবন্ধু ডেকে পাঠালেন। খাতাটায় একবার চোখ বুলিয়ে গান্ধীজির হাতে দিলেন। গান্ধীজি বললেন, 'আমি স্টেশনে যাবার পথে গাড়িতে পড়ব।'

স্টেশন থেকে গান্ধীজি প্রেসকে বলে গেলেন, আমি বিশ্বাস করি (convinced) যে, স্বরাজ্য দলের প্রতি আঘাত হানবার উদ্দেশ্যেই এ অর্ডিন্যান্স হয়েছে।

আমাদের ও নগেনবাবুর শ্রম সার্থক হল।

ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে এজেন্ট প্রভোকেটরের কথা এই প্রথম জানাজানি হল। এর পর কিছুদিনের মধ্যে স্বরাজ্য দলের কাছে গান্ধীজি আত্মসমর্পণ করেন।

খাতাখানার শেষের দিকে দেশবন্ধুর নামে একখানা চিঠি ছিল। চিঠিতে মিহির ঘোষের কীর্তিকলাপ ও ১৯১৯-২০ সালে খালাসের আগে ও পরে যারা

পুলিশকে সাহায্য করেছে এবং এদেশ থেকে মুক্ত অন্তরীণের ছাপ নিয়ে যারা বিদেশে গেছে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে থেকে গোয়েন্দাগিরি করবার মতলবে, তাদেরও কারও কারও কাহিনী ছিল। দেশবন্ধু এই চিঠিখানাকেও ঐ মেমোরিয়ালের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দিয়ে সারা ভারত ও বর্মার খবরের কাগজে বের ক'রে দেন। এই আকারেই ঐ মেমোরিয়াল পরে শরৎ বোস *Forward* থেকে *Lawless Laws* বলে এক বইয়ের ভিতর প্রকাশ করেন।

মেমোরিয়ালের শ্রাদ্ধ আর একটু গড়াল। বর্মায় পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গেই তো গবর্নমেণ্ট স্থির করেছিল সতীশদার সঙ্গে আমায় রাখবে না, এখন আবার নতুন হুকুম হল জীবনের সঙ্গে আমায় রাখা হবে না।

জীবনে যারা নিজেকে একান্তভাবে মুছে ফেলেছে, তাদের বন্ধুত্ব এমন একটি পরম আরামের আবাস যেমনটি নিজের বাপ-মা স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গের ভিতরও অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। অল্পদিন আগেই কুন্তলকে, চারুকে হারিয়েছি, এইবার জীবনকে ছেড়ে যেতে হবে। মনটা মুষড়ে পড়ল।

জীবনের নতুন সঙ্গী হবার জন্যে এলেন মৌলমীন থেকে বিপিন গাঙ্গুলী। সতীশদাও থেইটমিও থেকে মৌলমীন চলে গেলেন। আমায় থেইটমিও নেবার জন্য রেঙ্গুন থেকে গবর্নমেণ্টের লঞ্চ এসে পৌছাতে দেরি হতে লাগল। কয়েকদিন তিনজনেই একসঙ্গে রইলাম।

স্টেট প্রিজনার হিসাবে কোথায় কেমন কাটিয়েছি, অনেকে অনেক সময় প্রশ্ন করেন। ওর একমাত্র জবাব—যেখানে যেমনটি ক'রে নেওয়া গেছে। আর ক'রে নেবার ভিতর মনের দিকে যেটি প্রধানতঃ প্রয়োজন সেটি হচ্ছে, "যা হবার হবে"।

বর্মায় যাবার পর থেকে খাবার খরচ বাবদ বরাদ্দ দৈনিক দুই টাকা। অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে আমরা মান্দালে যাবার পর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এক চিঠি পেলেন—তার মর্ম এই, স্টেট প্রিজনারের প্রয়োজন মতো কাপড়-জামা, বিছানা, তেল, সাবান ইত্যাদি দেবে, তবে দেখবে বিভিন্ন জেলের খরচের মধ্যে যেন একটা সামঞ্জস্য থাকে।

এই সার্কুলার পেয়ে ক্যাপ্টেন স্মিথ একটু ফাঁপরে পড়লেন। মৌলমীন ও থেইটমিও জেলে চিঠি লিখে পেলেন, ওখানে প্রতি মাসে জনপ্রতি গড়ে এই সব বাবদ খরচ যথাক্রমে ১১৲ ও ১৩৲। আর মান্দালে জেলে ৪৫৲। অবশ্য মান্দালের খরচের একটা রকমফের ছিল—বাজার দূরে, আসা-যাওয়ার গাড়ি

ভাড়া জিনিসের দামের সঙ্গে লেখা হতো—সুভাষচন্দ্রেরা ওখানে যাবার পর শুনেছি, একখানা জিভ্ছোলার দাম লেখা হয়েছিল ৩৲ টাকার উপর।

যাই হোক, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তো আমাদের এসে বললেন, শতকরা না হয় বিশ টাকা আমি বেশী খরচ করতে পারি, কিন্তু আপনাদের বন্ধুদের চেয়ে আপনারা এত বেশী খরচ করবেন কেন?

আমরা বলি, আমাদের বন্ধুরা যদি সন্যাসী হয়ে গিয়ে থাকেন, তার আমরা করব কি?

ক্যাপ্টেন স্মিথ হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন। খরচ যেমন চলছিল, তেমনিই চলল।

ইতিমধ্যে দৈন্যজীর্ণ কাপড়-বিছানা নিয়ে বিপিনবাবু মৌলমীন থেকে এলেন। ততোধিক দৈন্যজীর্ণ, সঙ্গে দেখলাম, বর্মা সরকারের কাছে দরখাস্তের নকল—সেকালের রাজনৈতিকদের গৎ: স্যর হারকোর্ট বাট্‌লার, তোমার মতো গবর্নর থাকতে আমাদের প্রতি এই এই রকম ব্যবহার!

মৌলমীন জেলে বিপিনবাবুর মশারিটি রেখে দিয়েছে, ক্যাপ্টেন স্মিথ বলেন, মশারি আমি তা হলে দেব না, মিঃ দত্তেরটা ওঁকে দিতে হবে।

আমি বলি, আমি দেব না। বিপিনবাবুর জন্য নতুন মশারি এল।

এত মাস পরে মান্দালেতে এসে বিপিনবাবু যেন হেসে বাঁচলেন। তিনজনেই দিন রাত তাস পেটা হতো। মাঝে মাঝে ডাক্তার মুলরাজ এসে সঙ্গী হতেন। ইতিমধ্যে রিচার্ডস্ চলে গেছেন, নতুন চীফ জেলার এসেছে রহিম—খাঁটি জেলার প্রকৃতির জীব, সত্য-সততার ধার ধারে না! কিছুদিনের মধ্যেই মং বা শীনের নামে কতকগুলো বাজে চার্জ এনে তাঁকে সাসপেণ্ড করাল।

নতুন আই. জি এসেছেন মেজর তারাপোর। যেদিন মান্দালে থেকে রওনা হলাম, সেদিন আই. জি সেখানে। লঞ্চে রাত কাটালাম। সন্ধ্যাবেলায় মং বা শীন লঞ্চে এসে শেষ বিদায় নিয়ে গেলেন। জেলার ছিলেন, তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতাম। কিন্তু একটা সত্যিকারের দরদবোধ ছিল। পরে নগেনবাবু এঁকে তাঁর নিজের ব্যবসায়ে নিয়ে নিয়েছিলেন।

লঞ্চে এসে দেখি, মেজর তারাপোর ও ক্যাপ্টেন স্মিথের ব্যবস্থায় প্রচুর চাল, ডাল, ঘি, ময়দা, মুরগী, কপি এবং রোজ দেড় টাকা মাইনের এক বাবুর্চি! সাত দিনের মতো লঞ্চে কাটাতে হবে। সঙ্গে যে ইউরোপিয়ান ইনস্পেক্টরটি ছিল, সে সন্ধ্যায় খাবার জন্য কাফি ও পাঁউরুটি বের করছিল। আমি বলি, ওসব তুমি

রেখে দাও, এত জিনিস আছে—এ কয়দিন আমার সঙ্গেই খাবে। সিপাইদেরও ফল, তরকারি, ঘি, আটা কিছু কিছু দিলাম।

প্রচুর ঘিয়ে তৈরী খাস্তা পরোটা ও মুরগির মাংস খেয়ে ইনস্পেক্টরের তো শেষরাত্রি থেকেই চোঁয়া ঢেকুর উঠতে শুরু হল। ছোটখাটো শহর দেখলেই বলে, আসুন, লঞ্চ থামিয়ে কিছু ঔষধ খেয়ে আসি। আমারও সুবিধা হল—পথে পথে পাগান, সালে ইত্যাদি বর্মার নামী সব প্রাচীন শহর দেখতে দেখতে আসি। জ্যোৎস্নারাতে পাগানের অগণিত হিন্দু মন্দিরের এক অপরূপ দৃশ্য।

কিন্তু শহরের চেয়েও দেখবার মতো সৌন্দর্য বর্মার ইরাবতী নদীর। এর আগে যখন বেসিন থেকে মান্দালে যাই, তখনও বর্মার স্থলপথের সৌন্দর্য দেখেছি। তখন বর্ষায় রেলের লাইন ভেঙে গিয়েছিল, রেঙ্গুন থেকে মান্দালে পৌঁছাতে দিন তিনেক লেগেছিল। আমরা তো ভেবেছিলাম, হয়তো রেঙ্গুনে ফিরে যেতে হবে। তখন মান্দালেতে একটা রাজনৈতিক দাঙ্গা হয়ে গেছে। পুলিশের আই. জি এবং সি. আই. ডি-র ডি. আই. জি বহু পুলিশ নিয়ে ঐ গাড়ীতেই ছিল। আই. জি টাউঙ্গু থেকে ফিরে গেল। কিন্তু ডি. আই. জি ডানবার আমাদের বলে, আপনাদের আর আমাকে রেলওয়ে কোম্পানী পিঠে ক'রে হলেও পৌঁছে দেবে। প্রায় পিঠে করেই পৌঁছে দিয়েছিল। জায়গায় জায়গায় বহু লোক লাগিয়ে রেল লাইনের নীচে কাঠ আর বাঁশের ঠেকা দিয়ে জিনিস-পত্র সহ আমাদের সব ধীরে ধীরে ট্রলি ক'রে পার করল। দক্ষিণ বর্মায় সেই দেখলাম সুজলা সুফলা বাংলার প্রতিচ্ছায়া! আর উত্তর দিকে পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে গায়ে পিনকুশনে যেমন পিন ফোঁড়া থাকে তেমনি অগণিত সব ছোট বড় প্যাগোডা বা বৌদ্ধ-মন্দির।

এখন ইরাবতীর তীরেও দেখলাম, নদীর এমন একটি সুন্দর বাঁক নেই যেখানে বর্মাবাসীরা একটি মঠ বা ফুঙ্গিচাঁও (আশ্রম ও বাল ব্রহ্মচারীদের বিদ্যা-মন্দির) না তৈরি করেছে। গেরুয়া-পরা স্নাতক ও বালকরা দলে দলে ভিক্ষায় বেরিয়েছে, গৃহস্থ নারীপুরুষ ভিক্ষার্থী পৌঁছাবার আগেই চাল, তরকারি নিয়ে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখনও বর্মার নিজস্ব এই শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজ রাষ্ট্রের কল্যাণে অবলুপ্ত হয়নি। এ আমি বলছি ১৯২৪-২৫ সালের কথা, থেইটমিও জেলায় তখন শিক্ষিতের হার শতকরা ৬১ জন।

এছাড়া দেখলাম, নদীর দুই প্রান্তে বিস্তীর্ণ সমতল শস্যক্ষেত্রে বর্মার কৃষকরা—অধিকাংশই নারী, অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। ক্ষেতে কৃষক বা নদীতে মাঝি

সবারই মুখে সর্বক্ষণ রয়েছে অসাধারণ মোটা এক একটি চুরুট। নদীর জলে, পূর্ববঙ্গে যেমন দেখা যায় বিক্রি করবার জন্য বাঁশের চালি বেঁধে নিয়ে যায়, এখানে তেমনি নদীর দুই ধারে এক-এক জায়গায় দেখা যায় পাশাপাশি চার-পাঁচটা চালি একসঙ্গে বাঁধা রয়েছে! বর্মীদের সৌন্দর্যজ্ঞান অসাধারণ। জ্যোৎস্না-রাতে ঐ সব চালির উপর কাঠ ফেলে নাচের আসর তৈরি হয়। মেয়েরা ফুলসাজে সেজে সেখানে পোয়ে নাচ নাচে! ছেলেরাও নাচে। গ্রামবাসী মেয়ে-পুরুষ সবাই মিলে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসে এই নাচ দেখে, উৎসাহ আনন্দের অবধি নেই। সালে শহরে ও ইরাবতী নদীর উপরে এই নাচ আমিও দেখে নিলাম।

আর দেখলাম ইয়েনেঞ্জাও আর ইয়েজির তেলের খনি। এক জায়গায় দেখলাম, মাটি ফেটে প্রায় বিশ হাত উঁচু হয়ে প্রচুর তেল ফোয়ারার মতো উঠে নদীতে গড়িয়ে পড়ছে।

এমনি দেখতে দেখতে আট দিনে এসে থেইটমিও পৌঁছালাম। জেলে গিয়ে দেখি, জ্যোতিষবাবু একলা রয়েছেন। এই ছয় মাসে তাঁকে প্রায় চেনা যায় না। লম্বা লম্বা চুল দাড়ি নখ, পরনে সেই মেদিনীপুরে পাওয়া খদ্দরের কাপড়, জায়গায় জায়গায় গেরো দেওয়া। জিজ্ঞেস করি, এ কি মাস্টার মশাই?

বলেন, এখানে এই রকমই রেখেছে। ফস্টার বলে চীফ জেলার ছিল, ব্যাটা বেজায় পাজি।

বলতে বলতেই একটি হিন্দুস্থানী কয়েদী একথালা ভাত তরকারি নিয়ে এল।

আমি জিজ্ঞেস করি, 'রান্নাঘর কোথায়? এ ভাত কোথা থেকে এল?'

'সাধারণ কয়েদীদের রান্নাঘর থেকে।'

'খান কেন?'

'না খেয়ে লাভ নেই। সন্ধ্যার খাবার বেলা ৪টার মধ্যে খেয়ে বন্ধ হতে হয়। প্রথম একদিন বলেছিলাম অত সকালে খাব না, ভাত সেলে ঢেকে রেখে দাও। কিন্তু চীফ জেলার এসে ভাত নিয়ে চলে গেল।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমার তো খাবার সামনে রান্না না ক'রে দিলে আমি খাব না।'

মাস্টার মশাই একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বসে পড়ে খেতে শুরু করলেন।

কয়েদীটি আমায় বলে, 'আপনারও খাবার তৈরী হয়ে আছে। নিয়ে আসব?'

আমি বলি, 'এখানে রান্না কর।'

সিপাই জেলারকে খবর দিল। ফস্টার বদলী হয়ে গেছে। নতুন চীফ জেলার এসেছেন মিঃ মজিদ—বেশ ভদ্রলোক।

সব শুনে বললেন, 'আমি তো কিছু করতে পারি নে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলি।'

মেজর মার্টিন এসে বলে, 'রান্নাঘর তৈরী হতেও দু'তিনদিন সময় লাগবে।'

আমি বলি, 'হাসপাতাল থেকে স্টোভ নিয়ে এসে আমায় আলুসিদ্ধ ভাত ক'রে দিক।' তখন সেই ধরনের ব্যবস্থাই হল। ৩।৪ দিনের ভিতর ইয়ার্ডের মধ্যে রান্নাঘর তৈরী হয়ে গেল। আমাদের দু'জনের জন্য দেওয়া হয়েছে চারটি সেল, সামনের দিকে একটিই দেয়ালে ঘেরা—ওগুলো ফাঁসির কয়েদী রাখবার জন্য তৈরী। সামনে একটু ফুল-বাগানের পর আর কতকগুলো সেল। সেখানে অন্য কয়েদীদের মধ্যে থাকেন প্রোমের দু'জন রাজনৈতিক বন্দী, ভিক্ষু। জ্যোতিষবাবু প্রায় ঘরে বসেই কাটাতেন। তাই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চলে গেলে এঁদের সঙ্গে গল্প করতাম। ওঁরা সাধারণ কয়েদীর মতোই খাবার ইত্যাদি পেতেন। আমাদের খাবার থেকে যা পারতাম দিতাম, বা ওঁদের প্রয়োজনমতো জিনিস বাজার থেকে আনিয়ে দিতাম।

এঁদের মধ্যে একজনের নাম উ পীন নীয়া জ্যটা, অল্প বয়স, বেশ বুদ্ধিমান। বর্মায় একটা বিপ্লবের ক্ষেত্র কি ক'রে তৈরী করা যায়, তিনি আমায় প্রশ্ন করতেন। আমার টুটিফুটি বর্মী আর ওঁর টুটিফুটি হিন্দীতে আমাদের আলাপ চলতো। একাজে আমায় সাহায্য করত আমাদের আলমোড়াবাসী পাচক তারাদৎ। এই পাচকটি ছিল বর্মার জেলের এক দুর্দান্ত কয়েদী। ১২ বৎসর পলাতক অবস্থায় শান রাজ্যগুলির ভিতর ডাকাতি করে ফিরত। ধরা পড়ে সাত বছরের জেল হয়েছে। যেমন বুদ্ধিমান তেমনি কর্মদক্ষ।

সতীশদা আর জ্যোতিষবাবু যতদিন ছিলেন ফস্টার ওঁদের নাম ক'রে অনেক জিনিস কিনেছে, কিনে মেরে দিয়েছে, অথবা অনেক জিনিস কেনেই নি। সে কাহিনী পরে বলব। আপাতত দেখলাম, এক সেট অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি কিনেছে। পাচককে দিয়েছে মাত্র একটি। তাতে তাকে দুধ গরম করতে হবে, ভাত রাঁধতে হবে। কোন পাচক এ পারে না। তারাদতের গলার ফোকরে ৪।৫টি গিনি ও অনেক টাকা ও রেজগী থাকত। সে তাই দিয়ে কয়েদীর থালাতে আংটা লাগিয়ে কারখানা থেকে দু'তিনটে কড়াই তৈরী করিয়েছে। দু'জন

স্টেট প্রিজনারের খাবার জন্য ফস্টার তরকারি দিত কোনো দিন দু'টো মুলো, কোনো দিন একটা ওলকপি। তারাদৎ জেলের সর্বত্র বিচরণ করত, যেমন খুশি বাগান থেকে তরকারি তুলে নিয়ে এসে তার বাবুদের খাওয়াত। এসব ব্যবস্থা এখন বদলে যাওয়াতে তারাদৎ ভারি খুশি। সে আমায় অনেক কাজে সাহায্য করে।

ভিক্ষু জ্যাটার প্রশ্নের জবাবে বলি, 'বাংলাদেশে আমরা যে পদ্ধতিতে বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরী করতে চেষ্টা করছি, বর্মাতে সে-পদ্ধতি ঠিক চলবে না, বা তার প্রয়োজনও হবে না। এখানে যদি কোনো ভিক্ষু অথবা রাজবংশীয় কেউ নেতৃত্ব নেন, সাধারণ লোক সহজে এগিয়ে আসবে। কৃষকদের নিয়ে বিপ্লব করা বাংলাদেশের চেয়ে এখানে সহজ।'

এই উ পীন নীয়া জ্যাটাই পরে স্ক্রেয়া সানকে বিপ্লবের দীক্ষায় দীক্ষিত করেন। থারাওয়াদি থেকে ১৯৩১ সালে বর্মায় যে বিদ্রোহ শুরু হয়, সেই বিদ্রোহের নেতা হিসাবে স্ক্রেয়া সানের ফাঁসি হয়।

আর একটি লোকের সঙ্গে থেইট্মিও জেলে আমার পরিচয় হয়। তাঁর নাম তিলা মহম্মদ খান। যাদুদার দাদা ক্ষীরোদগোপাল মুখার্জি রেঙ্গুনে ছিলেন। ১৯১৪-১৫ সালে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ওখানে সক্রিয় অংশ নেন। তিনি সেখানে মাসিদি খান নামে এক আফগানের সঙ্গে পরিচিত হন। এই আফগান আফিং, কোকেন ইত্যাদি গোপনে সংগ্রহ ও বিক্রি করত। ক্ষীরোদগোপাল তার সাহায্যে গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করতে শুরু করেন। পরে দু'জনাই ধরা পড়ে অন্তরীণাবদ্ধ হন। মুক্তি পেয়ে ক্ষীরোদগোপাল সন্ন্যাসী হন, আজও তিনি নিরুদ্দেশ, এতদিনে হয়তো দেহত্যাগ করেছেন।

মাসিদি খানের গোপন ব্যবসায় পরে এমন জেঁকে ওঠে যে, বহু লোক তার দলে নাম লেখায়। পুলিশের লোকও তার ভিতর ছিল। ফলে, মাসিদি খান রেঙ্গুন পুলিশের এক ত্রাসের কারণ হয়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠাও কম হয়নি— রেঙ্গুনে তার বাড়ি যেখানে সেখানকার রাস্তার নামকরণ হয় মাসিদি খান রোড। পুলিশ সে রাস্তায় ঢুকতেও ভয় পেত। অনেক দৌরাত্ম্য সহ্য করবার পর, যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময়ে প্রচুর দলবল নিয়ে পুলিশ মাসিদি খানকে ও তার লোকজন জনকতককে ধরে। তার ভিতর তার দুই ছেলে ছিল। ছোট ছেলেটি তিলা মহম্মদ খান। কিন্তু সাক্ষীসাবুদের অভাবে কাউকে বিশেষ কিছু সাজা দেওয়া সম্ভব হয়নি। মাসিদি খানের ৩ মাস জেল হয়, তিলা

মহম্মদের ৬ মাস। মাসিদি খানের সঙ্গে আমার ও জীবনের দেখা হয় মান্দালে জেলে, তিলা মহম্মদের সঙ্গে আমার থেইট্‌মিও জেলে। পরে ইনি বর্মা লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সভ্য হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগে নেতাজী সুভাষকে প্রচুর টাকা তুলে সাহায্য করেন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের এম. পি. হিসাবে ব্যাংককে এক পার্লিয়ামেণ্টারি কনফারেন্সে যোগ দিয়ে ফিরবার পথে এঁর সঙ্গে দেখা করি।

তারাদৎ তিলা মহম্মদকে ডেকে নিয়ে আসত, আমার ওখানে মাঝে মাঝে খেয়ে যেতেন। আফগানিস্থানের সঙ্গে এদের গোপন ব্যবসা চলত, এবং প্রয়োজনমতো লোকও পার করত। দরকার হলে আমাদের লোকও রুশিয়ার দিকে পার ক'রে দেবার ব্যবস্থা করবেন বলে কথা দেন। এই ভিক্ষু উ পীন নীয়া জ্যটা ও তিলা মহম্মদের কথা পরে আবার বলতে হবে।

ইতিমধ্যে সেক্রেটারী অফ স্টেটের কাছে আমি ও জীবন মিহির ঘোষের ও বাংলার আই. বি পুলিশের কীর্তিকলাপ নিয়ে যেসব কথা লিখেছিলাম, সেই সব সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত খবর দিয়ে আর একখানা মেমোরিয়াল লেখা হয় তখনকার দিনের ভারতীয় লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্বলির প্রেসিডেণ্ট বিঠলভাই প্যাটেলের কাছে। আমাদের নামে চার্জ দিয়েছে যে আমরা হিংসাত্মক কাজকর্মে লিপ্ত ছিলাম; কিন্তু ১৯২১ থেকে '২৩ সালের ভিতর যে হিংসাত্মক কোনো কাজের ভিতর আমরা ছিলাম না, কংগ্রেসের বা স্বরাজ্য পার্টির কাজ আমরা করি, তা সরকার বা আই. বি চায় না—এই সব কথাই এই মেমোরিয়ালে ছিল। মেমোরিয়ালটা লেখা হয় আমি মান্দালেতে থাকতে। ইতিমধ্যে বিপিন-বাবু সেখানে এসে পড়েন। তাঁকেও আমরা এটা স্বাক্ষর করতে বলি। তিনি বলেন, গবর্নমেণ্ট তো জানে, এবারে হিংসাত্মক যা কিছু হয়েছে, তার সঙ্গে আমি জড়িত, কাজেই ওটাতে আমি সই দেব না।

তিনজন আছি, তার ভিতর দু'জন সই করবে, আর একজন করবে না, এটা ভালো হয় না। তাই এটা আর তখন দেওয়া হয়নি। কিন্তু জীবনের কাছে ওর একটা নকল রেখে আসি। ইতিমধ্যে কাগজে সুভাষ, সত্যেনদা প্রভৃতি ধরা পড়ার খবর পড়েই আমরা আন্দাজ করি, ওঁরা জনকতক বর্মায় যাবেন। তাঁদের মতামত কি, তাঁরা কেউ ওটায় সই করেন কিনা, কথা রইল, জীবন আমায় জানাবেন।

খবরের কাগজে দেখলাম, সুভাষ, সত্যেনদা (মিত্র), মধুদা (সুরেন্দ্রমোহন

ঘোষ), অমর (ঘোষ), হরিদা (হরিকুমার চক্রবর্তী) এবং অনুশীলনের ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও মদন ভৌমিক জানুয়ারী মাসে মান্দালে গেলেন। মার্চ মাস হয়ে গেল। আর অপেক্ষা না ক'রে আমি ওটা পাঠিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে কাগজে দেখলাম কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু আমাদের প্রথম মেমোরিয়াল থেকে অনেক কথা উদ্ধৃত ক'রে বাংলার প্রথম অর্ডিনান্স সম্পর্কে বক্তৃতা করেছেন এবং বলেছেন, আমাদের নামে যে সব চার্জ আনা হয়েছে, তাঁর নামে আনলেও তিনি তার জবাব দিতে পারতেন না।

মান্দালে থেকে কোনো খবর না পাবার কারণ পরে শুনলাম, সুভাষ দ্বিতীয় মেমোরিয়ালের নকল জীবনের কাছে পেয়ে সবাইকে পড়ে শুনিয়েছেন। কেউ কেউ কোনো মতামত দেননি। কেউ কেউ বলেছেন, বেশ তো হয়েছে, পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত।

সুভাষ সব শুনে খুব রেগে যান। বলেন, সে বেচারী একা একা থেকে কষ্ট পাবে, আর লড়াই ক'রে যাবে, আর আমরা সবাই হৈ চৈ ক'রে আনন্দে কাটাব?

এর পর থেকে যতো সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে মান্দালেতে সুভাষের দেখা হয়েছে, প্রত্যেককে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন আমাকে যেন মান্দালেতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে অনুরোধ গবর্নমেণ্ট রাখেনি। সুভাষ কিন্তু যখনই সুযোগ পেয়েছেন, গোপনে চিঠিপত্র লিখেছেন, চিঠিতে পড়াশোনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা থেকে মনে আছে, হার্জেনের *Memoirs* খানা তাঁর খুব প্রিয় বই ছিল। এর আগে বিলেত থেকে আসবার বেলায় কাস্টম্সকে লুকিয়ে ক্রপট্‌কিনের *Memoirs of a Revolutionist* বইখানা আমার জন্য এনেছিলেন।

মার্চ মাসে অর্ডার এল, আমার বদলী ইনসিনে, জ্যোতিষবাবুর মান্দালেতে।

বদলীর ঠিক আগে আই. জি মেজর তারাপোর দেখা করলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, আলাদা জায়গায় কেন?

বললেন, আমরা কি করব? আমরা চেয়েছিলাম সব এক জায়গায় রাখা হয়; তাতে আমাদের পক্ষেও সুবিধা। কিন্তু ইণ্ডিয়া গবর্নমেণ্ট থেকে অর্ডার দিয়েছে, সব এক জায়গায় রাখতে পার, কিন্তু দত্তকে ভিন্ন জায়গায় রাখবে। আমরা আপত্তি করি, এভাবে একজনকে আলাদা ক'রে রাখা অত্যন্ত নিষ্ঠুর হবে। ভারত গবর্নমেণ্ট তারপর এতটা পর্যন্ত রাজী হয়েছে যে আপনি ইনসিনে থাকবেন,

আর মান্দালে থেকে কয়েক মাস পর পর এক-একজন এসে আপনাকে সঙ্গ দেবেন।

তিলা মহম্মদকে দ্বিতীয় মেমোরিয়ালের একখানা নকল দিলাম। আই. জি-র আরদালী মাসিদি খানের লোক। তার মারফত আই. জি-র কাগজপত্রের ভিতর তিলা মহম্মদ ওটা রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেন। কয়েকদিনের মধ্যে তিনিও খালাস হন। এবং ওটা নৃপেন ব্যানার্জিকে দিয়ে দেন। নৃপেনবাবু তখনও 'রেঙ্গুন মেলের' সম্পাদক। তিনি ওটা সবভারতে প্রচার করেন। সুযোগ-সুবিধা পেলেই নৃপেনবাবু বর্মার রাজবন্দীদের সাহায্য করতেন, কিন্তু বিপদ-আপদের কথা কখনও ভাবেননি।

ইনসিন

ইনসিনে যে সেল ব্লকটায় আমার থাকার ব্যবস্থা করেছে, গোটাকতো আম-কাঁঠালের ছায়ায় সেটা ঢাকা—অনির্দিষ্ট জেল-জীবনের নৈরাশ্যের মেঘলা ছায়ারই মতো। একাধিকবার যে সব কয়েদীর সাজা হয়েছে, শুধু তেমন কয়েদীই ইনসিন জেলে রাখা হতো। মস্ত বড়ো জেল—৩৩০০ কয়েদী থাকে, ২২ জন জেলার। আমায় যে সেল-ব্লকে রাখল তার সামনে ও পেছনে আরও অনেকগুলো সেল ব্লক। আমাদের ঠিক পেছনেই একটা বড়োগোছের করিডর (corridor) সেল ব্লক (দুই দিকে মুখোমুখি কতকগুলি সেল, মাঝখানে একটিই মাত্র ঢাকা বারান্দা, অর্থাৎ সেলের ভিতর দিনরাত সমানই আঁধার)। এই সেল ব্লকে দশ থেকে পনের বিশজন পর্যন্ত ফাঁসির কয়েদী প্রায় সর্বদাই থাকে—সকাল-সন্ধ্যায় তাদের গান বা স্তোত্র-পাঠের করুণ সুর মনের বিষাদের ছায়াকে আরও ম্লান, আরও গভীর ক'রে তোলে।

ইংরেজি crude কথাটাকে 'অমার্জিত' বা 'স্থূল' বললে সবটা বলা হয় না। বর্বরতার ভাবটা অনেকখানি তার সঙ্গে মাখিয়ে দেওয়া দরকার হয়। ইংরেজ আমলে আমাদের দেশের জেলে সেল তৈরীর ব্যবস্থা যারা করেছিল, অমনি crude মনোভাবের পরিচয় তারা যতখানি পেরেছে দিয়েছিল। তার উপর ইনসিনে তখন চীফ জেলার হয়ে এসেছে থেইট্‌মিওর সেই ফস্টার, আর ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাদারল্যাণ্ড—জেলার থাকতে বর্মী কয়েদীরা এর নাম দিয়েছিল "ক্ষোয়ে ঠামু" "কুত্তা জেলার"। বর্মী কয়েদীরা প্রায় সব জেলারেরই এক-একটা নামকরণ করে। আমাদের সেল-ইয়ার্ডের দুই পাশে যেদিক দিয়ে সেলের কয়েদীরা যাতায়াত করত, এরা দু'জন মিলে—আমি ওখানে পৌছাবার আগে—সেই দিকে কেবল দু'খানা বাঁশের বাখারির বেড়া দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, ফস্টার কাঁঠাল গাছের গায়ে রশি বেঁধে দিয়েছে, যেন কয়েদীরা কেউ ঐ বেড়ার কাছাকাছি এসে আমাদের সাথে কথা না বলতে পারে।

দু'দিন একলা কাটাবার পর আমায় সঙ্গ দেবার জন্য মান্দালে থেকে এলেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ)। ঐদিনই লেগে গেল ফস্টারের সঙ্গে। এ দু'দিন তল্লাশী করতে আসেনি। এই দিন সন্ধ্যায় বন্ধ হবার বেলায় এল।

জেলখানায় যে জিনিসগুলি বিরক্তি ও অপমানজনক লাগত, তার মধ্যে সব-চেয়ে সেরা এই তল্লাসী। অথচ সেকালের নিয়মের মধ্যে ছিল, রোজ সকাল-বিকাল স্টেট প্রিজনারদের বাসগৃহ, জিনিসপত্র ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাশী করতে হবে (shall be thoroughly searched)। একটু ভদ্র-গোছের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জেলার যে সব জায়গায় থাকত সে সব জায়গায় লিখিত নিয়মকানুন সত্ত্বেও আমাদের মর্যাদা-বোধটাকে আঘাত করতে চাইত না। ইনসিনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর ফিগুলে অত্যন্ত ভদ্র, দার্শনিক প্রকৃতির লোক। কিন্তু নিজে বিশেষ কিছু দেখাশোনা করতেন না, কাজেই রাজত্ব ছিল সাদার-ল্যাণ্ড আর ফস্টারের। সব দায়িত্ব এদের, কাজেই মেজর ফিগুলে ইচ্ছা সত্ত্বেও এদের কাজে বিশেষ কোনো বাধা দিতেও পারতেন না।

প্রথমেই ত্রৈলোক্যবাবুর সেল। ফস্টার দলবল সহ সেখানে ঢুকল। আমি বলি, কি তল্লাশী করবে তুমি? উনি যখন জেলে ঢোকেন, তখন সব দেখেশুনে দিয়েছ, তার পর যদি তার ভিতর কিছু ঢুকে থাকে, তা ঢুকতে পারে কেবল তোমার কর্মচারীদের মারফত। তাদের দোষের জন্য তুমি আমাদের অপমান করবে?

ও বলে, আমার আইনে আছে, আইনমাফিক আমায় কাজ করতে হবে।

আমি বলি, তোমার আইনজ্ঞান আমি ভাল ক'রে জানি। আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙব।

কথাটার একটু অর্থ আছে। পরে বলছি। ত্রৈলোক্যবাবুর একটি গুণ ছিল, ঝগড়া বা একটা কিছু লেগে গেলে তিনি সমান তালেই চলতে চেষ্টা করতেন। তিনি আমার সঙ্গে সমানে চেঁচামেচি ক'রে গেলেন। ফলে তল্লাশী বিশেষ কিছু হল না।

এল আমার ঘরে। আগেই বলেছি, জেলখানার ঝগড়ায় ঠ্যাটামি খানিকটা করতে হয়, বিশেষতঃ আইন যখন আমাদের বিরুদ্ধে। আমাদের চেঁচামেচির চোটে টলতে টলতে ঘরে ঢুকে—সামনে ছিল টেবিলটা, আর সেই টেবিলে ছিল আমার রাতের খাবার শুদ্ধ টিফিন কেরিয়ার—ও সেই টেবিলে ভর দিয়ে একটু টাল সামলে নিচ্ছে, আমি হঠাৎ ভীষণ হিন্দু বনে গেলাম—টিফিন কেরিয়ারটা

ছুঁড়ে বাইরে ফেলে হিন্দীতে—কারণ সঙ্গের জমাদার সিপাই সব গোঁড়া হিন্দুস্থানীর দল—চিৎকার শুরু করলাম, "তুমি খ্রীষ্টান, মদ খেয়ে দাঁড়াতে পারছ না, আমার খাবার ছুঁয়েছ। মনে করেছ, সেই খাবার আমি খাব ?"

জমাদার সিপাই আর কেউ আমার ঘরে ঢুকল না। ফস্টার ভয়ে তো-তো ক'রে বলতে লাগল, "আমি মদ খাইনি, আমি মদ ছুঁইনে," বলতে বলতে বেরিয়ে গেল, জমাদারকে বলল ঘর বন্ধ করতে।

আমি জমাদারকে বললাম, দাঁড়াও, চিঠি নিয়ে যাও। এই চিঠি এখনই বড় সাহেবকে দেবে। লিখলাম, তোমার জেলার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় এসে তল্লাশীর নামে আমার রাতের খাবার নষ্ট করেছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে মেঃ ফিগুলের জবাব এল : আমি আই. জি-কে ফোন করেছি, কাল খুব ভোরে তিনি এসে যা হয় ব্যবস্থা করবেন।

ফস্টার সম্পর্কে আগে বলেছি, জ্যোতিষবাবু ও সতীশদার সঙ্গে থেইটমিও জেলে খুব দুর্ব্যবহার করে। তাছাড়া ওর আরও সব কীর্তি ছিল।

কনওয়ে বলে একটি অ্যাংলোবার্মিজ জেলার ছিল থেইটমিওতে—আমাদের কাজকর্ম, হিসাবপত্র সব দেখাশোনা করত। সে আমায় বলে, মিঃ দত্ত, আমি তো হিসাবপত্র কিছু বুঝিনে, অথচ হিসাব-নিকাশের সময় এসেছে, আপনি যদি এগুলোকে একটু ঠিক ক'রে দেন তো আমার বড় উপকার হয়।

আটদশ মাসের হিসাব ওর সব টুকরো টুকরো কাগজেই ছিল। সেগুলো নিয়ে দেখি, ফস্টারের সই করা কন্ট্রাক্টরের সব রসিদ—তাতে আছে, জ্যোতিষবাবু, সতীশদা ও আমার জন্য তিনটি মশারির দাম ৫১৲। অথচ ওঁরা মেদিনীপুরের মশারিই ব্যবহার করছেন, আমি মান্দালে থেকে এনেছি। ধুতি প্রতি মাসেই ওঁদের জন্য এক আধ-জোড়া লেখা আছে, অথচ ওঁরা সেই মেদিনীপুরের খদ্দরের ধুতিই গিরো দিয়ে চালাচ্ছেন—এই রকম বহু জিনিসই আছে।

ইতিমধ্যে ফস্টার ইনসিনে এসেও কিছু কিছু কীর্তি করেছে। জেল চালাবার পদ্ধতি ছিল তার সেই পুরোনো কালের জেলারদের পদ্ধতি। জেলারদের তখন কয়েদীর মধ্যে একদল গুপ্তচর ও গুণ্ডা থাকত। এরা সত্য-মিথ্যা সব উপায়ে সাধারণ কয়েদীর জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলত; নিজেদের লাভের জন্য, ঈর্ষা-বিদ্বেষের জন্য জেলারকে বলে কয়েদীদের অকারণ মারপিট করত, শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করত এবং জেলারদের জানাশোনার মধ্যেই নিজেরা অবাধে অস্বাভাবিক যৌন অপরাধ পর্যন্ত ক'রে যেত।

ইনসিন ছিল বেপরোয়া কয়েদীর জায়গা। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আসামী একজন এরই এক গুণ্ডাকে মারবার জন্য জেল ফ্যাক্টরী থেকে একখানা ছোরা তৈরী করিয়ে আনে। সেটা ধরা পড়ে যায়। এই মামলার অনুসন্ধানের জন্য জেলার অফিসের কাছে মাঠে টেবিলের সামনে বসেছে, এক পাশে দাঁড়িয়ে আসামী, অপর পাশে গুণ্ডার দল, সিপাই জমাদাররা সামনে। ছোরাখানা টেবিলের উপর ধরা রয়েছে। এক সুযোগে ফস্ ক'রে সেটা তুলে নিয়েই লাফিয়ে পড়ে, আসামী যে-গুণ্ডাকে মারতে চেয়েছিল তার গলায় বসিয়ে দিয়েছে। সে তো সেখানেই শেষ।

যথারীতি পাগলা ঘন্টি পড়ল। সিপাই জমাদার ভিড় জমাল, কিন্তু ও ছোরা ঘোরাতে ঘোরাতে এমন ঘুরতে শুরু করল যে ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেলার, সিপাই কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহস পেল না। ও বলতে লাগল, বড়সাহেব ছাড়া আর যেন কেউ আমার কাছে না আসে, যে আসবে তাকেই আমি খুন করব। মেজর ফিগুলে এলে বলল, তোমার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করব, কিন্তু কেউ যেন আমার গায়ে হাত না তোলে। মেঃ ফিগুলে অভয় দিলেন, আমি নিজে সাথে গিয়ে তোমায় সেলে বন্ধ করব, কেউ তোমায় মারবে না।

ও তখন মেঃ ফিগুলের পায়ের কাছে ছোরা ফেলে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ল। ওর গায়ে কেউ হাত দেয়নি।

কিন্তু ফস্টারের অসৎ পদ্ধতি ও নির্বুদ্ধিতার জন্য জেলে একটা খুন হয়ে গেল। এই মামলা যখন আই. জি-র অনুসন্ধান-সাপেক্ষ তখনই আমরা ইনসিনে গেছি।

আমার খাওয়া নষ্ট করা থেকে শুরু ক'রে মশারির দামের হিসাব পর্যন্ত যখন মেজর তারাপোরের কানে তুললাম, তিনি একটু হেসে বললেন, So the prejudice started from Thayetmyo.

আমি বলি, There is no question of any prejudice. You just hold an enquiry into the accounts at Thayetmyo Jail which you are bound to do.

আই. জি বলেন, That I'll do. But about the search, I can't ask the Superintendent to ignore or violate the rules.

আমাদের কাছে একটি অঙ্গীকার চাইলেন, জেল থেকে কোনো কাগজপত্র বাইরে যাবে না; তাহলে উনি ভেবে দেখবেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কি অনুরোধ করতে পারেন।

আমি বলি, যা আমরা করেছি বলে কোনো প্রমাণ নেই, তা আমরা করব না—এমন অঙ্গীকার তিনি আমাদের কাছে চান কোন্ হিসাবে ?

আই. জি হেসে বললেন, যা-ই হোক, আমি আশা করি, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে আপনাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কই হবে এবং আইন যত কম obnoxiously পালন করা যায়, তাই তিনি করবেন।

এই দিন থেকেই ফস্টারের অর্থাৎ চীফ জেলারের আমাদের ইয়ার্ডে ঢোকা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। থেইট্টমিওর হিসাবের জন্য পরে ২০৲ টাকা জরিমানা হল। কয়েদী খুনের মামলায় রেঙ্গুন জেলে বদলী হল, কিন্তু ফার্স্ট গ্রেডের জেলার হয়েও সেখানে চীফ জেলার হতে পারল না, একজন সেকেণ্ড গ্রেডের জেলারের নীচে রইল এবং গুণ্ডা ও গুপ্তচর দিয়ে শাসন চালাবার অপরাধে পরে সময়ের পূর্বেই তাকে পেন্সন নিতে হল।

তল্লাশীর উৎপাত ইনসিনে আর আমাদের ভুগতে হয়নি। ডেসমণ্ড বলে একজন ইউরো-এশিয়ান জেলার আমাদের চার্জে ছিলেন, খুব ভদ্র প্রকৃতির। তাঁরই আমাদের তল্লাশী নেবার কথা। তিনি সেল খুলবার ও বন্ধ করবার সময় উপস্থিত থাকতেন, কিন্তু খাতায় তাঁকে লিখতে হতো thoroughly search করেছেন।

এ উৎপাত যখন গেল, তখন আই. জি-কে বললাম, এ-সেলে থাকব না। আসল কথা, মান্দালেতে ঝাঁকের কই ঝাঁকের ভিতর যেতে চাই। মেঃ তারাপোর পুনরুক্তি ক'রে বললেন, সে আর সম্ভব নয়। ওখানে ঐ সেলই ভেঙেচুরে নতুন রকম ক'রে দেবেন। প্ল্যান তখনই হয়ে গেল, চারটে সেলের সামনের অ্যাণ্টিসেল ভেঙে বড় বারান্দা করা হবে, দু'পাশে দু'টো সেলে বাথরুম আর খাবার ঘর হবে, সবগুলো সেলের পেছনে বড় বড় জানালা ক'রে দেওয়া হবে। আপাততঃ রাত্রে থাকবার ব্যবস্থা হল একটু দূরে হাজতের ওআর্ডের দোতলার এক অংশে। ১৯০৮-৯ সালে বরিশালের মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা সেখানে ছিলেন। থেইট্টমিও ও বেসিনে যে-দু'টো নিভৃত প্রান্তের ঘরে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও সতীশ চ্যাটার্জি ছিলেন, সেই ঘর দু'টো এর আগে দেখে এসেছি।

কয়েক মাসের ভিতর সেলের চেহারা নূতন হল। কিন্তু রাত্রি এবং মাঝে মাঝে দিনে বাসের জন্যও হাজতের ও-ঘরও ছাড়লাম না। আমি দু'বছর ছিলাম, আমি চলে আসবার পরও অরুণদা, সুভাষচন্দ্র, সতীশদা, প্রতুলবাবু প্রভৃতি একসঙ্গে বা পর-পর ঐ ব্যবস্থাতেই ওখানে কাটিয়ে এসেছেন।

কিন্তু ইনসিনের নিরানন্দের দিন কাটতে সময় লাগল। ফস্টার আমাদের ইয়ার্ডে ঢুকতে পেত না, তবু সে চীফ জেলার, তারই সব দায়িত্ব। সে যখন-তখন ইয়ার্ডের আশপাশে ঘুরে দেখে যেত কাঁঠাল গাছে বাঁধা তার রশির মর্যাদা ঠিক আছে কিনা। তেমনি ঘুরতো ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাদারল্যাণ্ড। ইনসিন জেলে পাঁচজন ডাক্তার। এঁদের সাথে ভাব করা যায় কিনা—যখন-তখন ডেকে পাঠাতাম। কিন্তু গুরুগম্ভীর সবচেয়ে সিনিয়র মাদ্রাজী ডাক্তারটি ছাড়া আর কারও আমাদের ওখানে আসার হুকুম ছিল না। চট্টগ্রামবাসী বাঙালী কম্পাউণ্ডারটি ঔষধ খাওয়াবার নাম ক'রে দুপুরে, যখন কেউ থাকত না, তখন দু'দিন এলেন। সাবধান ক'রে দিলাম, আর যেন না আসেন। কিন্তু উনি লোভ সামলাতে পারেননি। তৃতীয় আর একদিন এসেছেন, পাঁচ মিনিটও কাটেনি, সাদারল্যাণ্ড এসে উপস্থিত। অর্থাৎ, কোনো গুপ্তচর খবরটি দিয়েছে। সাদারল্যাণ্ড ভালো মানুষটির মতো—যেন আমাদের সাথেই গল্প করতে এসেছে—এসে ওঁকে জিজ্ঞেস করে, কিছু কাজ আছে?

উনি বলেন, ঔষধ খাওয়াতে এসেছি।

হয়ে গিয়ে থাকলে এখন যাও।

হুকুম হয়ে গেল কম্পাউণ্ডারের মৌলমীনে বদলীর, ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলায় রওনা হতে হবে।

নিরপরাধ বেচারীর কথা ভেবে মনে হতে লাগল, আমাদের সংস্পর্শও এত বড় পাপের!

ইতিমধ্যে খবর পেলাম আমাদের সেই মেমোরিয়ালের জন্য বেসিনের চীফ জেলার ভগবান সিং সাসপেণ্ড হয়েছেন। বর্মার জেলারদের তখন আটটি গ্রেড ছিল। তার ভিতর ফস্টার ও রিচার্ডস্ ফার্স্ট গ্রেডে। সেকেণ্ড গ্রেডের কয়েকজনের ভিতর ভগবান সিং একজন। ডেপুটি জেলার নাইকার তাঁর বিরুদ্ধে মালমশলা যত পেরেছে সংগ্রহ ক'রে দিয়েছে। সাসপেণ্ড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেচারীর brain paralysis হয়ে গেছে। এখন সরকারের অনুমতি নিয়ে ইনসিনে বাড়ি ভাড়া ক'রে আছেন, চিকিৎসা চলছে। একটু সুস্থ হয়ে উঠছেন।

একদিন ভোর বেলা অফিসে ডাক পড়ল। গিয়ে দেখি আই. জি বসে আছেন। বললেন, আমাদের সেই মেমোরিয়াল সম্পর্কে আমায় দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করতে চান।

প্রথম প্রবৃত্তি জাগল, কোনো কিছু বলব না। সেইভাবেই শুরু করলাম। তখন দেখি, মেঃ তারাপোর ভগবান সিংকে ডেকে পাঠালেন। তখনই ঠিক করলাম, একে বাঁচাবার মতো যা কিছু বলবার বলব, যা কিছু দায়িত্ব আমার আর জীবনের ঘাড়েই নেব।

সব প্রশ্নের মধ্যে বড় হয়ে দাঁড়াল কাগজের প্রশ্ন। আমি বলি, কত কাগজ নিয়েছি, তা আমার সঠিক মনে নেই, তবে ৮০।১০০খানার কম নয়, কারণ জীবনের টাইপ করা কখনও অভ্যাস ছিল না, তিনি অনেক কাগজ নষ্ট করেছেন। তাছাড়া নকলও আমরা একটা রেখেছি।

ভগবান সিং বল্লেন, তিনি ২৪খানার বেশী কাগজ দেননি। আমি বার বার নানা কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিই, যাতে তাঁর দায়িত্ব কমে যায়। কিন্তু বেচারী কেমন হতভম্ব হয়ে গেছেন, কোন কথাই যেন বুঝতে পারেন না।

মেঃ তারাপোর তখন যা বললেন, তার মর্ম এই: সমস্ত ভারতবর্ষের কাগজে মেমোরিয়ালটির নকল বেরিয়েছে। মেমোরিয়ালে কি আছে না আছে, গবর্নমেণ্টের পক্ষে তা কতখানি ক্ষতিজনক, তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু ইণ্ডিয়া গবর্নমেণ্ট চায়, এ নিয়ে এমন একটা দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে যেন এই রকমভাবে আর কোনো কাগজ জেল থেকে না বের হতে পারে। এই পাঁচখানা ফাইল আমি সঙ্গে ক'রে এনেছি। এত বড় বড় আরও ডজন দু'য়েক ফাইল জমেছে আমার অফিসে এই মেমোরিয়াল সম্পর্কে। আপনি যা বলেছেন, মিঃ চ্যাটার্জিও অন্য এক জেলে (জীবন তখন X-ray করাবার জন্য রেঙ্গুন জেলে এসেছেন) আমার কাছে ঐ একই ধরনের সব কথা বলেছেন। আপনাদের দুজনের কথা মিলে যাচ্ছে। যেদিন জেলের রেকর্ডেও পাচ্ছি ৮০খানা কাগজ আপনারা নিয়েছেন। অথচ ইনি (ভগবান সিং) বার বারই বলছেন, উনি ২৪খানার বেশী কাগজ দেননি।

আমি ভগবান সিংকে বলি, মনে ক'রে দেখুন. আমাদের দরখাস্তখানাই তো ছিল ২৪ পৃষ্ঠার।

মেঃ তারাপোরের কথার ভাবে স্পষ্ট বুঝলাম, খুব সহানুভূতির সাথেই তিনি ভগবান সিং-এর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করছেন। আমি বললাম, কোনো কারণে ওঁর স্মৃতিভ্রম হচ্ছে।

অল্পদিনের ভিতরই মেঃ তারাপোর ওঁর সাসপেণ্ড অর্ডারটা কাটিয়ে দিলেন। ভগবান সিং ইনসিনেই যোগ দিলেন। অল্প দিন ছিলেন। একদিন কি দু'দিন

দেখা হয়েছিল। ওঁকে দেখলে কষ্ট হতো।

এর মধ্যে একদিন দেখা মিঃ মজিদের সঙ্গে—থেইট্‌মিও জেলের চীফ জেলার। দ্বিতীয় মেমোরিয়াল সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য তাঁকে ওখানে বদলী ক'রে এনেছে। বিষণ্ণভাবে বললেন, চাকরি থাকবে না। সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম, কি কি বলতে হবে বলে দিলাম—আমার ঘাড়ে যেন সব কিছু চাপিয়ে দেন, আমি সব স্বীকার ক'রে নেব।

এঁকেও ভুগতে হল। তবে মেঃ তারাপোরের চেষ্টায় চাকরিটি বজায় রইল। ইনিও সেকেণ্ড গ্রেড জেলার।

মনের উপর বিষণ্ণতার চাপের এই একটি দিক। পড়াশোনার সুযোগ কম। রেঙুন পাবলিক লাইব্রেরী থেকে কিছু কিছু বই পাই—রেঙুন সি. আই. ডি-র যেসব বই দিতে আপত্তি না থাকে। উপন্যাসের সঙ্গে আর যা পাই বেশীর ভাগ ভ্রমণবৃত্তান্ত। সোয়েন হেডিনের বইগুলোতে এক এক সময় মেতে থাকি। এছাড়া অপরাধতত্ত্ব ও অপরাধীদের মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু কিছু বই পাঠান মেঃ তারাপোর।

সঙ্গী ত্রৈলোক্যবাবু। তাঁর সঙ্গ পাইনে। পড়াশোনা তিনি যা করেন, তার বিষয়বস্তু, আদর্শ, উদ্দেশ্য ভিন্ন। রাজনীতির দিকে, দলগড়ার রাজনীতির বাইরে আর কোনো কিছুর সন্ধান পাইনে। মানুষ হিসাবে, আমিও যখন ১৯১১-'১২ সালে অনুশীলনের ভিতর ছিলাম, বয়োজ্যেষ্ঠরা বঙ্কিমের ভবানী ঠাকুরের "দোকানদারী চাই" কথাটার উপর বেজায় বেশী জোর দিতেন। এমন কি, সেবাশুশ্রূষাটাও দোকানদারীর অঙ্গ। অথচ আর একজনকে স্বস্তি তৃপ্তি দেবার চেষ্টা ক'রে ক'রে যৌবনে নিজেকে অতিক্রম ক'রে যাবার সাধনায় সেবার চেয়ে সহজ পথ আর তো খুঁজে পাইনে! দোকানদারীর শিক্ষাতে অনেক মানুষের অনিষ্ট হয়েছে বলে আজও আমার ধারণা।

ইমার্সনের লেখায় পড়েছি, 'Every man's nature is a sufficient advertisement to him of the character of his fellows.' এই বিজ্ঞাপনটি হতে মোটেই প্রস্তুত নই। শ্রীঅরবিন্দের লেখায় পড়েছি, তাঁর সঙ্গে আলাপে বুঝেছি—রবীন্দ্রনাথে তার সমর্থন মিলেছে—রক্তমাংসের মানুষ পশু, কিন্তু রক্তমাংস ছাড়া সে আর যেটুকু, সেটুকুতে সে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, মানুষের সমাজকে পশুর সমাজের স্তর থেকে দেবসমাজের স্তরে তুলতে চায়।

যতীনদার স্বাধীনতার সাধনা ছিল এই সাধনারই অঙ্গ। ইদানীংকার বয়ো-

জ্যেষ্ঠদের মধ্যে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সঙ্গে খুবই সামান্য সময়ের আলাপ—তাতে যা বুঝলাম, তাঁরও সাধনা এ থেকে পৃথক নয়। গান্ধীজির সঙ্গে নাগপুরে তিন দিন ধরে হিংসা-অহিংসার যে আলোচনা, তারও ভিতর পেলাম, তাঁর অহিংস সমাজ আর অরবিন্দের দেবসমাজ লক্ষ্যে, আদর্শে এক—উপায়েই মাত্র পৃথক।

কিন্তু এই যে দেবত্বে প্রতিষ্ঠা, এ তো দোকানদারীর ব্যাপার নয়—এ যে ভিতর থেকে মানুষের আমূল পরিবর্তন—মানুষের প্রতিটি কণাকে ধুয়ে-মুছে শোধন ক'রে নেওয়া। রক্তমাংস মানুষকে পশুত্বে ধরে রাখতে চায়, আবার এই রক্তমাংসই—অনুভূতিতে বুঝি, পুরাণে উপন্যাসে পড়ি—মানুষকে পশুত্বের উর্ধ্বে নিয়ে যেতে চায়, নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে যে প্রতি মুহূর্তের সজাগ সাধনা। আর এখানে যদি 'দোকানদারী'র কাঁথা মুড়ি দেবার অবসর থাকে, তা-হলে তো এই সাধনার কঠোরতা থেকে অক্লেশ অব্যাহতি।

আদর্শের সংঘর্ষ অন্যদিকেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অরবিন্দের লেখায় সাধনার উপায় হিসাবে, গীতা উপনিষদের শিক্ষার ধ্যানে, বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাতেও পেয়েছি—আত্মসমর্পণ। জীবনের ঐ চৌদ্দ-পনেরো বছর ভিতরে ভিতরে নিজেকে মুছে ফেলবার কল্পনাই, যত অক্ষম সংকল্পেই হোক, মনের ভিতর স্থান পেয়েছে। কিন্তু আজ দেখি, এই আত্মসমর্পণের সঙ্গে শক্তির সাধনার সামঞ্জস্য এক—হয়তো যতীন্দ্রনাথের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভব।

সততার সঙ্গে যাঁরা সাধনা করেছেন, আমাদের সেদিনের এমন অনেকে হয়তো এই কারণেই পরবর্তী জীবনের রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের তেমন ক'রে খাপ খাওয়াতে পারেননি। অথচ যে-যুগে আমরা সবাই জানতাম, ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের মরতে হবে, তিলে তিলে জীবন বিসর্জন দিয়ে যেতে হবে শুধু দেশকে জাগাবার লক্ষ্যেই, সে-যুগের পক্ষে বোধহয় শ্রেষ্ঠতর পথই ছিল ঐ আত্মসমর্পণের পথ, নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলার পথ।

পাড়া-গাঁ থেকে একদিন গরীবের ছেলে শহরে এসেছিলাম লেখাপড়া শিখতে। নিজেকে কোনো কিছুতে সামনে দাঁড় করাতে সংকোচে বাধত। পনেরো বছর বয়সে রাজনীতির ক্ষেত্রে হাতেখড়ি হয়েও নানা শিক্ষার ভিতর যেটি নিজে দীক্ষার জন্যে বেছে নিলাম, সেটি ঐ আত্মসমর্পণের মন্ত্র। এর সঙ্গে খাপ খেয়ে গেল শশীদার শিক্ষা—নিজেকে মুছে ফেলার শিক্ষা। এর ভিতরও শক্তির পরিচয় ফুটতে পারে, কিন্তু সে অন্য ধরনের শক্তি।

যতীনদা নেই। আজ যাঁদের পিছনে, যাঁদের নীচে স্থান নিতে চাই, সে

যোগ্যতা তাঁদের নেই, ইচ্ছার সংকল্পের দৃঢ়তাও নেই। অথচ পনেরো বছর নিজেকে একটা ধারায় আপ্রাণ ধরে রেখে আজ আবার নতুন ক'রে আত্ম-প্রতিষ্ঠার কল্পনা, নিজেই বুঝি, প্রায় একটা স্বপ্নের মতো। ভাবি, সবাই মিলে চলব, সবার বুদ্ধিতে শক্তিতে যে গতিবেগ সৃষ্টি হবে, আমি তারই পেছনের বাহিনীতে স্থান ক'রে নেব। তবু যেন একটা ভবিষ্যতের ব্যর্থতার ছায়া মনে নেমে আসে। তার সঙ্গে সঙ্গে যতবার একটা আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা জাগে, যেন নিজেকে চেপে দেবার জন্যে সমস্ত প্রাণের আকুলতাকে কুড়িয়ে এনে গান ধরি—কে শুনল, শুনে কে হাসল, কে কি ভাবল, সেসব ভাবিনে—

আর আমারে বাইরে তোমার
কোথাও যেন না যায় দেখা।
তোমার রাতে মিলাক আমার
জীবন সাঁঝের রশ্মিরেখা।
আমায় ঘিরি' আমায় চুমি'
কেবল তুমি, কেবল তুমি।
আমার বলে যা আছে, মা,
তোমার ক'রে সকল হরো।

বিষাদের আরও কারণ ছিল বাইরের অবস্থার ভিতর। এটা জানা কথা, সুযোগ-সুবিধা মিললেই ওরা আমাদের দলবল, সংঘশক্তি, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান সবই ভেঙে দেবে। কিন্তু তাতেও কিছু সান্ত্বনা মেলে না।

১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু ক'রে ১৯২৪ সালের অক্টোবরের ভিতর তিন ঝাঁকে আমরা সবাই ধরা পড়ি। তার ভিতর শেষ ঝাঁকে সুভাষ, সত্যেনদা, মধুদা, হরিদা, অমর ঘোষ প্রভৃতি যখন ধরা পড়েন, তখন আমাদের দিক থেকে কংগ্রেস দেখবার লোক একমাত্র অবশিষ্ট রইলেন সুরেশ দাস। দেশবন্ধু অবশ্য যখন দেখলেন, যুগান্তরের কর্মীদের ধরে পুলিশ তাঁর স্বরাজ্য দলের উত্থান রোধ করতে চায় তখন তিনি সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং যুগান্তরের লোক নিয়েই বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস গঠন করলেন। কিন্তু এঁদের অনেকেই তখন কর্মজীবন থেকে অবসর নিচ্ছেন। কাজেই দলের প্রাধান্য থাকলেও প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল না—সেটা পরে খানিকটা দিয়েছিল সুরেশবাবু যখন 'কর্মীসংঘ' গড়ে তোলেন। এঁ থেকেই প্রাদেশিক

কংগ্রেসে যুগান্তরের যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাই ১৯৩০-৩২ সালে এক হাতে কংগ্রেস আন্দোলন, অপর হাতে বৈপ্লবিক কাজকর্ম পরিচালনার সুযোগ এনে দেয়।

কিন্তু কংগ্রেস বা স্বরাজ্যদলের সাধারণ প্রচার কাজ ছাড়াও মঠ, আশ্রম ও বিদ্যাপীঠ জাতীয় আমাদের কতকগুলি স্থায়ী কেন্দ্র ছিল। সেগুলির কথা আগে বলেছি। ধরপাকড়, খানাতল্লাশী ক'রে, আশপাশের লোককে ভয় দেখিয়ে পুলিশ এগুলিকে উৎখাত করবার চেষ্টা করতে লাগল। অমরদা (চ্যাটার্জি) ধরা পড়াতে উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠ উঠে গেল। কুন্তল ও চারুর মৃত্যুতে এবং কিরণদা (মুখার্জি) ধরা পড়াতে দৌলতপুর সত্যাশ্রম নির্জীব হয়ে পড়ল। দু'একজন কর্মী যাঁরা থাকেন, তাঁদের সম্পর্কে কলেজে ছাত্র ও অধ্যাপকদের ভিতর, পাশের গ্রামের লোকদের যার কাছে যেমন সুবিধা প্রচার চলে। ডায়মণ্ডহারবার (আবদালপুর) সত্যাশ্রম সম্পর্কে কারও কাছে বা বলে, ওটা বিদেশ থেকে আমদানি অস্ত্র তুলবার ঘাঁটি, কারও কাছে বা বলে, ওখানকার কর্মী রসিকলাল দাস প্রেত-সাধক।

বন্ধুবান্ধব সবাই ধরা পড়ে যাবার পর দলের দিক থেকে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যে কয়টি দায়িত্বশীল কর্মী অবশিষ্ট ছিলেন, তার ভিতর রসিকের উপর অনেকখানি নির্ভর করতাম। আবদালপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হবার সময় জানা গিয়েছিল, কর্মকেন্দ্র হিসাবে ওটা একটা বিশিষ্ট স্থান পাবে। প্রতিষ্ঠিত হবার কয়েক মাস পর ওখানে গিয়ে দেখি, সেটা একেবারে ভুল ধারণা। চমৎকার জায়গাটি, গঙ্গার ঠিক উপরেই—গঙ্গা ওখানে প্রায় মাইল তিনেক চওড়া। আশ্রমটি গঙ্গার বাঁধের বাইরে—বর্মার পথে জাহাজ থেকে জীবনকে, সতীশদাকে দেখালাম।

কিন্তু আশ্রম থেকে অন্ততঃ বিশ মিনিটের পথের ভিতর কোনো দিকে লোকালয় বলে কিছু নেই। আশ্রমের ভিতরেও অন্য কোনো লোক রাখবার সুযোগ নেই। আশ্রম এখানে যিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়েছিলেন, তাঁর বাবাও ও-প্রতিষ্ঠানের বিরোধী। দুপুরে এবং রাত্রে বাবা ঘুমিয়ে পড়লে দিন ১টা-১৷৷টায় এবং রাত ১১টা-১১৷৷টায় মায়ের কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কোনো বেলায় দু'টো চুনোমাছের ঝোল আর ভাত, কোনো বেলায় স্রেফ খেঁসারির ডাল আর ভাত ভদ্রলোক দিয়ে যেতেন। এর ভিতর সকাল-বিকেলে দুটো মুড়িও যদি দৈবাৎ মাসে দু'তিনদিন জুটে যেত তো ভালো। তার উপর কোনো লোকজনের

গতায়াত নেই বললে চলে। কোনো কাজ নেই, কর্ম নেই—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই জীবন কাটাচ্ছেন রসিক।

আমি আপত্তি তুললাম। একটি যুবক, কর্মের উদ্যমে লেখাপড়া ছেড়ে বেরিয়েছেন কাজের সুযোগ খুঁজতে। তাঁর জীবনকে এইভাবে নষ্ট করবার অধিকার আমাদের নেই। একজন বন্ধু এর ভিতর আমার সংকীর্ণ দলীয় অভিসন্ধি খুঁজে পেলেন। তা সত্ত্বেও আমি রসিককে ওখান থেকে সরাতে কৃত-সংকল্প হয়ে উঠি। কিন্তু ইতিমধ্যে ধরা পড়ে যাই। আরও দু'একজনকে রসিকের সঙ্গে রাখবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু কেউ টিকতে পারেনি। ছয়টি বৎসর ঐভাবে রসিক ওখানে শুধু ক্যাসাব্যায়ানকার প্রকৃতির পরীক্ষা দেন। নিজের পরিবার বলতে যা ছিল তাকে নিঃস্ব ক'রে তোলেন। পরে তো তা একেবারে মুছেই যায়। জীবনও ওঁর নষ্ট হয় বলতে হবে। ওখানে আশ্রম করার চেষ্টা সফল হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু আমরা সবাই ধরা পড়ে যাবার পর রসিক অন্যদিকে নিজের কর্মশক্তিকে নিয়োজিত করেন—যার অভিব্যক্তি পরবর্তীকালে অনুজা সেন, দীনেশ মজুমদার, অতুল সেন-এর আত্মনিবেদনে।

আশা ক'রে থাকি, রসিক যতদিন বাইরে আছেন, আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব না। কিন্তু কোনো খবর পাইনে. ইনসিনে বসে আশ্রম মঠগুলোর উপর উৎপাতের খবরই কেবল পাই।

বাংলা দেশের জেলের খবর ত্রৈলোক্যবাবুর মারফত যা পেলাম, তা-ও আশাপ্রদ নয়। ১৯২৪ সালের অক্টোবরের ধরপাকড়ের পর দুই দলের নেতারা অনেকে মেদিনীপুর জেলে জোটেন। তাঁরা নাকি দুই দলের এক হয়ে যাবার কথা পাকা ক'রে ফেলেছেন। কি ভাবের মিলমিশ হবে যখন জানতে চাইলাম, ত্রৈলোক্যবাবু বললেন, আপনারা public কাজ নিয়ে থাকবেন, আমরা secret কাজ করব।

চমৎকার মিলমিশের ব্যবস্থা তো!—আমি বলি।

অনেকবারের অভিজ্ঞতার পর অনুশীলনের সঙ্গে আমাদের মিলমিশের আলোচনার নাম দিয়েছিলাম—শেয়ালের যুক্তি। এই যে 'পাকা কথা হয়েছে' বলে আমায় মেদিনীপুর থেকে বার্তা পাঠানো হয়েছে, এর ভিতরও মনে হল, হয় অনেকখানি ফাঁকি আছে, নয়তো বার্তাবাহক আপন মনের মাধুরী মিশিয়েছেন।

সব দিকের আঁধারের ভিতর দিয়ে ভবিষ্যৎ আকাশের গায়ে আলোর সন্ধান

খুঁজি। চারিদিকের কপাট বন্ধ। এরই ভিতর কাছের জানালা একটি খুলল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে।

সেলের নতুন খোলা জানালার পেছন থেকে একদিন এক সেপাই এসে আত্মপরিচয় দিল। তার নাম জীবট উপাধ্যায়। রেঙ্গুনে একটি আড্ডায় পাঁচ-সাতটি, দশ-বারোটি বাঙালী যুবক একত্র হন। ইনসিনেও তাঁদের আড্ডা আছে। তাঁদের ভিতর একজন চিঠি লিখেছেন। একটি বিশেষ সময়ে জীবট আমায় চিঠি দিয়ে যাবে।

চিঠিতে যাঁর নাম পেলাম, তিনি জিতেন ঘোষ, ঢাকায় বাড়ি। তিনি আমার নাম জানেন, জীবনকে ও পূর্ণদাকে চেনেন। রেঙ্গুনে দল করতে শুরু করেছেন।

চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলতে লাগল। কয়েক দিনেই বুঝলাম, জিতেন অত্যন্ত উৎসাহী কর্মী। এর ভিতরেই সারা বর্মায় ভারতীয় ছাত্রদের একটি সংঘ গড়ে তুলেছেন।

আমাদের বাজার করত একটি মুসলমান সেপাই, গফুর—কর্তৃপক্ষের একান্ত বিশ্বাসী। ইতিমধ্যে তাকে দিয়ে আমি রেঙ্গুন থেকে *Forward* আনাতে শুরু করেছি। জীবটের আমার সঙ্গে কদাচিৎ কখনও দেখা করার সুযোগ মিলত। কিন্তু গফুর তো দু'বেলাই আসত। হঠাৎ একদিন দেখি জিতেন গফুরের সঙ্গেও ভাব ক'রে নিয়েছেন। তার মারফত চিঠি পাঠিয়েছেন। এখন থেকে চিঠি চলে নিয়মিত। ফস্টারের রশি তখনও কাঁঠালগাছে শক্ত ক'রে বাঁধা রয়েছে।

চিঠিতে এবং কাজে জিতেনের পরিচয় পেয়ে ক্রমে তিলা মহম্মদের কাছে ও উ পীন নীয়া জ্যাটার কাছে ওঁকে পরিচয়-পত্র দিই। তিলা মহম্মদ সানন্দে জিতেনদের কিছু কিছু অর্থসাহায্য করতে থাকেন। ভিক্ষু জ্যাটার সঙ্গে প্রোমে গিয়ে জিতেন পরিচয় করেন আরও পরে। আমিও বলি, জিতেনও বোঝেন, বর্মায় বর্মীদের সাথে না মিশতে পারলে বিপ্লব চেষ্টার কোনো অর্থ হয় না। এদিকে এই ভিক্ষুক অনেকখানি সহায় হন।

ইতিমধ্যে যে-সিপাই আমাদের দুধ আনত, তার ট্যাক থেকে একদিন একখানা চিঠি আমার হাতে পৌছাল, সে-চিঠি দেখি চট্টগ্রামের নির্মল সেনের।

এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু আমি আশা করতে পারিনি। আমি ও চারু ১৯২২ সালে চট্টগ্রামে "সাম্যাশ্রমে" সূর্য সেনের সঙ্গে যখন ছিলাম, তখন সেখানে যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তার ভিতর অন্তরঙ্গ ছিলেন সূর্যবাবুর

পরেই নির্মল। নির্মল সত্য সত্যই নির্মল এবং সূর্যবাবুর সঙ্গে আমাদের যতগুলি কর্মী তখন জুটেছিলেন, তার অধিকাংশকে বোধ হয় নির্মলই টানেন। ক্রমে নির্মলের সঙ্গে চিঠিপত্রে জানতে পাই, চট্টগ্রাম এ. বি. রেলওয়ের টাকা লুঠের পর ওঁরা অনেকে বর্মায় গেছেন। এঁদের ভিতর লোকনাথ বল, মণি দে, উপেন ভট্টাচার্য (অবনী), রাখাল দে, গোবিন্দ বিশ্বাস এবং আরও অনেকের সঙ্গে আমার চট্টগ্রামে পরিচয়, কেউ কেউ দৌলতপুর সত্যাশ্রমের কর্মী হিসাবেও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। মাঝে মাঝে এঁরা বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইশারায় কথাবার্তা বলে যেতেন, আমি আমাদের দোতলায় শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়াতাম। এইভাবে সুযোগ মতো দেয়ালের উপর দিয়ে কখনও কখনও জিতেনদের সঙ্গেও চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলত।

নির্মলদের সঙ্গে জিতেন ইতিমধ্যেই পরিচয় ক'রে নিয়েছেন এবং একযোগে কাজ করছেন। প্রকাণ্ড একটা শক্তি গড়ে উঠছে।

জিতেনই আমায় খবর পাঠিয়েছেন, অনুশীলনেরও জনকতক কর্মী আছেন রেঙুনে। তাঁদের একজনের একটা বইয়ের দোকান আছে, সেইটিই তাঁদের কেন্দ্র। তাঁরাও আলাদাভাবে বাঙালী ছেলেদের ভিতর দল গড়ছেন। জিতেন লিখলেন, এর ভিতরই রেষারেষি লেগে গেছে। এর তো কোনো প্রয়োজন নেই। আপনারা দু'জনায় জেল থেকে লিখে পাঠালে আমরা এক সঙ্গে কাজ করতে পারি।

জিতেন ও নির্মলদের সব খবরই এ পর্যন্ত ত্রৈলোক্যবাবুকে বলেছি। তিনিই খবর নিয়ে এসেছেন, বাংলার জেলে আমাদের দুইদলের মিলমিশ হয়ে গেছে। এখন খেয়ে দেখতে চাইলাম পিঠে কেমন লাগে। ত্রৈলোক্যবাবু জ্বলে উঠলেন, বললেন, আপনি ওদের কাছে লোকজন পাঠিয়ে ওদের সন্দেহভাজন ক'রে তুলবেন না।

আমি হেসে বললাম, আচ্ছা। কিন্তু বর্মায় বসে তিনটে বাঙালী ছেলের দলাদলি পাকিয়ে কোন্ বিপ্লব করবে, মহারাজ?

জিতেনকে লিখলাম, তোমরা এবং নির্মলরাই একযোগে কাজ ক'রে যাও। ওঁদের বাদ দাও। বর্মীদের সঙ্গে মিশতেই বিশেষ ক'রে চেষ্টা কর।

সেটা লেখা বাহুল্য। নির্মল এবং জিতেন সে-চেষ্টা আগে থেকেই করছিলেন।

ক্রমে বাংলার সঙ্গে লোক মারফত চিঠিপত্রের যোগাযোগ হল। দু'একজন ক'রে কর্মীও বর্মায় যেতে লাগলেন এবং এখানে-ওখানে কাজ করতে শুরু করলেন। পরে ১৯৩০-৩১ সালের বর্মাবিদ্রোহের সময় যখন জিতেন ও তাঁর সহকর্মীরা অন্তরীণাবদ্ধ হন, এঁদের ভিতর সেনহাটির (খুলনা) রবি রায় দশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরিত হন।

রসিকের কাছ থেকে চিঠির জবাব পেলাম: অবস্থা নৈরাশ্যজনক। আমি যাঁদের কথা লিখেছি, তাঁদের অনেকে ভয় পেয়েছেন, অনেকে কাজের উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। তারই ভিতর দু'টি জায়গা থেকে আশাতীত সাড়া পেয়েছেন। প্রথম, শৈলেশ্বর বোস। ১৯১৫ সালে বালেশ্বরে যতীনদার আশ্রয়-সৃষ্টির ও অস্ত্র আমদানির কাজে শৈলেশ্বরবাবুই প্রথম ওখানে 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' বলে দোকান খোলেন। পুলিশ যখন যতীনদার সন্ধান পায় তখন শৈলেশ্বরবাবু ধরা পড়ে জেলে যান এবং কিছুদিন পরে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হন। পর পর আরও দু'টি ভাই, শ্যাম ও কানাই-ও, ধরা পড়েন এবং ঐ রোগেই তাঁদের মৃত্যু হয়। এখন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শৈলেশ্বরবাবু দীপ জ্বালিয়ে রাখছেন। অনুজা ও রসিকের সাহায্যে বিভিন্ন জেলায় গ্রামে গ্রামে দল গড়ছেন।

দ্বিতীয়, টগর (ডঃ অমিয় বোস) ও জিম (ডঃ বীরেশ গুহ)। এঁরা ছেলে বয়স থেকে আমাদের পরিচিত। কিন্তু কাজে যে এতটা উৎসাহ দেখাবেন, আগে তা কেউ মনে করেনি। এখন এঁরা কয়েকটি বন্ধুতে মিলে কলকাতায় একটি ভালো দল গড়ে তুলেছেন। মফঃস্বলেরও অনেক জেলার কর্মী এঁদের সঙ্গে জুটেছেন। এই চক্রের সঙ্গে যোগাযোগেই শরৎবাবু 'পথের দাবী' লেখেন। এঁদের বন্ধু উমাপ্রসাদ মুখার্জি তখন 'বঙ্গবাণী' বলে মাসিক পত্রিকাখানি দেখা-শোনা করেন। সেই পত্রিকাতেই 'পথের দাবী' প্রথম বের হয়। রাসবিহারী বাবু ও যাদুদার কাহিনীর টুকরো-টাকরা সব্যসাচী চরিত্রের উপাদান।

বাইরের সঙ্গে পত্রালাপের ও কাজকর্মের সঙ্গে একটু সম্পর্ক রাখবার এই সুযোগ পেয়ে ইনসিনে সর্বব্যাপী বিষাদের চাপ থেকে একটু মুক্তি পাই। জেল এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ কিন্তু আমাদের ভুলে যায়নি। আমাদের সেই মেমোরিয়াল সম্পর্কে জেলের তরফ থেকে তদন্তের কথা আগেই বলেছি। পুলিশের আনা-গোনাও চলছিল।

মেমোরিয়াল প্রকাশ নিয়ে বর্মার জেল কর্তৃপক্ষ ভারত গবর্নমেণ্টের বিরাগ-ভাজন হয়েছে। কয়েকজন উচ্চপদস্থ জেল কর্মচারী বিপন্ন হয়েছেন। তথাপি মেজর তারাপোর এবং মেজর ফিগুলে আমাদের সুখ-সুবিধার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেন। নালিশ আমাদের নানামুখী—মনের কথা, মান্দালে যেতে চাই। ইনসিনে আমাদের বাঙালীর পক্ষে তেমন কিছু গরম নয়। তবু গরমের জন্যে নালিশ করতে ছাড়িনে। মেজর ফিগুলে আমতলায় এক টালির ঘর তৈরী করিয়ে দিলেন—দিনের বেলায় সেখানে বসে পড়াশুনো করব। টালির উপর খড়ের ছাউনি। আমগাছে টিনের কানিস্তারা বেঁধে দেওয়া হল, তা' থেকে জল পড়ে খড় ভিজিয়ে ঘর ঠাণ্ডা রাখবে।

ওখানে বসি, শুধু যেন জেল ও পুলিশ অফিসাররা ঘরে না ঢোকে, ওখানে বসেই কথাবার্তা বলে চলে যায়। আই. বি-র ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যোগেন ভট্টাচার্য মাঝে মাঝে আসে। আমাদের মেমোরিয়াল ছাপার অক্ষরে প্রথম ওর কাছেই দেখি।

হঠাৎ একদিন বলে, এখানে আর রেঙ্গুনে একদল বাঙালী ছেলে জুটেছে। তাদের গতিবিধি ভালো মনে হচ্ছে না। বলে, আর আমার মুখের দিকে তাকায়। জিতেন ও নির্মলকে সাবধান ক'রে দিই—তোমাদের উপর নজর পড়েছে।

তা সত্ত্বেও ওঁরা পরে বর্মা থেকে কিছু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ক'রে বাংলায় পাঠাতে পেরেছিলেন।

মান্দালের সঙ্গে যোগাযোগ তখনও খুব ছিল না। তবু মনের যোগ তো ছিলই। প্রথমটা ত্রৈলোক্যবাবু যখন আসেন, সুভাষ বলে দিয়েছিলেন, দু'টাকা ক'রে দৈনিক খাবার খরচ যেন মেনে না নিই। সুভাষকে এক সংকোচে ফেলেই এই ব্যাপারে ঝগড়ায় উন্মুখ ক'রে তুলেছিল। যখন আর সবার দৈনিক ভাতা দুই টাকা, সুভাষের জন্য বরাদ্দ করেছিল ছয় টাকা দশ আনা।

তিনি এটা নিতে অস্বীকার করতে চান। বন্ধুরা বলেন, কেন অস্বীকার করবেন? খাওয়া তো আপনার জন্য আলাদা কিছু হচ্ছে না। বরং আসুন, আমাদেরও ভাতা বাড়াতে চেষ্টা করি। ওঁরা দৈনিক সাড়ে তিন টাকা চার টাকার মতো জন প্রতি খরচ করতে শুরু করলেন।

ত্রৈলোক্যবাবু এসে বলাতে আমরাও খরচ বাড়িয়ে দিলাম। মান্দালেতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সেই ক্যাপ্টেন স্মিথ। তিনি বেশী মাথা ঘামাবার জায়গাতেই

বেশী ক'রে হাসতেন। আর এখানে জেলার ফস্টার এবং ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাদারল্যাণ্ড। তারা কয়েক দিনের ভিতরই চাপাচাপি শুরু করল। ত্রৈলোক্যবাবু বলেন, আসুন হাঙ্গার স্ট্রাইক করি। আমি বলি, ওটা ইদানীং বেজায় শস্তা হয়ে গেছে, দু'টাকার উপর ভাতা পাবার জন্যে হাঙ্গার স্ট্রাইক করছি, দেশের লোকের কানে সেটা ভালো শোনাবে না, আপাততঃ অন্য পথ ধরতে হবে।

মেজর ফিগুলেকে জানিয়ে দিলাম, যা চাই তা যদি না দিতে পার তো কয়েদীর খানা পাঠিও।

পরদিন খাদ্য যেমন আসবার এল। তা থেকে চাল, ডাল, তরকারি রেখে মাছ, দুধ, চা, চিনি সব ফেরত দিয়ে দিলাম। চা তখনও প্রয়োজনের অন্তর্গত হয়ে ওঠেনি।

দেড়দিন এইভাবে চলল। আই. জি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলে পাঠালেন, বর্মা সরকার দৈনিক তিন টাকা ভাতা করবার জন্য ভারত গবর্নমেণ্টকে লিখেছে। মঞ্জুর হয়ে না আসা পর্যন্ত দু' টাকাই চলবে। আপাততঃ তুমি কয়লা, কাঠ জেলের গুদাম থেকে এবং তরকারি জেলের বাগান থেকে দাও, দাম কেটো না, আর অন্য প্রয়োজনের যতটা medical ground-এ দিতে পার দাও। সর্ববিধ ফল, ডিম, মুরগী, কই মাগুর মাছ, মাখন, সোডালেমনেড, বিস্কুট, এমন কি জ্যাম-জেলী পর্যন্ত medical ground-এ আসতে লাগল।

কিছুদিনের ভিতর দৈনিক তিন টাকা ভাতা হয়ে গেল। কিন্তু সরকারী প্রথানুযায়ী 'আপাততঃ'-গুলোও রয়ে গেল, যাবের বেলাতেও যেমন সেল ও দোতলার হল দুই-ই ভোগ করছিলাম।

আর এক দিক দিয়ে ঝগড়া পাকিয়ে উঠল। আগেকার দিনে আমাদের দেশের যে প্রকৃতির লোক নিয়ে ইংরেজের সব কারবার চালাতে হতো, ওদের ঔদ্ধত্যই বোধ হয় এদের বশ মানাত বেশী ক'রে। এবং এরাই বোধ হয় নতুন ইংরেজ এদেশে এলে তাদের অভদ্রতা শেখাত।

ইংরেজের 'মিঃ' এবং আমাদের 'শ্রীযুতে'র মতো নামের আগে বর্মায় তিন রকমের শব্দ ব্যবহার হয়। সাধারণ ভাবের শব্দটা 'মং', শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নামের আগে লিখতে হয় 'উ', আর যার প্রতি নিতান্তই একটা তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করতে হবে—যেমন চাকর-বাকর শ্রেণীর লোক—তাদের নামের আগে 'ঙা'। Sir George Scott-এর *Burma*-ই কি, বর্মার *Gazetteer*-গুলোই কি, পড়তে গিয়ে দেখি, বর্মার রাজবংশীয় বা নেতৃস্থানীয় যাঁরা দেশের স্বাধীনতার

জন্ম ইংরেজের সঙ্গে লড়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের নামের আগে "এ্যা" শব্দটা ব্যবহার করেছে।

সত্য কথা বলতে কি, বর্মার জেলে থেকে কয়েদী শ্রেণীর এবং দু'একজন জেলার বর্মীকে দেখেও আমি এই স্বভাব-উদার জাতটাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। এবং এদের এই নেতৃস্থানীয় লোকদের সম্পর্কে এই ধরনের উল্লেখ আমার মনে জ্বালা ধরিয়ে দিত।

এই থেকেই প্রথম লক্ষ্য করলাম, আই. বি আমাদের এক-একখানা চিঠি আটক ক'রে স্পারিণ্টেণ্ডেণ্টের মারফত খবর দিয়ে যে চিঠি লিখত, তা'তে না আমাদের নামের আগে, না আমাদের আত্মীয়-স্বজনের নামের আগে 'মিঃ' বা 'বাবু' বা 'শ্রীযুত' জাতীয় কোনো শব্দ ব্যবহার করত। এ নিয়ে প্রতিবাদ ক'রে বার বার লিখলাম, কোনো জবাব পেলাম না। তখন চিঠিতে গালাগাল শুরু করলাম।

চাঁদপুরের নগেন রায়ের কথা আগে বলেছি। মান্দালেতে তিনি আমাদের সাহায্য করতেন। তাঁকে পেয়ে সুভাষচন্দ্রের সুযোগ জুটে গিয়েছিল। এক-একখানা চিঠি আটক করলেও তিনি সে খবর কাগজে শেষ ক'রে দিতেন। আমরা গোপনে *Forward* আনাতাম, তাতে সে সব পড়তাম। একবার দেখি, বেরিয়েছে D. I. G., I. B-র Personal Assistant C. Weale-এর চিঠি। অভ্যাসানুযায়ী লিখেছে:

A letter dated ……from State prisoner, Subhas C. Bose to N. C. Kelkar has been withheld.

The prisoner may be informed accordingly.

সুভাষই যেন তোদের জেলে পড়েছেন যদিও বিনা বিচারে। কিন্তু শ্রীযুত কেলকার তখনকার দিনের একজন সর্বমান্য নেতা। তাঁর বেলাতেও একটুখানি ভদ্রতা রক্ষার প্রয়োজনবোধ নেই!

এরপরই বাবার নামে লেখা আমার একখানা চিঠি আটক ক'রে ঐ রকম অভদ্রভাবেই সে খবর আমায় জানাল। আমি D. I. G-কে লিখলাম:

Your Personal Assistant, C. Weale informs me that a letter from me to my father has been withheld. But neither before my father's name nor mine does he use any courtesy prefix ……..Weale is a public servant and ought to know manners.

The servant may be informed accordingly.

ইতিমধ্যে ফস্টার রেঙ্গুনে চলে গেছে। তার জায়গায় জেলার হয়ে এসেছেন মান্দালের সেই রিচার্ডস। তিনি একদিন হাসতে হাসতে এসে বলেন, What does your friend Weale say? হাতে একখানা কাগজ। তাতে লেখা আছে, বারম্বার offensive ভাষা ব্যবহার করার দরুন নিম্নলিখিত দুই ব্যক্তিকে সাজা দেওয়া হল :

১। ইনসিন জেলের—ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

২। ঢাকা জেলের—অরুণচন্দ্র গুহ

এরা তিন মাস চিঠি পাবে না এবং চিঠি লিখতে পারবে না।

বুঝলাম, ঢাকা থেকে অরুণ দা'ও এই যুদ্ধ চালিয়েছেন।

সাজা আমাদের হয়ে গেল। কিন্তু সাথে সাথে ফর্ম ছাপা হয়ে গেল, তাতে 'মিঃ' সুদ্ধ ছাপা হয়ে রইল, নামের ঘরটা ফাঁকা রইল। এরপর থেকে ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ পর্যন্ত বিনা বিচারের বন্দীদের জন্য এই প্রথাই কায়েম ছিল।

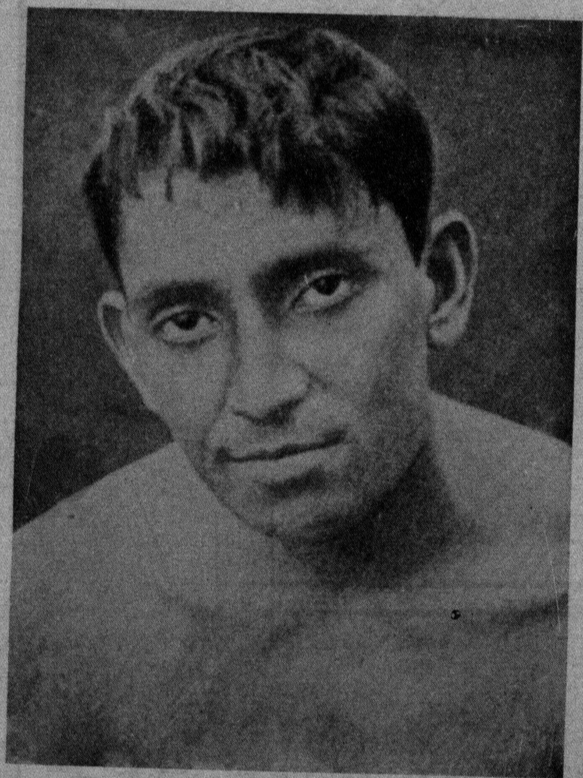
ইনসিনে পরিবর্তন শুরু হল। ত্রৈলোক্যবাবু আমায় সঙ্গ দিতেই এসেছিলেন, আটমাসে বাদে তিনি মান্দালে ফিরে গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন হরিদা—১৯১৪-১৫ সালের 'হ্যারি এণ্ড সন্সে'র হরিকুমার চক্রবর্তী।

জ্যোতিষবাবুও মান্দালেতে অনেক লোকের ভিতর অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলেন। গবর্নমেণ্টের সঙ্গে লেখালিখি ক'রে তিনিও ইনসিনে বদলী হলেন।

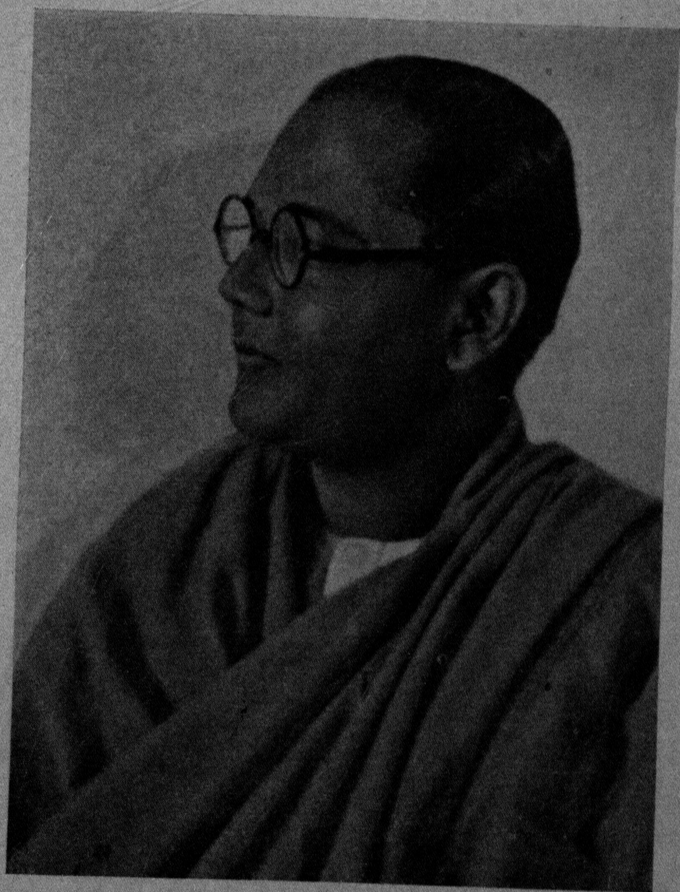
কিন্তু হরিদা এলেন হৃদ্‌রোগ নিয়ে। আর জ্যোতিষবাবু তো বরাবরই অসুস্থ, অথর্ব—প্রায় সব সময় শুয়েই কাটান। খেলাধুলোর সঙ্গী এঁরা হলেন না।

কথায় কথায় বকাবকি, পান থেকে চুন খসলে সাদারল্যাণ্ডকে ডেকে এনে ধমকধামক। সে প্রায় দূরে দূরেই থাকে। ফলে জেলখানার কড়াকড়ি এখন অনেকটা কমেছে। তারই সুযোগ নিয়ে অল্পবয়স্ক তিনটি জেলার, মং নীও, হ্যাণ্ডহার্স্ট এবং নোয়াখালির কাজি আবদার রহমান প্রায়ই এসে জুটতেন। এক সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলতাম। এঁরা কেউ কোনো দিন না আসতে পারলে হরিদা র‍্যাকেট নিয়ে দাঁড়াতেন।

কিন্তু তাঁর কাজ ছিল এঁদের খাওয়ানো। যেমন রাঁধতে পারতেন, তেমনি লোককে খাইয়ে সুখ পেতেন। খেলাধুলোর পর এঁরা পরোটা, মুরগীর মাংস, আবার কোনো দিন হরিদা অন্য যা কিছু তৈরী করতেন, তাই খেয়ে যেতেন। আর ঐ পরিশ্রমে হরিদার ব্যাধির আক্রমণটা সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে এমন



কুন্তল চক্রবর্তী



সুভাষচন্দ্র



শ্রীঅরুণ গুহ

হতো যে তাঁকে ইজিচেয়ারে শুইয়ে কয়েদী দিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে হতো শোবার ঘরে। বারণ ক'রেও হরিদাকে রান্নাঘরে যাওয়া থেকে নিরস্ত করা যেত না। নিজের উপর দুঃখ টেনে এনেও জেলের জীবনে মানুষকে বৈচিত্র্যের খোঁজ করতে হয়।

এই ছেলেমানুষ জেলার তিনটির সাথে এমন বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল যে, বিপদ জেনেও এঁরা যখন-তখন না এসে থাকতে পারতেন না। একদিন সকাল বেলায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসার সময় স্যাণ্ডহার্স্ট এসে উপস্থিত। আমি তাঁকে চলে যেতে বার বার বললাম, কিন্তু তিনি মরিয়া হয়েই যেন বসে রইলেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেখে গেলেন। সেই থেকে ওঁদের আসা বন্ধ হয়ে গেল এবং স্যাণ্ডহার্স্টকে চাকরি ছাড়তে হল।

মং নীও ছিলেন অত্যন্ত ছেলেমানুষ, অত্যন্ত খেয়ালী, কিন্তু খুবই ভদ্র, উদার প্রকৃতির। এঁর বাবাও ছিলেন জেলার, তারাপোরের খুব প্রিয়, কিন্তু সাদার্ল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী। এঁর অল্প বয়সে বাবা মারা যাবার পর মেঃ তারাপোরই এঁকে ডেকে চাকরি দিয়েছেন। তিনি জানতেন, এক মাসীর এবং এক বোনের পরিবার নিয়ে চৌদ্দটি লোক মং নীও'র মুখাপেক্ষী।

অপর দিকে সাদার্ল্যাণ্ড এইবার সুযোগ পেয়ে বাপের উপর যে রাগ, তারই ঝাল ঝাড়ছে এঁর উপর, প্রায়ই খিটিমিটি করে। আমি ওঁকে সাবধানে চলতে বলি, কিন্তু বুদ্ধিমান হয়েও আপন খেয়ালেই চলেন। এক সুযোগ পেয়ে মেঃ ফিণ্ডলেকে দিয়ে সাদার্ল্যাণ্ড ওঁকে সাসপেণ্ড করালো।

স্যাণ্ডহার্স্ট ধরা পড়ার পর মং নীও আমাদের ওখানে না এলেও মাঝে মাঝে গোপনে চিঠি লিখে খবর নিতেন, এটা-ওটা চেয়েও পাঠাতেন। এখন সে সব বন্ধ, জেলের ভিতর ঢোকা নিষেধ।

ওঁর খবর নেবার জন্য মনটা ছটফট করত। একদিন একটা ছুতো ক'রে গফুরকে ওঁর কাছে পাঠালাম। গফুর ফিরে এসে আর যেন কথা বলতে পারে না। কথা বলবার আগে ওর দাড়ি বেয়ে চোখের জল পড়তে লাগল: বাবু, ওখানে আর আমায় পাঠাবেন না। সে চোখে দেখা যায় না।

না খেয়ে খেয়ে ছেলেপিলে মেয়ে-পুরুষ সবগুলো অস্থিচর্মসার হয়েছে। ঘরে একখানি জিনিস নেই। মেয়েদের পরবার লুঙ্গিগুলো পর্যন্ত হয় বিক্রি করেছেন, না হয় বন্ধক দিয়েছেন। চাটাইয়ের উপর চারপাঁচটি মেয়ে পাশাপাশি শুয়ে একখানা বিছানার চাদরে লজ্জা ঢাকছেন।

মনে পড়ল, এমনি দৃশ্য দেখেছিলাম ১৯১৫ সালে ব্রাহ্মণবেড়ের বন্যাপীড়িতদের সেবায় গিয়ে। এক মুসলমানের বাড়িতে সাহায্য দিতে গেছি—বাইরে থেকে ডেকে সাড়া পাইনে, আর যেমন ঘরে ঢুকতে গেছি, বাড়ির কর্তা ধমকে উঠেছেন।···

'গফুর, তুমি একটা কাজ করতে পারবে?'

'যা বলেন করব।'

'এক বস্তা চাল, কয়েক সের ডাল, আলু, ঘি ওঁদের দিয়ে দেবে। মাঝে মাঝে খবর নেবে, যখন যা প্রয়োজন দেবে।'

'দেব।'

বাজারের জিনিসের ফর্দ এবং খরচ আমিই লিখতাম। *Forward* আনবার জন্য এবং ঐ ধরনের অন্য কাজের জন্য গফুরকে মাসে বিশ-ত্রিশ টাকার মতো দিতাম। যে মাস দুই মং নীওকে খাবার ইত্যাদি দিতে হল, সে সময়ের মধ্যে গফুর আর আমার কাছ থেকে কিছু নিতে চাইত না। আমি তবু দু'পাঁচ টাকা দিতাম। এদিকে মান্দালে থেকে সুভাষ ওঁদের পরামর্শে medical ground ইত্যাদি বাবদ নানা জিনিস পেয়েও, খরচের সীমা না মেনেই চলছিলাম। তবু নিজেদের খাওয়া মামুলীর উপরে যায় না।

মেঃ তারাপোর মং নীও'র case নিয়ে অনুসন্ধান ক'রে সব বুঝলেন। মং নীওকে থারাওয়াডির নতুন সেণ্ট্রাল জেলে বদলী করলেন। আর কিছুর জন্য না হোক, উ পীন নিয়া জ্যটা আর মং নীওকে দেখবার জন্যও মুক্তি পেয়ে একবার বর্মায় যাবার ইচ্ছা ছিল। তা আর হয়ে ওঠেনি।

প্রথম প্রথম হরিদার শরীর যতদিন একটু ভালো ছিল, ইনসিনের বিশাল জেলের ভিতর দেয়ালের পাশ দিয়ে জেল ঘিরে যে বাগান, সকাল-বিকাল সেখানে তাঁর সঙ্গে বেড়াতাম। মান্দালেতে হরিদা, মধুদা (সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ) ও অমর (অমরকৃষ্ণ ঘোষ) ছিলেন সুভাষের পড়াশোনার সঙ্গী। এর ভিতর মধুদার বিশেষ অনুরাগ ছিল বাংলার কৃষ্টিসভ্যতা নিয়ে পড়াশোনার দিকে। আর হরিদার ঝোঁক ছিল মনস্তত্ত্বের দিকে, বিশেষতঃ ফ্রয়েডের গবেষণার দিকে। এখন হরিদাকে কাছে পেয়ে আমার পক্ষে পড়াশোনার এই একটা নতুন দিক খুলে গেল।

এ পড়া বিদ্যার প্রয়োজনে নয়, জীবনের প্রয়োজনে—যে-প্রয়োজনে ছেলে বয়সে পড়তাম গীতা, উপনিষদ।

পরিবারের কাছ থেকে, মায়ের কাছ থেকে আপন মনে চোখের জলে বিদায় নিয়েছি দশ বছর আগে। সে পরিবার আমার ভিতর বাসা বাঁধবার জন্য ফিরে ফিরে দেখা দেয়নি, তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছে আমারই সহকর্মী সুরেন কুশারী, কুন্তল, চারু, আরও কারও কারও কথা—পরিবারের প্রতি, মা বাবা ভাইবোনের প্রতি আসক্তি এঁদেরও তো কম ছিল না। তাঁরা যখন সে আনন্দে জীবনে বঞ্চিত থেকেই বিদায় নিয়েছেন, আমার কি অধিকার আছে সেই আনন্দ ভোগ করবার, বা সেই কামনা পোষণ করবার ?

জীবনে অবিবাহিত থাকবার সংকল্পে মনে কোনো দীনতা কখনও দেখিনি। কিন্তু বন্ধুদের কারও কারও কাছে শুনেছি, কখন কি ভাবে কার বিয়ে করবার ইচ্ছা জেগেছে। শুনে সাবধান হতে চেষ্টা করেছি। এই চেষ্টায় নিজের মনে জেনেছি, ও-চেষ্টার পথ শুষ্কতার পথ নয়, স্নিগ্ধতার পথ।

ছেলে বয়সে ব্রহ্মচর্যের কোনো বইতে পড়েছিলাম, পর-নারীর মুখের দিকে তাকাবে না, হঠাৎ চোখে পড়ে গেলে সূর্যের পানে তাকাবে। বাল্যবন্ধু সলিল বলেছিলেন, মায়ের মুখ কল্পনায় আনবে। একটু বেশী বয়সে মনে মনে বুঝেছিলাম, এই সূর্যের পানে তাকাবার বুদ্ধি শুষ্কতার সাধনা। মায়ের মুখ মনে করা মানে চঞ্চলতার জায়গায় একটা স্নিগ্ধতায় মনটাকে ভরে ফেলা।

কয়েক বছর আগে ব্রহ্মচর্যের বইয়ের নামকরা এক লেখকের সাথে পরিচয় হয়েছিল। মুখখানা দেখে দু'চারটে কথা শুনে মনে হয়েছিল, বিশ্বের যাবতীয় মানুষের প্রতি যেন ইনি নিরন্তর ক্রুদ্ধ হয়েই রয়েছেন। ১৯২২ সালে বরিশাল শংকরমঠে অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সদাপ্রফুল্ল এঁর মুখখানা দেখে মনে হয়েছিল, ব্রহ্মচর্য এঁর পক্ষে প্রেমের সাধনা। আজ ফ্রয়েড পড়ে বুঝলাম, একজন ধরেছেন নিজেকে চেপে বিকৃত করার পথ, suppression-এর পথ, আর একজন ধরেছেন নিজেকে বিস্তৃত করবার পথ, sublimation-এর পথ।

ইংরেজি, বাংলা সাময়িক পত্রে ফ্রয়েডের নিন্দা অনেক পড়ি। কিন্তু বৃহদারণ্যকেও তো পড়েছি, "সর্বেষামানন্দানাম্ উপস্থ একায়নম্"—সর্ববিধ আনন্দের একায়ন বা মূল উৎস উপস্থ, সমস্ত স্পর্শের যেমন ত্বক্, সমস্ত দর্শনের যেমন চক্ষু, সমস্ত বেদের যেমন বাক্‌…ইত্যাদি। এটুকু মেনে নেবার পর, ফ্রয়েড সম্পর্কে আপত্তি যা যা, তার মূলে সংস্কারে বাঁধা মন। হয়তো উপনিষদকার আর ফ্রয়েড একই সত্যে পৌঁছেছেন দুই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। তাতে কিছু যায় আসে না।

ইনসিনে একটা বানরী পুষেছিলাম। সঙ্গমের প্রয়োজন এর যে-ঋতুতে উপস্থিত হতো, দেখতাম কি কষ্ট এর—মুখ, পুচ্ছদেশ সব রক্তবর্ণ হয়ে উঠত, মেজাজ অত্যন্ত বিগড়ে যেত, যাকে-তাকে কামড়াত। তখন অনেক সময় আমাকেই মারতে হতো ওকে। কিন্তু যে-ই মারুক, ও আমারই বুকের মধ্যে এসে লুকিয়ে পড়ত। দেখতাম, ওর বুকটা কেমন ধড়ফড় করছে। ওর দুঃখ, আমার নয়। কিন্তু দুঃখ তো দুঃখই। বুঝলাম, কি অবস্থায় অত শতাব্দী আগে কবি লিখেছিলেন—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

ফ্রয়েড পড়ছি, আর বুঝছি, বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা বিয়ে না ক'রে থাকার সংকল্প করেছিলেন, তাঁরা অনেকে বেশী বয়সে কেন বিয়ে করতে বাধ্য হন, অনেকে কেন বা নানাভাবে অত্যন্ত বিকৃত হয়ে ওঠেন। দু'য়েরই মূলে, মনে হয়, ঐ suppression-এর রাস্তা, শুষ্কতার সাধনা।

পরাশরের সঙ্গে ধীবর-কন্যার যে সম্পর্ক হল, তাতে পরাশরেরও এমন কিছু সর্বনাশ হয়ে গেল না, আর, সমাজের যে লাভ হল তার তুলনা কোথায়?

কিন্তু পরাশর মেয়েটিকে আপন কন্যার মতো বা বোনের মতোও তো দেখতে পারতেন! এর ভিতরও যদি খুঁজবার সুযোগ পাওয়া যেত, তাহলে হয়তো ধরা পড়ত ঐ নিজেকে চেপে চলবার ইতিহাস।

ভাবাবেগ বা সেন্টিমেন্টালিটির নিন্দা গায় একটু স্থূল প্রকৃতির লোকে—সন্তানোৎপাদন বা অর্থোপার্জন করেই যারা সংসারের কর্তব্য সমাধা করে। ভাবাবেগকে সংযত, সংহত করা মানে তাকে নিত্য পুষ্ট করা, ক্রমান্বয়ে প্রসারিত করা।

মানুষের কৃষ্টি এখানে বাল্মীকি-যুগ থেকে নিম্নতম স্তরে নামছে—হয়তো বিবর্তনের অমোঘ বিধানে। 'জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া' আর এক নবজীবন-নির্ঝরের প্রথম কুলু কুলু গান কিনা কে জানে? কবে কেমন ক'রে এ 'পাষাণ-কারা' ভাঙবে জানি না, তবে ভাঙবেই একদিন।

ইনসিনের বাগানে অনেক সকাল-সন্ধ্যায় একলাই বেড়াই, আর এই স্বপ্ন দেখি।

আর একটা জিনিসও বুঝলাম, জীবনের সব সাধনার মতোই স্নিগ্ধতার সাধনাও একটা জীবনব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন জিনিস। কোনো এক জায়গায় বা এক

বয়সে ওটাকে থেমে যেতে দেওয়া মানেই শুষ্কতার জন্তে জানালা খুলে দেওয়া, বিকৃতিকে ডেকে আনা।

বিবাহিত জীবনের জন্তেও একটা সাধনার প্রয়োজন আছে। অবিবাহিত জীবনের জন্তেও সেটা কোনো একটা বয়সের বা মুহূর্তের কল্পনা বা সংকল্প মাত্রই নয়। তার জন্তও নিরন্তর সাধনার প্রয়োজন আছে। সেটাও যোগের সাধনা, বিয়োগের নয়।

এই সাধনায় সুখ বা আনন্দ পাবার আশা-আকাঙ্ক্ষার স্থান নেই। সুখ চাওয়া ও পাওয়ার কোনো সঙ্গতি নেই। চাওয়া যত বাড়ে, পাওয়া তত কমে। সুখ বা আনন্দ দেবার চেষ্টা ক'রে আনন্দ পাওয়া এ সাধনার গোড়ার কথা।

অপর পক্ষে, জীবনের এই দিকে চাওয়াই পাওয়ার প্রাণ—তার অতিরিক্তও অনেকখানি।

সব সাধনাই উজানমুখী নৌকা, দাঁড় টানা বন্ধ হয়েছে তো পিছিয়ে চলল।

এই হিসাবে দেখলাম, শত আঘাত ব্যথা সত্ত্বেও বন্ধুত্বের দিক দিয়ে আমি ভাগ্যবান। সংসারে মা, ভাই, বোন—যত রকম সম্পর্কের আনন্দ পাওয়া যায়, বন্ধুর কাছ থেকেও তা পাওয়া অসম্ভব নয়। নববিবাহিত দম্পতির জীবনের আবেগ, চঞ্চলতা আর অধীরতা, নিজেকে নিঃশেষে মুছে ফেলার সুখ—কোনোটারই সেখানে অভাব না হতে পারে। রাজনৈতিক জীবনের প্রায় প্রথম দিক থেকেই—বিশেষতঃ দৌলৎপুরের জীবনে, পলাতক জীবনে—নিজেদের সংঘের ভিতরই যেন একটা পারিবারিক জীবন খুঁজে পেয়েছিলাম। তার সার্থকতায় আজ মনে একটা তৃপ্তি বয়ে নিয়ে এল।

কিছুদিন আগে কুন্তলকে আর চারুকে হারিয়েছি। জীবনকে ছেড়ে রেখে আসতে হল মান্দালেতে। ইনসিনের প্রথম নিঃসঙ্গ জীবনে রবীন্দ্রনাথের কথাটা মনে জাগত—"এখন থেকে জীবন আমার ডাঙার পথ বেয়ে।"

নিজেকে একান্তভাবে ছেড়ে দেবার, ডুবিয়ে দেবার কামনা বয়ে চলি। এবং কামনারও সার্থকতা, ক্রমবিস্তৃতির উন্মুখতা অন্তরের প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত যেন অকূল সমুদ্রের মতো উথলে ওঠে।

এই জোয়ারের জলে সাহিত্য কবিতা গান আমার পক্ষে যেন পূর্ণিমার চাঁদ।

ফ্রয়েড পড়বার সঙ্গে সঙ্গে পড়ি লথ্রপ স্টডার্ড, পুটনাম উইল, কাউন্ট গবিনো—পরবর্তী যুগে হিটলার যে নর্ডিক জাতির শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব নিয়ে এত কাণ্ড করল,

তার পরিচয় পাই। হরিদার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে এ নিয়েও আলোচনা চলে।

কিন্তু হরিদার বেড়ানো আর বেশীদিন চলল না। তাঁর রোগ ক্রমে বেড়ে উঠল। ওদিকে বাড়িতে তাঁর স্ত্রীও তখন অন্তিম শয্যায়। আই. বি-র কৃপায় কদাচিৎ কখনও এক-একখানা চিঠি পান: ধীরে ধীরে নিতে যাচ্ছেন। তিনি স্বামীকে একবার শেষ দেখা দেখবার জন্য দরখাস্ত দেন। জবাবের নকল হরিদার কাছে যায়: তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে।

হরিদার প্রশান্ত হাসিটি কিন্তু ম্লান হয় না। নিস্তব্ধ নিশীথে ধীর শান্ত গানের শব্দে ঘুম ভেঙে যায়—ব্যথার গভীরতা ভাষা পায় শুধু সেই গানের করুণ সুরে।

যুবক বাঙালী জেলার কাজী আবদার রহমানের কথা আগে বলেছি। ইনি মাঝে মাঝে আমার কিছু কাজ ক'রে দিতেন। জিতেনদা তখনও লোক পাঠিয়ে বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেননি। এমন সময় জিতেনদা একদিন আমায় একটি খবর পাঠালেন:

এম. এন. রায় ১৯২২ সালে বার্লিন থেকে যাঁকে প্রথম বাংলায় পাঠিয়ে তাঁর পুরানো দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করেন, ধরুন তার নাম রমণী। রমণী কলকাতায় এসে প্রথম ডঃ মেঘনাদ সাহার, পরে ডঃ টি. এন, রায়ের আশ্রয়ে থাকে। যাদুদা, অতুলদা প্রভৃতি যাঁরা তাকে জানতেন, তাঁরা তার সঙ্গে দেখা করেননি। সাতুদার (সাতকড়ি ব্যানার্জি) কথায় পরে আমি দেখা করি যাদুদার অনুমোদন নিয়ে। ভালো লাগেনি। লোকটি বম্বেতে ডাঙ্গে, যোগলেকর প্রভৃতির সঙ্গে এবং কলকাতায় মুজঃফর আহমেদ, কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে সেবারের মতো ফিরে যায়। এই উপলক্ষে এঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। রমণী ফিরে যাবার পর থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এম. এন. রায়ের কাগজ 'ভ্যানগার্ড', পরে 'অ্যাডভান্সগার্ড' এবং নানাবিধ পুস্তিকা আসতে থাকে। পরে রমণী আর একবার এসে ধরা পড়ে। ছাড়া পেয়ে বর্মায় গিয়ে জিতেনদের কাছে বোমা তৈরীতে নিজেকে বিশেষজ্ঞ বলে পরিচয় দিয়ে দল করতে শুরু করে। আমার কথা জিজ্ঞেস করায় আমার সহকর্মী বলে পরিচয় দেয়। জিতেন আমায় জিজ্ঞেস ক'রে পাঠান, আমি তাঁদের সাবধান ক'রে দিই। আরও খবর পেলাম, রমণী দৌলৎপুর 'সত্যাশ্রমে'র সঙ্গেও পরিচিত হয়েছে। আমি যখনকার কথা বলছি,

তখন আমার ধারণা ছিল, দৌলৎপুর সত্যাশ্রমে থাকতেন বরিশালের অনন্ত চক্রবর্তী। তাঁকে সাবধান করার জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠি। কারণ, এই রমণী-শ্রেণীর লোক দিয়ে বাংলার আই. বি তখন সর্বত্র জাল ফেলছে। এর ভিতর টুন্থু সেন ও মিহিরের কথা আগে বলেছি। রমণী তৃতীয় ব্যক্তি।

গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার সহকর্মী ডঃ পি. জে. মেটা তখন রেঙ্গুনে থাকতেন, আমি জানতাম। কাজী আবদার রহমানকে তাঁর কাছে চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে পরিচয় করাই এবং সমস্ত বৃত্তান্ত জানাই। আমি চিঠি লিখে দিলে তিনি পাঠিয়ে দেবেন বলেন। সে চিঠি তিনি তখন পাঠাবার সুযোগ করতে পারেন নি। পরে যখন মৌলানা শওকৎ আলি মান্দালেতে সুভাষ প্রভৃতি বন্ধুর সঙ্গে এবং ইনসিনে আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে যান, সে চিঠি তিনি তাঁকে দিয়ে দেন। মৌলানা সাহেব সেটা মাদ্রাজ থেকে ডাকে ছাড়বার ব্যবস্থা করেন। চিঠি ধরা পড়ে যায় এবং তার ফটো নিয়ে আবার জেল ও আই. বি কর্তৃপক্ষ আমায় জ্বালাতন শুরু করে। অনন্ত প্রভৃতির সঙ্গে রমণী ইতিমধ্যেই যোগাযোগ যা করবার ক'রে ফেলে। কিন্তু সূর্যবাবু পলাতক অবস্থায় চাটগাঁ থেকে আসাম হয়ে কলকাতায় এসে দলের ভার নেন। রমণী প্রভৃতির খেলা ফুরিয়ে যায়। অনন্ত ও অন্যান্য বন্ধুরা দক্ষিণেশ্বরের মামলায় ধরা পড়েন। সে-কাহিনী পরে আসবে।

ইতিমধ্যে একদিন রাত্রে রাউণ্ডে এসে কাজী আবদার রহমান আমার সঙ্গে গোপনে দেখা ক'রে বলেন, একখানা চিঠি পেয়েছি, চিঠিতে টাউঙ্গুর সীল, কি লেখা ঠিক বুঝলাম না। পড়ে মনে হল আপনার চিঠি।

চিঠি দেখে বুঝলাম সুভাষের। লিখেছেন, আগের বছর তাঁরা মান্দালেতে দুর্গা পূজা করেছেন। গবর্নমেণ্ট থেকে টাকা দিতে অস্বীকার করেছে। তাই তাঁরা হাঙ্গার স্ট্রাইক করছেন। আমরাও যেন করি।

কাজী আবদার রহমানের নাম ওঁরা পেয়েছেন ত্রৈলোক্যবাবুর কাছে। হরিদা ও জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করি। হাঙ্গার স্ট্রাইক আমরা করব সহানুভূতি জানাবার জন্য। কিন্তু খবর আমরা কি ক'রে পেলাম?

পরের দিন Forward-এ এবং তার পরদিন রেঙ্গুনের কাগজে খবর পেলাম, ওঁরা হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু করেছেন, আমরাও স্ট্রাইক ঘোষণা করলাম। হরিদা ও জ্যোতিষবাবুর স্বাস্থ্যের কথা আগেই বলেছি। তিনটে দিন কোনোমতে গেল চতুর্থ দিনে মেঃ ফিগুলে জ্যোতিষবাবুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ক'রে খাবার জন্যে ওঁকে

অনুরোধ করলেন। ভেবে দেখবার সময় দিয়ে বলে গেলেন, বিকেলে আবার আসবেন, খেতে রাজী না হলে নাকে নল চালিয়ে খাওয়াবেন।

জ্যোতিষবাবু আমায় বলেন, যে-দুধটা ওরা জোর ক'রে খাওয়াবে, তা-ই অমনি ঢক্ ঢক্ ক'রে খেয়ে নিই? আমি বলি, সে কি রকম ক'রে হবে? তিনটি মাত্র লোক আমরা এখানে হাঙ্গার স্ট্রাইক করছি, তার ভিতর একজন ছেড়ে দিলে যে মান্দালের ওঁদের পর্যন্ত দুর্বল ক'রে দেওয়া হবে—সরকার ধরে নেবে, সবাই ধীরে ধীরে ছেড়ে দেবে। এ হাঙ্গার স্ট্রাইক গবর্নমেণ্ট বেশী দিন চলতে দিতে পারে না, দু'একদিন একটু সয়ে থাকুন।

হরিদা ইজি-চেয়ারে বসে থাকেন, মাঝে মাঝে বারান্দায় পায়চারিও করেন। জ্যোতিষবাবুর শরীর-মন ক্রমেই অবসন্ন হয়ে আসছে। হরিদার সঙ্গে আলোচনা করি, এখন মানে মানে ছাড়তে পারলে বাঁচি। শুধু একটা অছিলা খুঁজছি। তা নইলে সহানুভূতির স্ট্রাইক, যাদের প্রতি সহানুভূতি, তাদের স্ট্রাইক ছেড়ে দেবার খবর না পাওয়া পযন্ত ছাড়া চলে না।

আমাদের হাঙ্গার স্ট্রাইকের খবরও কাগজে বেরিয়ে গেল। দিল্লীর অ্যাসেমব্লিতে খুব হৈ চৈ হল। শরৎ বোস মান্দালের হাঙ্গার স্ট্রাইক নিয়ে ওলট-পালট খুব করলেন।

লাল লাজপত রায় ও তুলসী গোঁসাইয়ের টেলিগ্রাম এল, গবর্নমেণ্ট টাকা দেবে, আপনারা খেতে শুরু করুন।

এই আমাদের সুবর্ণ সুযোগ। সাতদিনেই আমরা স্ট্রাইক শেষ করলাম। মান্দালেতে ওঁরা পূজার টাকা সম্পর্কে গবর্নমেন্টের অর্ডার এলে খেতে শুরু করলেন। ওঁরা আরম্ভও করেছিলেন আমাদের আগে। ওঁদের মোট পনেরো দিনের মতো না খেয়ে থাকতে হয়েছিল।

ধর্মকর্মের জন্য সরকারী খরচ বরাদ্দ হল জনপ্রতি বার্ষিক ত্রিশ টাকা।

এই হাঙ্গার স্ট্রাইকে হরিদার শরীর আর একটা চোট খেল। মনের কথা আর বলবার কি আছে? তবে হা-হুতাশ ক'রে নিজের অনুভূতিকে কখনও অপমান করতেন না। বন্ধুদের মধ্যে একটা শিক্ষিত মনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় ছিল সেদিন হরিদার ভিতর।

এইবারে ইনসিনের সরকারী বেসরকারী কয়েকজন পরিদর্শকের কথা বলে নিই। ওখানে ডেপুটি কমিশনার ছিল ভারতীয় সৈনিক বিভাগের কর্নেল ব্রাউন। নানা ছুতোনাতার ভিতর প্রধান বক্তব্য তো আমাদের ছিল ইনসিন

ছেড়ে মান্দালে যাওয়া। ও বলে, ও সব আমি লিখতে পারব না। আমি বলি, লিখতে পারবে না তো আস কেন? জ্যোতিষবাবুরও এখন মান্দালে ফিরে যাবার মত হয়েছে। ওঁর অসুখ শরীরের কথাও আমাদের মান্দালে যাবার দাবির একটা হেতু। একদিন তো ব্রাউন প্রকারান্তরে বলে বসল, জ্যোতিষবাবুর ওটা অসুস্থতার ভান। খুব একটা চেঁচামেচি হয়ে গেল, যতখানি পারি বকলুম। এরপর দু'এক মাস লক্ষ্য করেছি, ও আসে, আমাদের ইয়ার্ডে ঢোকে না, ফস্টারের বাখারির বেড়ার বাইরে কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে আমাদের দেখে চলে যায়। তারপর আর কখনও দেখিনি। অথচ কাঞ্চন বলে, ডেপুটি কমিশনারকে মাসে একবার আসতে হবেই।

বেসরকারী পরিদর্শক একজন ছিলেন পাঞ্জাবী ব্যারিস্টার মিঃ মহম্মদ অজাম। *Rangoon Daily News* বলে কাগজখানার ইনি স্বত্বাধিকারী। পরে ইনি রেঙুন কর্পোরেশনের মেয়রও হয়েছিলেন। বেশ ভদ্রলোক, কিন্তু মতামত উদ্ভট। এই সব পরিদর্শককে বলে কখনও কিছু বড় হতো না। আসতেন, গল্প করতেন, চলে যেতেন। এঁর একটা মতের এখানে উল্লেখ করব।

আমরা যখন বর্মার জেলে যাই, অনেক লোক তখন বর্মায় বেঁচে ছিল, যারা স্বাধীন বর্মায় জন্মেছিল, ইংরেজের হাতে দেশের স্বাধীনতা যেতে তারা দেখেছে। কাজেই, কি কয়েদী, কি কর্মচারী, কি বাইরের লোক এমন বর্মী আমরা কম দেখেছি যারা ইংরেজকে না প্রাণপণ ঘৃণা করত। কিন্তু মনের কথা মনে চেপে থাকত।

তেমনি দু'একজন ভারতীয়ের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে, যারা বলত, তারা যখন প্রথম বর্মায় যায়, তখন দেখেছে, ফায়ার (বুদ্ধের) দেশের কালাকে (বিদেশীকে) তারা কি শ্রদ্ধার চোখে দেখত! গ্রাম্য বর্মীরা কোনো ভারতীয়কে রাস্তায় দেখলে দূর থেকে শিকো (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম) করতে করতে অগ্রসর হতো। ভারতীয়রাই বলেছে, এই শ্রদ্ধা তারা হারিয়েছে নিজেদের দোষে। "ঞাপ্পিখানেওয়ালা কচড়া জাত" (মাছ পচিয়ে চাটনি জাতীয় একটা জিনিস বর্মীরা করে, তাকে বলে 'ঞাপ্পি', এটা প্রায় সবাই ভাতের সঙ্গে খায়।) তো বলবেই, তারপর ওদের স্ত্রী-স্বাধীনতার সুযোগ নেবার যে কাহিনী শরৎবাবু বলেছেন, সেটা বহু ক্ষেত্রে সত্য। সুযোগ-সুবিধা পেলে অপর জাতকে অবজ্ঞা দেখানো, হেলা তুচ্ছ করা যেন আমাদের রক্তমজ্জার ধর্ম। আমরা বর্মায় থাকতে লক্ষ্য করেছি, ওদের জাতীয়-জাগরণ আসছে এবং এই ব্যবহার ওদের মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়ে তুলছে।

মিঃ মহম্মদ অজাম অমন একটি শিক্ষিত লোক! তিনি একদিন কথায় কথায় বললেন, We came with the conquerors, we must have special rights in Burma.

আমি বললাম, দেখুন, একথা আপনাদের মুখে শোভা পায় না। জাতটা জেগে উঠছে, এর পর যদি এই মনোভাব নিয়ে চলেন, you will be kicked out of Burma.

কথাটা মিথ্যা হয়নি। তার আগেই এই মনোভাবের সুযোগ নিয়ে ইংরেজ বর্মাকে আলাদা ক'রে ফেলে। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ভিক্ষু উত্তম কিন্তু প্রাণপণ করেছিলেন ভারতকে ও বর্মাকে একই সংযুক্ত-রাষ্ট্রে রাখতে। সে-কাহিনী অন্যত্র বলব।

আর একজন আমাদের বে-সরকারী পরিদর্শক ছিলেন কবি নবীনচন্দ্রের পুত্র ব্যারিস্টার নির্মল সেন। অত্যন্ত সহৃদয় লোক। হরিদার তখন রোজ সন্ধ্যার পর এমন অবস্থা হতো যে কখন কি হয় ভেবে আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি। তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে এবং তাঁর স্ত্রীর কথা শুনে মিঃ সেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রেঙ্গুন সেক্রেটারিয়েটে ছুটোছুটি করতে লাগলেন যাতে হরিদাকে কলকাতার জেলে বদলী করাতে পারেন—হরিদারও চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে, স্ত্রীর সঙ্গেও যদি শেষকালে একবার দেখা হয়।

ঐ এক জবাবই বাংলার আই. বি-র কাছ থেকে বর্মা সরকার পাচ্ছে, হরিদার স্ত্রী ভাল আছেন, তাঁর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

ইতিমধ্যে একদিন সন্ধ্যার পর গফুর দু'তিনখানা *Forward* এনে দিল। তাড়াতাড়ি একটু দেখে নিচ্ছি, হঠাৎ চোখে পড়ে গেল, হরিদার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

তাড়াতাড়ি জ্যোতিষবাবুর কাছে ছুটে যাই, কি করব, মাস্টার মশাই? হরিদাকে বলব?

না, বলা হবে না। কি জানি, যদি হার্ট ফেল করে!

হরিদার কাছে কাছেই থাকি। দু'দিন বাদে মিঃ মহম্মদ অজাম এসেছেন। হরিদা আর আমি বসে গল্প করছি। মেজর ফিগুলে আর মিঃ রিচার্ডস্ এলেন, একখানা টেলিগ্রাম আর বর্মা গবর্নমেন্টের একখানা চিঠি হরিদার হাতে দিলেন। তখন আমি মিঃ অজামকে বিদায় করতে ব্যস্ত, আস্তে আস্তে হরিদার মাথাটা ইজি-চেয়ারের পাশে ঝুঁকে পড়ল, চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

দ্বিতীয়বার বেসিন

মান্দালের ভিড়ে গিয়ে জমে যাবার জন্য বর্মার জেল কর্তৃপক্ষকে এমনই উত্যক্ত ক'রে তুলেছিলাম যে মেঃ তারাপোর একদিন এসে বললেন, বাংলা গবর্নমেণ্ট আরও তিনজন রাজবন্দী বর্মায় পাঠাতে চায়, আমরা এইবারে তাদের বলেছি, এঁদের মান্দালেতে না পাঠিয়ে ইনসিনে পাঠাও।

সাদার্ল্যাণ্ড চলে গেছে, সিকলোনা বলে আর একজন ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসেছে, সাড়ে ছয় ফুট লম্বা চেহারা, মানুষটি ধুরন্ধর, কিন্তু ধরনটি মাই ডিয়ারী—বিশেষ ক'রে আমাদের কাছে। কারণ ফস্টারও সাদার্ল্যাণ্ডের অবস্থা জানে। তাছাড়া নিজে যেচে নেমন্তন্ন নিয়ে দন্তবিহীন মাড়ি দিয়েই প্লেট তিনেক মাংস আর সেই পরিমাণ পোলাও ও আনুষঙ্গিক মাসে দু'চারবার মেরে যায়।

একদিন এসে গোপন খবর জানাল, কাল আপনাদের দুই বন্ধু আসছেন। আমি বলি, দু'জন কেন? ও বলে, তা তো জানিনে। পকেট থেকে কাগজ বের ক'রে দেখায়, যে তিনজন আসছেন তাঁদের নাম—অরুণচন্দ্র গুহ, কালিপ্রসাদ ব্যানার্জি আর নরেন্দ্রমোহন সেন।

বাংলার জেলের খবর উড়ো উড়ো যা জানি, তা থেকে ধারণা হয়েছিল, অরুণদা আর কালিপ্রসাদ ছিলেন ঢাকা জেলে, আর নরেনবাবু ছিলেন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। পরে জানতে পারলাম, তিনজনেরই একসঙ্গে আসবার কথা ছিল, কিন্তু যেদিন রওনা হবার কথা, তার আগের দিন সন্ধ্যায় আলিপুর জেলে পুলিশের স্পেশাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভূপেন চ্যাটার্জির হত্যা হয়। অনুসন্ধান সাপেক্ষে নরেনবাবুকে আসতে দেওয়া হয়নি। অরুণদা আর কালিপ্রসাদ ইনসিন পৌঁছাবার কয়েকদিন পরেই অবশ্য নরেনবাবু আসেন।

অরুণদাকে আগে অরুণদা বলতাম না। কিছু বলবারই প্রয়োজন কম হতো—যদিও ওঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় ১৯১৬ সালে সায়েন্স কলেজে শৈলেন ঘোষের

আড্ডায়। শৈলেন ঘোষ তখনও আমেরিকা রওনা হননি, আর অরুণদা তখন পলাতক। তারপর থেকে আমরা সবাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর একে একে খালাস হয়ে এসেছি। ১৯২১ সাল থেকে '২৩ সাল পর্যন্ত অরুণদার সঙ্গে সরস্বতী লাইব্রেরীতে অথবা ডিক্সন লেনের এবং পরে বেনেটোলার ওঁদের মেসে মাঝে মাঝে দেখা হতো। কুন্তল আর জীবনকে দু'একবার আলোচনা করতে শুনেছি, একটা সত্যিকারের রাজনৈতিক বুদ্ধি এই লোকটির আছে—যা কাজে না লাগিয়ে এঁকে দিয়ে দোকানদারী করানো হচ্ছে!

সরস্বতী লাইব্রেরী তখন ঠিক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছিল না, ছিল কতকটা একটা রাজনৈতিক কেন্দ্র--বিশেষ ক'রে অসহযোগ সম্পর্কে বাংলা ইংরেজি বহু বই ওখান থেকে প্রকাশ করা হতো; বিভিন্ন জেলার আমাদের কর্মীরা ওখানে এসে মেলামেশার সুযোগ পেতেন; ১৯২৩ সালে 'সারথি' বলে কাগজখানাও ওখান থেকেই বের হয়। এগুলো সব দেখাশুনো করতেন অরুণদা।

বাইরের কর্মব্যস্ত রাজনৈতিক জীবনে খাঁটি-মেকী সব সময় ধরা পড়ে না—যেমন পড়ে জেলখানার প্রতিদিনকার ছোটখাটো কাজকর্ম কথাবার্তার ভিতর দিয়ে। অরুণদার সঙ্গে ইনসিনে পরিচয়ের পর থেকে আজ এই ২৫ বছর এক-সঙ্গেই আছি, একসঙ্গেই চলেছি। মতামতের পার্থক্যও তার ভিতর অনেকবার অনেক রকম হয়েছে। তাতে ক'রে রাজনীতিতে গোঁজামিল দেবার প্রয়োজন হয়নি, মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা বেড়েছে বই কমেনি।

অরুণদার সঙ্গে এক সুযোগ পেলাম পড়াশোনোর গণ্ডির বিস্তারের দিকে। সাধারণ ভাবে সাহিত্য, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি ছাড়া আমাদের পড়ার একটা বিশেষ দিক ছিল বিপ্লবের সমস্যাটা বুঝতে চেষ্টা করা। অরুণদার একটা ঝোঁক ছিল বিপ্লবোত্তর যুগের বা স্বাধীন ভারতের নানামুখী সমস্যা নিয়ে আলোচনার দিকে, এবং পড়ার আর একটা দিক ছিল প্রাচ্য সভ্যতা। এই সব নিয়ে দু'জনে পড়াশোনা করতাম। এর পরও বহু বৎসর একসঙ্গে জেলে কাটিয়েছি ও একসঙ্গেই পড়াশোনা করেছি।

কালিপ্রসাদের সঙ্গে আগেও মেদিনীপুর জেলে কয়েক মাস কাটিয়ে এসেছি। নরেনবাবুকে ১৯১৭ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে দেখেছি। তারও আগে ১৯১১-১২ সালে অনুশীলনের তৎকালীন নেতা মাখনলাল সেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এঁকে জানতাম। দলের ভিতর এঁর তখন প্রবল প্রতাপ। তারপর থেকে এখন এঁর ভিতর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গেরুয়া ধরেছেন, নাম নিয়েছেন ব্রহ্মচারী

রামকৃষ্ণ'। 'নরেনবাবু' কেউ বললে অত্যন্ত চটে যান, এবং সরকারী কাগজপত্রে এই নামের উল্লেখ দেখলে ছিঁড়ে ফেলেন। এই রকম অবস্থায় মাঝে মাঝে আমায় সামাল দিতে হয়। আরও দু'পাঁচটা এই ধরনের খেয়ালের জন্ত অনুশীলনের এঁর কোনো কোনো বন্ধু এঁকে পাগল বলে প্রচার করেন—যদিও এই বারে ধরা পড়ার কিছুদিন আগেই এই সব বন্ধুদের ভিতর প্রতুল গাঙ্গুলীকে নিজের সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে জীবনে বাঁচান।

নরেনবাবুকে পাগল ওঁরা যতই বলুন, রাজনৈতিক মতামতের আলোচনা দেখি, ওঁদের ভিতর একমাত্র ওঁর সঙ্গেই করা চলে—যদি উনি বিশ্বাস ক'রে আলোচনা করেন। রাজনৈতিক চিন্তার ওঁর একটা ধারা আছে, এবং সেটা বেশ স্পষ্ট। তাছাড়া এদিকের উদারবুদ্ধিও অনুশীলনের নেতৃবর্গের মধ্যে ওঁর ভিতরই যা দেখেছি। বৈপ্লবিক রাজনীতির চিন্তা করতেন, আর অন্ততঃ এই সময়ে দলকে তার তুলনায় ছোট ক'রে দেখতেন।

আমার কাছ থেকে জিতেন প্রভৃতি বাইরের কর্মীদের কথা শুনে উনি রেঙ্গুনে অনুশীলনের যে দু'একজন কর্মী ছিলেন, তাঁদের সাথে মিশিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। আগে বলেছি, ত্রৈলোক্যবাবু এ কাজে বাধা দেন। আর, নরেনবাবুর পাগল খ্যাতি তখন এমনই ছড়িয়ে পড়েছে যে এ-প্রচেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হন।

হরিদা তখন প্রায় উত্থান-শক্তিরহিত। কখনও কয়লার বিস্কুট খাওয়াচ্ছে, কখনও বা একটুকরো মুরগীর মাংস আর দু'টো বরবটি সেদ্ধ। হৃদ্‌রোগ প্রবল হয়ে উঠছে। ওঁর স্ত্রীর বেলাতেও তো অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত সরকার পক্ষ খবর দিয়েছে, আরাম হচ্ছেন! আমরা হরিদা সম্পর্কে বর্মা গবর্নমেন্টকে লিখলাম।

একদিন মেজর তারাপোর দেখতে এলেন। পরীক্ষা ক'রে মিঃ ফিগুলেকে জিজ্ঞেস করেন, ওঁকে এখানে রাখার দায়িত্ব তুমি নিচ্ছ কেন?

কি করব? আমি তো সঠিক কিছু পাচ্ছিনে।

কিন্তু ৫০ পাউণ্ডের মতো ওজন কমেছে, এই তো তোমার পক্ষে যথেষ্ট।

মেঃ ফিগুলে মুখ কাঁচুমাচু করতে লাগলেন।

এর কয়েকদিন পরে হরিদাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বদলী করল। সঙ্গে একজন ডাক্তার দিয়ে দিল।

আমরা পাঁচজন ইনসিনে রইলাম।

ইতিমধ্যে সরকারী দফতরে কার মস্তিষ্কে কোথায় বুদ্ধির ঢেউ খেলতে শুরু করল। খাওয়া-দাওয়ার জন্ত আমাদের দৈনিক ভাতা তখন তিন টাকা;

জামাকাপড়, বিছানা, তেল-সাবান প্রয়োজন মতো দেয়; বইয়ের জন্য মাঝে মাঝে কিছু টাকা দেয়—হঠাৎ সার্কুলার এল, বই কাগজ এবং তেল-সাবানের জন্য মাসিক পনেরো টাকা এবং কাপড়-বিছানার জন্য বাৎসরিক ২২৫ টাকা। বাংলায় শুনলাম এই সব নিয়ে আরও নানা-রকমের এক্সপেরিমেণ্ট চলেছে। মান্দালের বন্ধুদের মাথায়ও দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল। টাকা ফুরিয়ে গেলে কি সারা বছর ন্যাংটা ক'রে রাখবে? এই যুক্তির উপর একমাস যেতে না যেতে বর্মী-লুঙ্গি, এঞ্জি (কোট) ইত্যাদি কিনতে ২২৫৲ শেষ ক'রে ফেললেন। আমরা এখন মান্দালের খবর প্রায়ই পাই এবং মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। বছরে দু'বার তিনবার ক'রে ২২৫৲ টাকা খরচের অনুমোদন আসে। মারিয়ানো বলে একটি জেলার আমাদের চার্জে। সে বড় ভালো বাজার-সরকার, সৎ লোক।

ইনসিনের কথা আগে বলেছি, ওটা ছিল পুরানো কয়েদী রাখবার জেল। প্রথম প্রথম শুনতাম এবং দু'একদিন দেখেছি-ও, কয়েদীগুলোকে ধরে ধরে সিপাই জমাদার ও মেটপাহারাওয়ালা ঠ্যাঙাতো। আমরা তাই নিয়ে চেঁচামেচি করতাম। একবার হাঙ্গার স্ট্রাইকও করতে গিয়েছিলাম। সে ছিল সাদার্ল্যাণ্ড-ফস্টারের যুগ। যে কয়েদীকে মারতে দেখে আমরা নালিশ করেছিলাম, সেই কয়েদী নিজে এসে ডেপুটি কমিশনার কর্নেল ব্রাউনের কাছে সাক্ষী দিয়ে গেল, তাকে কেউ মারেনি।

এর পর অন্য রাস্তা ধরলাম' এই রকম মারপিটের খবর যখন যা পেতাম, *Rangoon Mail* কাগজে পাঠিয়ে দিতাম। নৃপেনবাবু তখন এ-কাগজ ছেড়ে চলে এসেছেন। এটা তখন সিলেটের সুরেশ ভট্টাচার্যের কাগজ। তিনি মাঝে মাঝে বা দিনের পর দিন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বের করেন—'Insein Jail Affairs'। আই. জি তাড়া লাগান, সিকলোনা অস্থির হয়ে ওঠে—এত কড়াকড়ি, তবু কি ক'রে এই সব আমরা পাঠাই!

একদিন সন্ধ্যাবেলা সিকলোনা বাসার বারান্দায় বসে আছে। গফুর তখন আফিসের সব কাজকর্ম সেরে আমাদের বিকেলের বাজার নিয়ে রেঙুন থেকে ফিরছে। গফুর ওদের খুব বিশ্বাসী লোক। তবু সেদিন ওকে ডেকে তন্ন তন্ন ক'রে তল্লাশী করেছে। ওর কাছে প্রায়ই আমাদের দু'খানা তিনখানা ক'রে *Forward*, জিতেন, নির্মল—ওদের সব চিঠিপত্র থাকে। ভাগ্যক্রমে সেদিন কিছুই ছিল না।

ও তবু বুদ্ধি ক'রে সেদিন আর ভিতরে আসেনি, আমাদের জিনিসপত্র

গেটের সিপাই-এর কাছে ফেলে রেখে চলে গেছে। প্রতি সন্ধ্যায় আমি ওর জন্তে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকি। সেদিন যখন ওর আসার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, আমি ইয়ার্ডের সিপাই-এর মারফত রাউণ্ডের জমাদারকে দিয়ে খবর নিয়ে জেনেছি, গফুর গেট থেকে চলে গেছে। বুঝলাম, কি হয়েছে। আর কাউকে কিছু বললাম না।

রাত ৯টায় মারিয়ানো এসেছে আমাদের বন্ধ করতে। আমি একেবারে ফেটে পড়লাম: 'এত রাত হয়ে গেছে, আমাদের বাজার আসেনি; দু'টি অসুস্থ বন্ধুকে প্রায় না খেয়ে থাকতে হল!'

নরেনবাবু প্রায়ই ফল খেয়ে থাকতেন, জ্যোতিষবাবুও অসুস্থ বলে রাত্রে ভাত না খেয়ে হালকা রকম কিছু খেতেন। তবে ঘরে এঁদের দুজনের মতো খাবার যথেষ্ট ছিল। তাতে কিছু যায় আসে না, মারিয়ানোকে সেল থেকে শুরু ক'রে শোবার দোতলা ঘর পর্যন্ত যেতে যেতে আগাগোড়া যা মুখে এল বকলাম। এত চিৎকার করেছি যে, অন্যদিনের মতো বেচারী সেদিন আর আমাদের সাথে সাথে দোতলা পর্যন্ত উঠে 'good-night'-ও করল না, গল্পও করল না—জমাদারকে পাঠিয়ে দিল ঘরে তালা দেবার জন্য, নিজে হতভম্ব হয়ে নীচে দাঁড়িয়ে রইল।

জমাদারও তালা বন্ধ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নামছে, আমিও হাসতে হাসতে খাটের উপর গড়িয়ে পড়লাম। অরুণদা আর কালিপ্রসাদ তো অবাক। প্রথমতঃ, মারিয়ানোকে যে আমি অমন ক'রে বকতে পারি, তা ওঁরা ভাবতে পারেননি। দ্বিতীয়তঃ, আমার এই হাসি দেখে অরুণদা বলেন, 'আগাগোড়া থিয়েটার করছিলে? আমি তো বলি, কী মেজাজই হারিয়েছ!'

আমি বলি, এই থিয়েটার যদি আজ না করতাম, কাল থেকে গফুরকে দিয়ে আর কোনো কাজ করানো অসম্ভব হতো, যখন-তখন ওর তল্লাশী নিত, ও ভয় খেয়ে যেত।

মারিয়ানো ততক্ষণে অফিসে গিয়ে রিপোর্ট লিখছে: মিঃ দত্ত আজ আমায় ভয়ানক অপমান করেছেন।

সিকলোনা কড়াকড়ির একটি ব্যবস্থা করেছিল—মারিয়ানোকে রোজ সকাল-সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে হতো।

পরদিন ভোরবেলায় মারিয়ানোর সঙ্গে পায়ে পড়ে আমি খানিকটা গল্প করলাম।

খানিক বেলায় মেঃ ফিগুলের এক চিঠি পেলাম : Dear Mr. Datta, মিঃ মারিয়ানো রিপোর্ট করেছেন, আপনি কাল তাঁকে বেজায় বকেছেন আর অপমান করেছেন। আপনার কি বলবার আছে ?

জবাবে লিখলাম, সময় মতো বন্ধুবান্ধবদের খাবার আসেনি, আমরা খেয়েছি, আর তাঁরা প্রায় অভুক্ত রয়ে গেছেন। এতে কার না মেজাজ খারাপ হয় ? মিঃ মারিয়ানোই তো চার্জে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো আবার আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে !

মেঃ ফিগুলে মারিয়ানোকে জিজ্ঞেস করেছেন, তুমি খুশি তো ?

মারিয়ানো জবাব দিয়েছে, আমার আর রাগ নেই।

সকল নাটের গুরু সিকলোনা খানিক বাদে বাঁধানো দাঁত বের করতে করতে এসে বলে, মিঃ দত্ত, আমিই কাল গফুরকে আটকেছিলাম। আমি জানি, ও খুব বিশ্বাসী, এসব করবে না। কিন্তু কি ক'রে কাগজে এসব বের হয় ? তাই কাল ওকে পেয়ে একবার তল্লাশী ক'রে দেখলাম।

আমি জিজ্ঞেস করি, একথাই বা ভাব কেন যে ওসব আমরা বের করি ?

সিকলোনা হাসে আর বলে, সে আর বলে কাজ নেই।

বুঝলাম, ভবিষ্যতের জন্য গফুর বিপন্মুক্ত।

পূজা আসছে। আগের বারের মান্দালের পূজার জন্য আমরা হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছি। এবারে আমরা নোটিশ দিলাম, আমরাও ইনসিনে পূজা করব।

ধর্মকর্মের জন্য গবর্নমেণ্টের বাৎসরিক মঞ্জুরী আমাদের পাঁচজনের দেড়শ'র মতো ছিল। আমার কিছু টাকা হরিদার স্ত্রীর শ্রাদ্ধে ব্যয় হয়েছে। আর শ'দেড়েকের মতো খাওয়ার খরচ থেকে বাঁচিয়েছি। বলে দিলাম, বাকীটাও ঐভাবে বাঁচিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের মনের কথা, সবটাই গবর্নমেণ্টের কাছ থেকে আদায় করব।

জেলের ভিতর মণ্ডপ তৈরী হল। ত্রিপুরা জেলার এক কুমোর সেখানে প্রতিমা গড়তে শুরু করলেন, নেবেন ৮০৲ টাকা। মাদ্রাজী ব্যাণ্ড পার্টি আর ৮০৲ টাকা। চট্টগ্রামের পুরোহিত ১০০৲ টাকা। যোগেন ভট্টাচার্য পুলিশ দিয়ে টাউঞ্জির দিক থেকে এত পদ্মফুল আনিয়ে দিল যে ভাঁড়ার ঘর যেটা ঠিক হয়েছিল, তার প্রায় অর্ধেকটা ভরে গেল।

এদিকে ঠিক হল, ইনসিনের ৩৩০০ কয়েদী, শ'দুই সিপাই জমাদার, ইনসিন ও রেঙ্গুনের দুই বিশাল জেলের এবং আই. জি-র আফিসের সব কর্মচারী,

বেসরকারী পরিদর্শক—যাকে যেমন পারি খাওয়াব। কয়েদীদের অবশ্য সবটা খাওয়া দিতে পারব না—জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে যে চাল, ডাল, তরকারি ওরা জেল থেকে দেয়, তা-ই সেদিন একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়ে নেব, তার উপর আমরা দেব শুঁটকি মাছ, আলু, ঘি ও মিষ্টি। এসবেও খরচ কম নয়।

আগে কিছু বলিনি। ষষ্ঠীর দিনে সকাল বেলায় যখন আমাদের রোজ বাজারের ফর্দ যায়, তখন পুজোর জিনিসপত্র সহ যে জিনিসের ফর্দ পাঠিয়ে দিলাম, তার মোট দাম ৯০০৲ টাকার উপর। সিকলোনা গফুরকে দিয়ে বলে পাঠাল, এত টাকা জমেনি, এ জিনিস আনতে দেওয়া হবে না। আমি গফুরকে দিয়ে ভাঁড়ার ঘরের চাবি ফেরত পাঠিয়ে দিলাম।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এলেন।

'আপনাদের তো শ'তিনেকের উপর টাকা নেই। প্রতিমা, বাস্ত ইত্যাদিতে টাকা যাবে। তার উপর এই ৯০০৲ টাকার ফর্দ! এ আমি দিতে পারব না।'

আবার সেই ঠ্যাটামির আশ্রয়। 'না দিতে পারার মানে কি-জানেন? পুজোর মণ্ডপ হয়েছে, প্রতিমা হয়েছে, এখন পুজো না হলে প্রায়শ্চিত্ত—ঐ মণ্ডপ আর প্রতিমা সহ গৃহকর্তা বা পুজোর উদ্যোক্তাদের একজনকে আগুনে পুড়ে মরতে হবে।'

মেঃ ফিগুলে গম্ভীর মুখে কিছু সময় ভাবলেন, তারপর বললেন, 'তা হলে আমি যা করতে পারি, সে হচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে ম্যাচ্‌বাক্সগুলো নিয়ে নেওয়া।'

আফিসে গিয়ে আই. জি-র সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা। তারপর গফুর এসে চাবি দিয়ে গেল। পূজা সাড়ম্বরে এবং according to plan হয়ে গেল। খরচ ১৮০০৲ টাকার মতো।

সপ্তমী পূজার দিন সকাল বেলা জিতেন ওঁরা ফুল দেওয়া উপলক্ষ ক'রে চার-পাঁচজন জেলের ভিতর ঢুকে পড়লেন। রোখে কে? সামান্য কথাবার্তার পর সিপাই জমাদাররা কাকুতি-মিনতি শুরু করল, ওঁরা চলে গেলেন। সিকলোনা সিপাইদের সঙ্গে হৈ চৈ করল। যোগেন ভট্টাচার্য স্বয়ং খবরদারীর চার্জে। তার সেই ভাগনেটা যে পাচক সেজে আমাদের সঙ্গে বেসিন গিয়েছিল, সে হাফ প্যান্ট প'রে এসে মাঝে মাঝে বসে থাকে।

আমি করি কোপরদালালী অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ধমক-ধামার কাজ;

কালিপ্রসাদ বামুন মানুষ—পূজার মণ্ডপে থাকেন; ভারি কাজ ভাঁড়ার এবং লোকজন খাওয়ানো—অরুণদার। ওঁর তখন নখের পাশে, চোখের রোঁয়ার ভেতর, হাতে-পায়ে অজস্র ফোড়া বের হচ্ছে, পায়ের একটা ফোড়ায় পা ফুলে রয়েছে, অসহ্য ব্যথা, তবু হাসিমুখে সারাদিন খাটছেন। নিজেকে spare করব না—মন্ত্রটি যেন জীবন ভরে আপন মনে জপ ক'রে চলেছেন।

বিজয়ার দিন জিতেনদের আয়োজনে জেলের গেটে সে কি লোকের ভিড়! গেট থেকে বিদায়ের আগে ওঁদের সঙ্গে আমাদেরও এক এক নজর দেখা হল।

বৃষ্টি নেমে পড়ল। জেলের গুদাম থেকে ওয়াটারপ্রুফের থান বের ক'রে তাই দিয়ে লরীর উপর আর এক মণ্ডপ তৈরী হল। আগে থেকেই রেঙ্গুনে খবর রটে গিয়েছিল, ইনসিন জেলের রাজবন্দীদের প্রতিমা বিসর্জনের জন্য আসবে। যোগেন ভট্টাচার্য আপত্তি তুলেছিল, প্রতিমা জেলেরই একটা ডোবাতে বিসর্জন দিতে বলেছিল। আমাদের ধমকের সামনে সে আপত্তি টেকেনি। সর্ব জাতীয় এত লোকের মিছিল হয়েছিল যে, শুনলাম, রেঙ্গুনে অত বড় মিছিল খুব বেশী হয়নি।

আবার পড়াশোনায় দিন কাটছে। ফরাসী ভাষার চর্চা আবার নতুন ক'রে শুরু হল অরুণদার সঙ্গে।

পূজার অনেক দিন আগে মেঃ তারাপোর একদিন এসে আমাদের মনে এক আশা জাগান: মান্দালে জেলটা মান্দালে দুর্গের ভিতর। ঐ জেলে যেতে-আসতে দেখেছি, জেল এবং আগে যে-বাড়িতে লালা লাজপত রায় ও সর্দার অজিত সিং আটক ছিলেন, এই দু'টোর মাঝখানে একটা স্কুলের বাড়ি ছিল। বর্মা গবর্নমেণ্ট প্রস্তাব করেছে, বর্মায় সব বাঙালী স্টেট প্রিজনারদের জেলে না রেখে এই বাড়িতে রাখা হোক। তাতে স্টেট প্রিজনাররাও ভালো থাকবেন, জেলের সাধারণ ডিসিপ্লিনের দিক থেকেও সেটা অনেক ভালো হবে। এই প্রস্তাব নিয়ে বর্মা, বাংলা ও ভারত গবর্নমেণ্টের ভিতর লেখালেখি চলছে। ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেলেই আমাদের ওখানে নিয়ে যাওয়া হবে।

মাসের পর মাস চলে যায়, আমরা আশায় আশায় থাকি—ওদিকে hope deferred maketh the heart sick. মেঃ তারাপোর প্রায়ই আসেন, আমরাও প্রতিবারেই তাগিদ দিই। অবশেষে একদিন এসে বললেন, বাংলা থেকে আই. বি-র ডি. আই. জি লোম্যান গিয়েছিল ঐ বাড়ি দেখতে। বলেছে, ঐ বাড়ির চারিদিকে দেয়াল তুলতে হবে। দুর্গের মধ্যে আবার এই ছোট্ট একটু-

খানি জেল তৈরী করতে বর্মা সরকার রাজী হয়নি, অতএব ও-প্রস্তাব ফেঁসে গেল।

আমরা দরাদরি করি, তা হলে অন্তত আমাদের মান্দালে জেলে পাঠিয়ে দিন।

সে হবে না, বাংলা গবর্নমেন্ট রাজী নয়। আমাদের সন্দেহ জাগে, ও-বাড়িতে হলে সবাইকে একত্র রাখতে রাজী, আর, মান্দালে জেলে হলে কেন রাজী হবে না? এর ভিতর বর্মা গবর্নমেন্টের, হয়তো বা আই. জি-রই, কারসাজি আছে। একদিন মেঃ তারাপোরের সঙ্গেই ঝগড়া ক'রে ফেলি এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানাবিধ নালিশ তুলে ভারত গবর্নমেণ্টের কাছে লেখালিখি শুরু করি।

এসব ঘটে গেছে পূজার আগে। পূজার সময় অফিসারদের নেমন্তন্ন করেছিলাম। তার ভিতর এল. আই. জি-র অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কেনি। খাওয়ার টেবিলে বসে নানারকম কথাবার্তার ভিতর বলে, আপনার সব চিঠিপত্র আমি পড়েছি। Long after you have left the shores of Burma, you will be remembered in Burma. ভাবি, এ আমড়াগাছি কেন! খানিক বাদে বেরাল বেরিয়ে পড়ল। বলে, মিঃ কলিসের (বর্মা সরকারের চীফ সেক্রেটারী) সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি বলেন, আপনারা এইরকম চিঠিপত্র চালিয়ে যান। আপনারাই জিতবেন।

কিছুদিন আগেই কানাঘুষো শুনেছিলাম, কর্নেল ক্যামেরন, কর্নেল সিমসন প্রভৃতি ইউরোপিয়ান আই. জি-র দল Inspectors-General of Prisons' Conference-এ মেঃ তারাপোরকে অপদস্থ করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করছে; তিনি কারা-সংস্কারের যে সব প্রস্তাব ক'রছিলেন, সেগুলো যাতে বানচাল হয়, তার জন্য যথাসাধ্য করছে। এখন কলিসের খবর শুনে বুঝলাম, এ হচ্ছে উচ্চপদস্থ দেশী কর্মচারীর বিরুদ্ধে ইউরোপীয় কর্মচারীদের ষড়যন্ত্র।

সেই থেকে মেঃ তারাপোরের নামে ব্যক্তিগতভাবে লেখা বন্ধ ক'রে দিলাম। তবু জেলখানায় কোনো-কিছু নিয়ে ঝগড়া একবার শুরু করলে চরমে যেতেই হয়, অথবা আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে হয়। অনেক স্তরের ঝগড়ার পর শেষ পর্যন্ত নোটিশ দিলাম, রাত্রে ঘরে বন্ধ হব না। হাঙ্গার স্ট্রাইক করতে হলে, স্থির করলাম, করব এর পরের স্তরে।

জেলখানায় রাত্রে ঘরে বন্ধ হতে না চাইলেই ধস্তাধস্তি। গেরুয়াধারী নরেনবাবু বললেন, আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি, তবে আমি ঠিক ধস্তাধস্তি পর্যন্ত যাব না, under protest বন্ধ হব।

আমরা বলি, তথাস্তু।

জ্যোতিষবাবুর গোড়াতে উৎসাহ খুব। কিন্তু সন্ধ্যার আগে মেঃ ফিগুলে এলেন রিচার্ডসের সঙ্গে। রিচার্ডস তখন ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে কি কথা হল জানিনে। উনি দেখি, মেঃ ফিগুলের সঙ্গে হাসপাতালে চলে গেলেন। সেখানে ওঁকে আলাদা থাকবার ঘর, রান্নাঘর ও পাচক দেওয়া হল। প্রশ্ন ক'রে ওঁকে সংকুচিত ক'রে তুলতে চাইনে—আমরা তিনজন মাঝে মাঝে হাসপাতালে গিয়ে ওঁর কুশলবার্তা জেনে আসি। বলেন, বেশ আছেন।

ধস্তাধস্তির জন্য তৈরী আমরা তিনজন: অরুণদা, কালিপ্রসাদ ও আমি। রাত্রে পিংপং খেলার টেবিল বের ক'রে শুয়ে পড়ি। ৯টায় সিপাইরা চ্যাংদোলা ক'রে কেমন নিয়ে সেলে বন্ধ করবে, তার জল্পনা-কল্পনা করি।

মেঃ তারাপোরের পরামর্শে সেসব কিছুই করল না। যেমন শুয়ে ছিলাম, তেমনি রাত ভোর ক'রে দিলাম। অমন লড়াইটা মাঠে মারা গেল।

দুর্ভাগ্যের অন্ত সেখানেই নয়। পাঁচদিনের দিন দুপুরে জমাদার মেঃ ফিগুলের একখানি চিঠি দিয়ে গেল: মিঃ দত্ত এবং ব্যানার্জিকে আজ রাত ৯টায় এ-জেল ছেড়ে যেতে হবে। বিকেল ৫টার ভিতর তাঁদের জিনিসপত্র অফিসের লোক গেলে তার কাছে দিয়ে দেবেন।

একবার মনে উঠল, বাধা দিই, জোর ক'রে নিয়ে যাক। আলোচনায় ঠিক হল, লাভ নেই কিছু। মনের দিক দিয়ে সবারই যা অবস্থা, তা জেলে যাঁরা এ অবস্থায় না পড়েছেন, তাঁদের কল্পনায় আসবে না।

পরদিন সন্ধ্যার আগে গিয়ে পৌছাই বেসিন জেলে। নুর মহম্মদ জেলার আর পূর্ণ বড়ুয়া ডেপুটি জেলার নিয়ে চললেন জেলের ভিতর। জিজ্ঞেস করি, কোথায় নিয়ে চলেছেন?

নুর মহম্মদ বলে, আছে, ওদিকে ভালো জায়গা আছে।

আমি বলি, বেসিন জেল আমার অচেনা জায়গা নয়। ঐ কোণে ঐ দশটা সেলে তো?

হাঁ।

ওখানে আমরা থাকব না।

তাহলে তো সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে ডাকতে হয়

ডাকুন।

ইয়ার্ডের ভিতর গিয়ে জিনিসপত্রের সামনে ডেক-চেয়ার বিছিয়ে বসলাম।

পূর্ণবাবু আমাদের সেই পুরানো রান্নাঘরে ঢুকে ইরানী পাচকের হাত থেকে খুন্তি নিয়ে মাছ সাঁতলাতে লাগলেন।

কর্নেল স্টুয়ার্ট বুড়ো মানুষ। বাটনহোলে গোলাপ ফুল গুঁজে এসে বলেন, না, না, আমি এখন কোথায় রাখব ?

আমি বলি, ঐ হাসপাতালের পাশে বি ক্লাস আণ্ডারট্রায়ালদের যে ছোট্ট ইয়ার্ডটা আছে, সেটা বেশ জায়গা, আমাদের দু'জনের খুব চলে যাবে।

তারপর ? বি ক্লাস আণ্ডারট্রায়ালরা কোথায় যাবে ?

আমি জবাব দিই, প্রায় কোনো জেলেই এ আর বি ক্লাসের আণ্ডারট্রায়ালের আলাদা ওআর্ড নেই, ওরা একসঙ্গেই থাকে।

এখন আমার কয়েদী বন্ধ হয়ে গেছে। আজ রাতের মতো এ সেলেই থাকুন, কাল যা হয় দেখা যাবে।

রাত্রে থাকা দূরের কথা, ও-সেলে ঢুকবও না। জেলের মাঝখানে আপনাদের একটা আফিস ঘর আছে, সেটা রাত্রে বন্ধ থাকে, সেখানে আজ রাত কাটাবার ব্যবস্থা করুন।

কর্নেল স্টুয়ার্ট মেট দিয়ে ঘর পরিষ্কার করাবার অর্ডার দিয়ে চলে গেলেন।

পূর্ণবাবু মাছ ভাজা হাতে বেরিয়ে বলেন, শাবাশ !

বললাম, চা করুন, তার সঙ্গে ওটা খান।

পরদিন সেই আণ্ডারট্রায়াল ওআর্ডেই স্থান হল।

কালিপ্রসাদ ছাব্বিশ দিন বাদে বাইরে ইণ্টার্নমেণ্টের অর্ডার পেয়ে বাংলায় চলে এলেন। আমি একাই রইলাম।

না, ঠিক একা নয়। পূর্ণবাবু জেলের ভিতরের আফিস ঘরে বসেন। আর সেখানে কোনো বেলায় ডেকে দেন স নে ভুনকে, কোনো বেলায় হরিনারায়ণ চন্দকে।

স নে ভুনের কথা আগে বলেছি। হরিনারায়ণ ১৯২৫ সালে দক্ষিণেশ্বরে যে বোমা ধরা পড়ে, সেই বোমার এক্সপার্ট। তাঁর কাছ থেকে এই নতুন ধরনের বোমার ফরমুলা ও serrated খোলসের খবর নিই। ফরমুলা আমাদের কাজে লাগেনি, কারণ ১৯২৯ সালে আমাদের পুরানো বন্ধু, বগুড়ার যোগেন দে সরকার টি. এন. টি বোমার ফরমুলা দেন। কিন্তু হরিনারায়ণের কাছ থেকে খোলসের দরুন যেসব ঠিকানা পাই, তারই সূত্র ধরে ১৯২৯ সালে হুগলীর হামিদের কাছে একটা নমুনা খুঁজে পাই। Serrated হওয়ার দরুন এই খোলসের এক-একটা

টুকরো এক-একটা বুলেটের কাজ করে। এই নমুনাই ১৯৩০ সালের ডালহৌসি স্কোয়ারের ও অন্যত্রের বোমার মডেল। তবে যোগেনবাবুর পরামর্শে দক্ষিণেশ্বরের মতো ওগুলোকে লোহার না ক'রে অ্যালুমিনিয়ামের করা হয়।

আমি বেসিনে আছি বলে হঠাৎ একদিন হরিনারায়ণকে মৌলমিনে বদলী ক'রে দিল। ভূপেন চ্যাটার্জির হত্যার অপরাধে অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরীর ফাঁসি হয় এবং হরিনারায়ণ, অনন্ত চক্রবর্তী ও ধ্রুবেশ চ্যাটার্জিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা দিয়ে বর্মায় পাঠায়। অনন্ত ও ধ্রুবেশ ছিলেন মিয়াংমিয়া ও মিনজান জেলে। এই অপূর্ব চরিত্র কর্মীদের কাহিনী পরের অধ্যায়ে বলব।

ইতিমধ্যে দেশী ও ইংরেজ কর্মচারীদের পার্থক্যের একটু কাহিনী বলি। দেশী কর্মচারীদের ভিতর খুবই ভালো ও শিক্ষিত যারা, তারাও যেন শাসনের কাজে ব্যক্তিকে বা নিজেকে বাদ দিয়ে কোনো কিছু দেখতে পারে না—যা ইংরেজ কর্মচারীরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারত।

স্টেট প্রিজনার কোনো জেলে কেউ এলে তাকে কোথায় রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আই. জি-কে রিপোর্ট দিতে হয়। আমাদের বি ক্লাস আণ্ডারট্রায়াল ওআর্ডে রাখা হয়েছে—এই রিপোর্ট পেয়ে কর্নেল তারাপোর বেসিনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে লেখেন, আমি যেখানে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলাম, সেখানে এদের কেন রাখা হয়নি।

শুধু আমি নই, কর্নেল স্টুয়ার্টও কর্নেল তারাপোরের এই ব্যক্তিগত আক্রোশের পরিচয় পেয়ে একটু মুচকি হেসেছিলেন। কর্নেল তারাপোর জানতেন, বেসিনের ঐ সেলে থাকতে আমার আপত্তি ছিল বলেই ১৯২৪ সালে লেখালিখি ক'রে জীবন আর আমি মান্দালেতে বদলী হয়েছিলাম।

কিন্তু কর্নেল স্টুয়ার্ট ঝুনো কর্নেল, আর মেজর তারাপোর সবে লেফটেনাণ্ট কর্নেল হয়েছেন। তাছাড়া ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনের ৬নং ধারায় ছিল, স্টেট প্রিজনারের স্বাস্থ্য এবং সুখ-সুবিধার পক্ষে তার বাসস্থান উপযোগী কিনা তা দেখবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

কর্নেল স্টুয়ার্ট লিখলেন, I am perfectly satisfied with their present accommodation. কর্নেল তারাপোর বিদ্বেষের বশে এইভাবে যেচে অপমানিত হলেন দেখে একটু দুঃখই হল।

বেসিনের ছোটখাটো সুযোগের ভিতর জিতেনদের সঙ্গে সামান্য যোগাযোগ।

ইনসিনে অরুণদা সবই জেনে নিয়েছিলেন। তিনিই সব চালান, আমার চেয়ে ভালোভাবেই চালান। জেল থেকে পয়সাকড়ি বাঁচিয়ে ওঁদের পাঠান, প্রয়োজন মতো অন্য জিনিসপত্রও। জিতেনরা তবু বেসিনে আমার খবর নেন, ওখানেও তাঁদের দলের লোক ছিল। অরুণদার চিঠিপত্রও পৌঁছে দেন। অন্যভাবেও চিঠিপত্র চলে। আগ্রহ তীব্র, পথের অভাব হয় না। সুভাষ ইতিমধ্যে অসুস্থ হয়ে মান্দালে থেকে চিকিৎসার জন্য রেঙ্গুনে এসেছিলেন—সেখানে উদ্ধত, অভদ্র সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মেজর ফ্লাওয়ারডিউয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ইনসিনে আসেন। তাঁরও চিঠিপত্র পাই।

আর একটি ঘটনা একটু বিস্ময়কর। প্রথমবার যখন জীবন ও আমি বেসিন আসি, তখন রেঙ্গুন ঘাটে যোগেন ভট্টাচার্য আমাদের বলেছিল, বেসিনে আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না। সেখানে দত্ত নামে একটি বাঙালী কয়েদী আছে, সে-ই এ-জেলের রাজা। আমাদেরই অবিশ্যি ওকে সাজা দেওয়াতে হয়েছিল, তবে তার কাছে আপনারা যা সাহায্য চান পাবেন।

যোগেন ভট্টাচার্যের মুখে এই সার্টিফিকেটের পর আমরা আর ভরসা ক'রে ওর কাছে কোনো সাহায্য চাইনি। এবারে বেসিনে এসে দেখলাম, সেই দত্ত খালাস হয়ে জেলের ছোটখাটো কন্ট্রাক্টরির কাজ করে। পূর্ণবাবু আমাদের সাথে দেখা করিয়ে দিলেন।

কিছুদিন বাদে বর্মা গবর্নমেণ্টের এক চিঠি এল; লিখেছে: 'রেঙ্গুন মেল' কাগজের মিঃ এস. সি. ভট্টাচার্য বেসিন যাচ্ছেন—প্রকাশ্যতঃ তাঁর কাগজের জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করতে, কিন্তু আসলে স্টেট প্রিজনারটির খবরাখবর করতে। স্টেট প্রিজনার যেন কোনো প্রকারে এঁর সংস্পর্শে না আসতে পারেন। দত্ত বলে জেলের যে কন্ট্রাক্টর আছে, সে বাঙালী, তার মারফত যোগাযোগ হতে পারে। সম্ভব হলে এর সব কন্ট্রাক্ট যেন বাতিল ক'রে দেওয়া হয়।

ধরে আনতে বললে যারা বেঁধে আনে নুর মহম্মদ ছিল সেই ধরনের জেলার। দত্ত বেচারীর সব কন্ট্রাক্ট বাতিল হয়ে গেল।

বর্মায় থাকতে বর্মার রাজনৈতিক জীবনের যে সামান্য পরিচয় পেয়েছিলাম, তার একটু আভাস না দিলে আমার পক্ষে অন্যায় হবে। আমি বিশেষ ক'রে তখনকার রাজনীতিতে ওখানকার ধর্মযাজকদের (ফুঙি) যে-প্রভাব ও দানের পরিচয় পেয়েছিলাম, তারই সামান্য উল্লেখ করব।

রাজদ্রোহের অপরাধে ভিক্ষু উত্তমার মোবিনে সাজা হয়। সাজার পর যখন

তাঁকে কোর্ট থেকে জেলে নিয়ে যায়, তখন চৌদ্দশ' বর্মী নারী রাস্তার দু'পাশে শুয়ে পড়ে তাঁদের চুল বিছিয়ে দিয়েছিলেন রাস্তায়, ভিক্ষু তারই উপর পা ফেলে জেলে পৌঁছান।

আর যাঁর কথা বলব, তাঁর নাম ভিক্ষু নাগিন্দা। বাংলা দেশে স্বদেশী যুগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় একভাবে ও ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আর একভাবে ইংরেজের বিচারালয় সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব জ্ঞাপন করেন। আর উ নাগিন্দা করেছিলেন বর্মায় সম্পূর্ণ অন্যভাবে। তিনি বলেন, বিদেশীর বিচারালয়ের কোনো অধিকার নেই তাঁর বিচার করবার। তিনি স্বেচ্ছায় বিচারালয়ে যেতে অস্বীকার করেন। সরকার থেকে কোনো যানবাহনের ব্যবস্থা করেনি। মান্দালে জেল থেকে কোর্ট বেশ দূরে। ভিক্ষু নাগিন্দাকে বিচারের প্রত্যেক দিন দুই পা ধরে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো। এইভাবে যেতে যেতে তাঁর শরীর-মাথা সব ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত। তবু অন্য কোনো পন্থার কথা কেউ চিন্তাও করেনি। শাস্তি হয়ে যাবার পর এঁকে মেদিনীপুর জেলে পাঠিয়ে দেয়।

একা একা দিন কাটাই। পড়াশোনায় বেশী মন বসে না। বইপত্র পাওয়ার সুযোগ কম। কর্নেল স্টুয়ার্টকে বলে সরঞ্জাম ও লোক নিয়ে ছোট্ট ইয়ার্ডটা ফুলের বাগানে সাজাই। অতীত জীবনের স্বপ্নের মতো এক ঝাঁক ক'রে ফুল শুকায়, আবার ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনা নিয়ে আর এক ঝাঁক প্রতি প্রভাতে ফুটে ওঠে।

ইয়ার্ডে আমার বানরটা ছিল একা। বেড়াতে যখন বের হতাম অফিসের উপরের ঘরের জানালা থেকে 'কাকু' বলে ডাকত পূর্ণবাবুর প্রতীক্ষমাণ আট বছরের ছেলে—যেন 'ডাকঘরে'র অমল। আর বাগানে বিশাল এক খাঁচার সামনে করুণ চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকত একলা একটি হরিণ। এদের প্রতি আমার তখনকার সহানুভূতির যে গভীরতা, আমার নিজের মনেও তার তুলনা কম। অন্তর তবু ভরপুর।

প্রায় ছয় মাস কেটেছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন বাংলায় বদলীর অর্ডার আসে। তাড়াতাড়ি কর্নেল স্টুয়ার্টকে দিয়ে ইনসিনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে খবর পাঠাই, আমার সঙ্গে যে বানরটা আছে, সেটা ইনসিনের স্টেট-প্রিজনারদের জন্য নামিয়ে দিয়ে যাব, একজন লোক যেন ইনসিন স্টেশনে আসে।

আমি ইনসিনে থাকতেই গফুর ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিল। তার জায়গায়

কাজ করত মহম্মদ আমিন। সে-ও আমাদের সামনেই বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। তাকে বানর নিতে স্টেশনে আসতে হবে শুনে অরুণদা সবই বুঝলেন। মহম্মদ আমিনের মারফত বানরও গেল, চিঠি বিনিময়ও হল—পুলিশ এবং আই. বি থাকা সত্ত্বেও।

পরদিন জাহাজে যে বাঙালী আই. বি অফিসারটিকে সঙ্গী পেলাম, সে ছেলেমানুষ। বললাম, এমন ভদ্রলোকের মতো চেহারা, আর এই চাকরি করছেন! বেচারী কেঁদে ফেলল—বলে, আমার মাকে নিয়ে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারি, এমন একটি কাজ জুটিয়ে দিন, এ চাকরি ছেড়ে দেব।

বেচারী দু'দিনই কেঁদেছিল, কিন্তু আমি জানি, ও-চাকরি সে ছাড়েনি, অন্য চাকরির চেষ্টাও করেনি।

একটি যুগাদর্শের তিরোধান

খালাস অথবা খালাসের সূচনায় বাইরে অন্তরীণ হবার তখন ধুম লেগে গেছে। আমি যে ষ্টিমারে বর্মা থেকে এলাম, তার ঠিক আগের ষ্টিমারে সত্যেনদা (মিত্র) কলকাতায় পৌঁছে খালাস হলেন। সুভাষও এলেন এক সপ্তাহের মধ্যে—চিকিৎসক বোর্ডের উপদেশে মুক্তি পেলেন।

বাংলার জেল প্রায় খালি। আমায় নিয়ে গেল আলিপুর জেলে। সেখানে তখন পাঁচজন মাত্র আছেন। ইয়ার্ডের ফটকেই যাদুদার সঙ্গে দেখা। বেলা গোটা এগারো, স্নান-খাওয়া হয়নি, সেলের দোতলা ব্লকের বারান্দায় পা দিতেই রবিবাবু (অনুশীলনের রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত) বলেন, কি ভূপেনবাবু, আর বলবেন শেয়ালের যুক্তি?

কেন, কি হয়েছে?

মহারাজ (ত্রৈলোক্যবাবু) বলেননি আপনাকে কিছু?

হ্যাঁ, বলেছেন—ঠিক হয়েছে, আপনারা গোপন কাজ করবেন, আর আমরা কংগ্রেসের কাজ করব!

এই কথা তিনি বললেন আপনাকে?

বললেন তো!

রবিবাবুর চোখে-মুখে, হাতের পাতা উলটানিতে হতাশার ভাব দেখা দিল। আস্তে ধীরে পরে শোনা গেল: দুই দল একত্রই কাজ করা হবে, গোপন আর প্রকাশ্য কাজ হিসাবে কোনো ভাগাভাগির ব্যবস্থা নেই। অন্যান্য ব্যবস্থার ভিতর শেষ কথা স্থির হয়েছে, যদি দুই দল এক হয়ে কাজ না করতে পারে, সর্বচেষ্টার অবসানে আমাদের দিক থেকে যাদুদা, আর ওঁদের দিক থেকে নরেনবাবু, অথবা নরেনবাবু যদি সক্রিয় রাজনীতিতে না থাকেন, তাহলে ত্রৈলোক্যবাবু রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করবেন। মিলনভঙ্গের গুরুতর অপরাধের এই সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত।

পরের কথা আগে বলে রাখার একটু প্রয়োজন আছে: বাংলার বিপ্লবী রাজনীতির ধারায় ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে যে অত ওলটপালট হয়ে গেল, তার একটা কারণ এই মিলন ভেঙে যাওয়া। দু'টি দলেরই বহু কর্মী ১৯২৯ সালে যার যার দলের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করেন, তার একটি কারণ এই। মিলন খোলাখুলিভাবে ভেঙে যায় ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের সময়। যাদুদা এর পর থেকে আর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না ক'রে রাঁচিতে ডাক্তারী করতে থাকেন। নরেনবাবু মিলনের সময়ও রাজনীতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেননি, ত্রৈলোক্যবাবুও কোনো সময়েই সক্রিয় রাজনীতি ছাড়েননি। মিলন ভাঙার ইতিহাস অন্যত্র আসবে।

রবিবাবু কিন্তু মিলন কামনায় এই সময় বিশেষ উদ্বুদ্ধ, তার পরিচয় নানাভাবে পেয়েছিলাম। নিজেদের দলের গলদ এঁরা সাধারণতঃ অপরের কাছে খুলে বলতে অভ্যস্ত নন। কিন্তু তখন ওঁদের দলের অপর যে-দুটি কর্মী আলিপুরে ছিলেন, তাঁদের একজনকে ওঁরা গুরুতর সন্দেহ করতেন—সেকথা যাদুদার ও আমার কাছে স্পষ্টই বলেছিলেন। পরে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর আই. বি যখন চট্টগ্রাম থেকে অনেক যুবককে পলাতক ধরবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় নিয়ে আসে, তখন এই লোকটিকে দেখেছি, ঘুরে ঘুরে আমাদের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের উপর নজর রাখতে।

প্রথমে ইনসিনে নরেনবাবুর মুখে, পরে বেসিনে হরিনারায়ণের কাছে কিছু কিছু আভাস পেয়েছিলাম, ১৯২৪-২৫ সালে কি ক'রে বাংলার বিপ্লবী আদর্শ-নিষ্ঠার ইতিহাসে ভাঙন ধরে। এখন যাদুদার মুখে এর বিস্তারিত ইতিহাস শুনলাম। কাদা ঘেঁটে কিছু লাভ নেই। শুধু রাজনৈতিক দিকটার কথাই বলব—যাতে পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাসের কিছু সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে।

আগে বলেছি, ১৯২৩-২৪ সালের বিপ্লবী সংঘটন ও ধরপাকড়ের ভিতর আই. বি-র দু'টি চর, মিহির ঘোষ ও টুনু সেনের হাত কতখানি ছিল। পরে এই দু'টি চরের দলের ভিতর এক বীভৎস দ্বন্দ্ব লাগে এবং তার ফলেও খুন ও খুনের চেষ্টা হয়। সেই সম্পর্কে অনেক যুবক ধরা পড়ে জেলে আসে। এটা ১৯২৪-২৫ সালের কথা।

১৯০৭-০৮ সাল থেকে শুরু ক'রে ১৯১৫-১৬ সাল পর্যন্ত যে বিপ্লব প্রচেষ্টা চলে, সেই চেষ্টার অঙ্গস্বরূপ বাংলায় অনেক ডাকাতি ও নরহত্যা হয়। পরে ১৯২১ সাল থেকে যে-সব যুবক বাংলায় বিপ্লব-চেষ্টায় মাতে, বিশেষতঃ যারা মিহির

ও টুম্বুর মতো লোকের বাক্‌চাতুর্যে প্রতারিত হয়ে দলে আসে, তারা ঐ খুন-ডাকাতিগুলোই কেবল দেখেছিল, সে সবের পিছনে যে আদর্শবাদ ও আদর্শনিষ্ঠা ছিল তা দেখেনি, দেখার প্রয়োজনও মনে করেনি, দেখাবার চেষ্টাও কম হয়েছে। তার ফল হয় সর্বনেশে। এই যে সব যুবক জেলে আসে, আগেকার বিপ্লবীদের তুলনায় এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এই হিসাবে এদের বলব নতুন দলের লোক।

নতুন এবং পুরানোতে সংঘর্ষ লাগলো প্রকাশ্যতঃ আলিপুর জেলে এবং সেটা শুরু হল পুরানোর এক দুর্বলতম অংশের সঙ্গে। এখান থেকে যে-আঘাত শুরু হল সেই আঘাতে ইতিহাসের একটি যুগের আদর্শ ক্রমে ধসে যেতে শুরু করল।

পুরানোর এই দুর্বলতম অংশের যিনি মুখপাত্র তাঁর নাম ধরে নেওয়া যাক নিরুপমবাবু। আজ তাঁকে দুর্বলতম অংশের ভিতর ফেলবার হেতু আছে; কিন্তু একদিন অনেক বীর যোদ্ধার শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছেন ইনি। তাঁদেরই সঙ্গে যদি এঁর ফাঁসি হয়ে যেত, হয়তো তিনি দুর্বলতা দেখাতেন না, জাতকে প্রেরণাই যোগাতেন।

কিন্তু যখন ফাঁসিতে মরবার কল্পনা করেছেন, যুদ্ধে প্রাণ দেবার সাধনা করেছেন, বছরের পর বছর জেলবাসের যে অন্য ধরনের একটা সহন-ক্ষমতা অর্জনের প্রয়োজন, সেদিকে হয়তো দৃষ্টি পড়েনি। তাই এর আগে দীর্ঘ মেয়াদে যখন জেলে যান, তখনও তাড়াতাড়ি খালাসের জন্য নানা কলাকৌশল অবলম্বন করেন—কর্তৃপক্ষের কাছেও, নিজের কাছেও নিজেকে ছোট করেন। ধরাপড়ার পরমুহূর্তেই এক বন্ধুর কাছে যে বুদ্ধি পরামর্শ পান, হতে পারে, তাই ছিল এই দুর্বলতার মূলে। আসল মূল অবশ্য অন্যত্র—বুদ্ধিতে সেণ্টিমেণ্টে যেখানে বিচ্ছেদ ঘটে, মানুষের চরিত্রের দুর্বলতা দেখা দেয় সেখানে। সেণ্টিমেণ্ট একচ্ছত্র হলে মানুষ হয় বেঅকুফ, আর বুদ্ধি যেখানে সেণ্টিমেণ্টকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়, সেখানে সৃষ্টি হয় শয়তানের।

এবারে আমরা সবাই তো ধরা পড়ি, বলতে গেলে, একরকম বিনা কারণে। সেই যুক্তিতে, একদিনে হোক, পাঁচদিনে হোক,—যাঁরা এঁর সঙ্গে জেলে একত্র থাকতেন তাঁদের এই কথাটা বুঝিয়ে নিয়ে চলতে পারতেন, জেলে পচে লাভ কি? যত তাড়াতাড়ি খালাস হতে পার, সর্ব উপায়ে তার চেষ্টা করা উচিত। বুদ্ধি, বাক্‌চাতুর্য ছিল এঁর অসাধারণ।

বুদ্ধি বাক্‌চাতুর্যে অপর দিকে নতুন দলের মুখপাত্রটিও কম ছিলেন না। এঁর

কথা অন্য সম্পর্কে আগে উল্লেখ করেছি। সেখানে নাম বলেছি আশুতোষ মিত্র। সেখানে মিহির ঘোষ ছিলেন এঁর friend, philosopher and guide. জেলে ইনি নিজেই নিজেকে চালাতেন এবং অপরকেও। শিক্ষিত মানুষের ভিতর কস্তুরী মৃগটি সবচেয়ে অশিক্ষিতমনা। ইনি ছিলেন একটি কস্তুরী মৃগ।

জেলখানায় এঁর ব্যক্তিগত কিছু দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ার দরুন বাংলার আই. বি তার সুযোগ নেয়। সেই উপলক্ষে এঁকে আলিপুর, প্রেসিডেন্সি ও দার্জিলিং জেলের ভিতর পর পর টানা-হেঁচড়া করতে থাকে। এই সব জায়গায় ভূপেন চ্যাটার্জি, টেগার্ট ও লর্ড লিটন এঁর সঙ্গে বার বার দেখা করে। দেশবন্ধু এই সময় চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন, '২২-২৩ সালে এমন কিছু বিপ্লবী কাজকর্ম হচ্ছিল না, যার জন্য এত ধরপাকড়ের প্রয়োজন ছিল। ওরা সেই চ্যালেঞ্জের জবাব সংগ্রহ করে।

আশুতোষ যখন এ-জেল ও-জেল করছিলেন, তখন এঁর এক চ্যালা—ধরুন, নবীন তার নাম—পড়ে নিরুপমবাবুর সঙ্গে এক ঘরে। নবীন একেবারে মুগ্ধ হয়ে যায়। তার এই মুগ্ধতার সুযোগ নিয়ে নিরুপমবাবু আশুতোষের বিরুদ্ধেও যত যা কিছু বলার ছিল নবীনকে বলেন। নিরুপমবাবুর রাগ ছিল—কারণ, আশুতোষদের ক্রিয়াকলাপের ফলেই এবারে ধরা পড়েছেন।

নিন্দাকে যদি বিদ্রূপে পরিণত করা যায়, তার শক্তি যে কতগুণ বাড়ে, নিরুপমবাবুর মতো তা বাংলায় খুব বেশী লোক জানত না। তিনি আশুতোষের দলের এবং তখনকার দিনের অন্যান্য তরুণ বিপ্লবীর নাম দিয়েছিলেন "তরণী স্থানের দল।" বয়স নবীনের যত অল্পই হোক, খাতির তার সঙ্গে তখন জমজমাট। নিজেও মালকোছা মেরে কাপড় পরে, নবীনকেও পরিয়ে, তার হাতে একগাছা লাঠি দিতেন, নিজেও একখানা নিয়ে পাঁয়তারা ভেঁজে দু'জনে লাঠি খেলতেন আর নজরুলের প্যারডি ক'রে গান ধরতেন—

ওরে ও তরণী স্থান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ

বন্ধুরা খুব হাসতেন।

হঠাৎ একদিন নবীনের বদলীর হুকুম এল প্রেসিডেন্সি জেলে। আশুতোষ তখন প্রেসিডেন্সিতে। অনেকের অনুমান, এ বদলী আশুতোষের অনুরোধে। রায়বাহাদুর ভূপেন চাটুজ্যের ইতিপূর্বেই আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে আলিপুর ও প্রেসিডেন্সি জেলে। খালাসের বা জেলের বাইরে অন্তরীণ হবার আগে

আই. বি-র কর্মচারীরা রাজবন্দীদের মন পরীক্ষা করে—এই অজুহাতে ভূপেন চাটুজ্যে রাজবন্দীদের ওআর্ডের ভিতরেই যায়। কেউ কেউ বাইরেও ইতিমধ্যে অন্তরীণ হয়েছেন। আবার প্রেসিডেন্সি জেলে মনোমোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গে যখন দেখা করতে চায়, তখন তিনি বলে পাঠান I'll kick him if I meet him. ভূপেন চাটুজ্যে তার জবাব দেয়, মুখের দোষেই তিনি জেলে থাকবেন।

এই আনাগোনার ফলে ভূপেন চাটুজ্যের সাথে কোনো কোনো রাজবন্দীর খাতির জমে উঠেছে। ছোটখাটো অনুরোধ তাদের ফেলা যায় না। আশুতোষ অনেক কিছুই করিয়ে নিতে পারেন, সকলের ধারণা।

নবীন প্রেসিডেন্সিতে বদলী হবার কিছুকাল বাদে হঠাৎ একদিন আশুতোষ আবার ফিরে এলেন আলিপুর জেলে। নিরুপমবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের ইয়ার্ডের দরজার বাইরে—আশুতোষ সামনে দিয়ে তাঁর ইয়ার্ডে যেতে যেতে বলেন, 'কিরে বুড়ো? কেমন আছিস?' নিরুপমবাবু তো হতবাক! মাথায় হাত দিয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন নিজের খাটটিতে। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেন, কি হল? অনেকক্ষণ কোনো কথাই নেই। তারপর বলেন, নবনে ব্যাটা সব বলে দিয়েছে।

বলবে না? পুরানো গুরু-চ্যালার সম্পর্ক যে! অত বুদ্ধিমান লোক হয়েও নিরুপমবাবু এইটুকু ধরতে পারেননি। মনে করেছেন, নবীনকে হাত ক'রে ফেলেছেন।

এখন উপায়? আশুতোষ তো যত রকম ক'রে পারে আমার সম্বন্ধে লাগিয়েছে ভূপেন চাটুজ্যের কাছে।

শুরু হয়ে গেল ভূপেন চাটুজ্যের খাতির পাবার প্রতিযোগিতা। আজ যদি আশুতোষের ইয়ার্ডে গিয়ে ভূপেন চাটুজ্যে আধ ঘণ্টা কাটিয়ে আসে, কাল নিরুপমবাবুর ইয়ার্ডে ওকে ধরে রাখা হয় এক ঘণ্টা। কোনো দিন সারাটা দুপুর একটা খাটে শুয়ে কাটিয়ে যায়। সেই সুযোগে সেই ইয়ার্ডের যত রাজবন্দী নিজের নিজের আবেদন-নিবেদন নিয়ে তার কাছে হাজির হন। এ-ইয়ার্ডে বুড়ো দাদা ও-ইয়ার্ডে তরুণ দাদা তাঁদের হয়ে ওকালতি করেন।

আগেকার দিনে আদর্শ-নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মসম্মানবোধটা জড়িয়ে ছিল। আজ এতখানি পর্যন্ত তা নামল যে, ভূপেন চাটুজ্যে দুপুরে শোবার আয়োজনে যখন জামা খুলছে তখন চাকরকে পা ধোবার জল দিতে বলে, রাজবন্দী নিজে গামছা-খানা ধরে দাঁড়িয়ে থাকছেন।

এর পর যদি ছোট ছোট ছেলেরা—এদের শিক্ষাদীক্ষা ও আদর্শজ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছি—গিয়ে বলে, স্যার, আমার মায়ের অসুখ, দু'টো দিনের ছুটি দিন স্যার, অথবা আর পাঁচটা টাকা ভাতা বাড়িয়ে দিন স্যার, তা হলে তাদের দোষ দেবার কি আছে? সবাই করছে, তাই আমিও করছি—এদের কাছে এইটেই চরম যুক্তি। সবার পেছনে চলা যে আদর্শের পেছনে চলা নয়, সবার থেকে নিজেকে ছেট করা, সে কথা তো এদের কেউ শেখায়নি।

ইউরোপিয়ান ওআর্ডাররা পর্যন্ত রাজবন্দীদের ক্যারিকেচার করতে শুরু করল। অফিসে গিয়ে টেলিফোন ধরে রায়বাহাদুরকে কি ভঙ্গীতে ডাকে, আর ওদিক থেকে রায়বাহাদুর যখন বলে, না হবে না, তখন এদিকে কি পরিমাণ ঘাড়টা কাৎ হয়ে যায় তাই দেখায় আর মুখে বলে, রায়বাহাদুর, রায়বাহাদুর, একটি দিন স্যার।

এমনি অনেক কিছু।

এর অপর দিকও কিন্তু ছিল। গোপীনাথ সাহার ফাঁসির উল্লেখ ক'রে এই ওআর্ডারদেরই একজন বলত, হি ওয়াজ এ ম্যা-আ-আ-ন (He was a man)। ফাঁসির জন্য যখন ডাকতে গেছে, দেখে গোপী ঘুমুচ্ছে। এক কথাতেই উঠে সঙ্গে চলল। কী সে পা ফেলার ভঙ্গী! বুক ফুলিয়ে ফাঁসির কাঠে দাঁড়াল, নিজেই যেন সাহায্য করতে চায় ফাঁসির রশিটা গলায় বাঁধতে। কিন্তু ওর হাত দু'টো তখন পেছনে বাঁধা।

দেওয়ালের দিকে লোক গেলে ঐ ওআর্ডাররাই দেখিয়ে দেয়, গোপীনাথের শবদেহ এখানে দাহ করা হয়েছিল। ওদের কাছেও ওটা যেন তীর্থক্ষেত্র!

ভূপেন চাটুজ্যের প্রসাদলাভের প্রতিযোগিতা প্রবল তখন। যাদুদাকে নিয়ে আসা হল আলিপুরে। নিরুপমবাবুর এক সঙ্গী—যাদুদারও তিনি বন্ধু—বলেন, রায়বাহাদুরের সঙ্গে কথা বলনা একবার! যাদুদা পাশ কাটান! অবশেষে একদিন রায়বাহাদুরকে ডাকিয়ে আনা হল, যাদুদাকে ডাকবার জন্যে এদিকে-ওদিকে লোক ঘুরল। কোথাও সন্ধান পাওয়া গেল না। ভূপেন চাটুজ্যে বুঝল। বলেই গেল, যাদুবাবু আমার সঙ্গে দেখা করলেন না!

বন্ধুটি তারপর বললেন, একবার দেখা করলে কি এমন দোষ হতো?

পুরানো আদর্শনিষ্ঠা একটা স্ফুলিঙ্গ পড়ে যেন গর্জে উঠল: "কি বলছেন আপনি! আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এ কি হচ্ছে? মুক্তি পাবার জন্যে আই. বি-র খোশামোদ? আমরাই না এতদিন বড়াই করেছি, আমরা শুধু একটা

জাতির স্বাধীনতার সৈনিক নই, আমরা একটা নতুন জাতির স্রষ্টা ও শিক্ষকও? কিন্তু আজ আমরা কি শেখাচ্ছি? রাজনৈতিক বন্দীরা যেখানে থাকবে, সেটা একটা দেবতার মন্দির। সেখানে এসে আই. বি অফিসার আড্ডা দেবে, খাবার খাবে, আর রাজবন্দীদের বিছানায় শুয়ে গড়াবে?"

বন্ধুটির আর বাক্য সরল না। এই বন্ধুর দল অল্পদিনের ভিতরই সব হয় খালাস হয়ে গেলেন, নয়তো অন্তরীণ হয়ে বাইরে চলে গেলেন।

অন্যপক্ষে অনিবার্য কারণে তরুণদলে নীতির দিকে ভাঙনও যেমন দেখা দিল, অপরদিকে ঐ আলিপুর জেলেরই এক কোণে ছিল একটা শুকনো খড়ের গাদা, তাতে ঐ স্ফুলিঙ্গে আগুন ধরিয়ে দিল—

আগে বলেছি জেলের বাইরে মিহির ঘোষ আর টুনু সেনের দল যখন বিপ্লব চেষ্টার নামে ভূতের নৃত্য শুরু ক'রে দিয়েছে, চট্টগ্রামের সূর্য সেন তখন পলাতক অবস্থায় কলকাতায় এসে দলের কাজের ভার নিলেন। পুরানো দুই দলেরই বহু কর্মী তখন বাইরে। 'নতুন দল' বলে যাদের উল্লেখ করেছি, তারাও বহুক্ষেত্রেই এই দুই দলের সংস্পর্শেই রাজনীতির ক্ষেত্রে এসে জুটেছে, পরে পড়ে গেছে মিহিরের বা টুনুর বা রমণীর পাল্লায়।

যুক্তপ্রদেশের কিছু কর্মীও এই সঙ্গে এসে জুটেছিলেন। সূর্যবাবু এই সবের ভিতর থেকে কিছু লোক বেছে নিয়ে কাজ শুরু ক'রে দেন। কাজের ভিতর দিয়ে ছাড়া আদর্শ-প্রীতি বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, এই ধারণা তিনি বরাবর পোষণ করতেন।

কিন্তু যেখানে চারিদিকে এত অসৎ সংস্পর্শ, সেখানে গোপন কাজ চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত শক্ত। একথা বুঝত বলেই মিহির ঘোষের মতো সব লোকদের দিয়ে ১৯২০-২১ সালে বাংলার আই. বি বিপ্লবী দল গড়তে শুরু করেছিল। সূর্যবাবুর প্রেরণায় দক্ষিণেশ্বরে বোমা তৈরীর একটা জায়গা হয়েছিল। সেটা ধরা পড়ে যায়। সেই সম্পর্কে কলকাতায় শোভাবাজারে এবং আরও কোনো কোনো জায়গায় অনেক কর্মী ধরা পড়েন।

এঁদের ভিতর একটা শ্রেষ্ঠ অংশ ছিলেন উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠের সঙ্গে সম্পর্কিত। যুক্তপ্রদেশের, চট্টগ্রামের এবং বরিশাল শংকর মঠ ও দৌলতপুর সত্যাশ্রমের কর্মীও সব এঁদের ভিতর ছিলেন; দুই দলেরই লোক ছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এঁদের ভিতর জানতাম বরিশালের অনন্ত চক্রবর্তীকে ও চট্টগ্রামের রাখাল দে'কে। যেমন পবিত্র এঁদের চরিত্র, তেমনি দেহের শক্তি,

তেমনি মনের নির্ভীকতা। অনন্তের কথা অন্যত্র উল্লেখ করেছি। চট্টগ্রামের রাখাল দে চারুর সঙ্গে প্রথম কুমিল্লায়, পরে উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠে ছিলেন। ১৯২৩ সালে আমি যখন ধরা পড়ি, তখন এঁর স্বাস্থ্য খুব খারাপ ছিল বলে সুন্দরবনের গোসভায় বন্ধু আশুতোষ রায় চৌধুরী ও অশ্বিনী রায়ের (পুরানো দিনে এঁর নাম ছিল "চাচা") কাছে রেখে যাই।

বিভিন্ন স্থান থেকে কর্মী বেছে নিয়ে প্রায় সময়ই কাজ করা সম্ভব হয় না। যদি হতো তা হলেই হয়তো এই দক্ষিণেশ্বরের বোমার সম্পর্কে যে দলটি ধরা পড়ে তেমনি দল বাংলার বিপ্লব ক্ষেত্রে বার বার দেখা দিত।

এঁদের সবাইকে মামলায় ফেলা সহজ হয়নি। তাঁরা অনেকে ডেটিনিউ হন। এঁদের ভিতর সুপরিচিত আর্টিস্ট চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কেউ কেউ যাদুদার সঙ্গে ছিলেন। যাঁরা মামলায় পড়েন এবং পরে যাঁদের সাজা হয় তাঁরা ছিলেন একটি ভিন্ন ইয়ার্ডে।

নিজেদের সহকর্মীরা সামান্য টাকা-পয়সার জন্য, জিনিসপত্রের জন্য পরস্পরে ঝগড়া করেন, আই. বি-র কৃপাপ্রার্থী হন, খালাসের জন্য বা দু'পাঁচদিনের ছুটির জন্য যে-কোনোরকম হীনতা স্বীকার করতে প্রস্তুত—এসব দেখেশুনে লজ্জায় ঘৃণায় এঁদের মাথা কাটা যেত। কদর্যতা আরও অনেক দূর গিয়েছিল। সে সবের উল্লেখের প্রয়োজন নেই। শুধু আদর্শের বিপর্যয়ের কথাই বলি। বিলিতী কাপড় কেন পরব না, বিলিতি সিগারেট কেন খাব না, বিলাসিতা কেন বাড়াব না—এসব প্রশ্ন বিপ্লবী দলে এই সময়েই প্রথম ওঠে—আলিপুর জেলে।

উপদেশে কোনো কাজ হল না, নরকের শক্তি প্রবলতর। নিজেদের জীবন দিয়ে রাজনৈতিক কর্মীদের মান বাঁচাতে হবে, আদর্শকে জীবন্ত রাখতে হবে। ভূপেন চ্যাটার্জিকে হত্যার আয়োজন হল। হত্যা হয়েও গেল। আয়োজন এবং কাজ সবই করলেন দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলার আসামীরাই।

ডেটিনিউরা দু'একজন জানতেন মাত্র। দক্ষিণেশ্বরের আসামীদের ভেতর এমনি যাঁরা জানতেন এবং কাছে ছিলেন, তাঁদেরই একজনের ফাঁসি হয়ে গেল, আবার স্বহস্তে যাঁরা দুজন লোহার ডাণ্ডা বসান, তাঁদের হয় দ্বীপান্তর দণ্ড। যাঁর যাই হোক, সবাই ফাঁসির কাঠে ঝুলবার উচ্চাশাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে আয়োজন করেছিলেন এবং হত্যার সময়ও সবাই উপস্থিত ছিলেন—যেন ফাঁসি দেবার জন্যে কাউকে বেছে না নিতে পারে। কিন্তু এ মামলায় কি ভাবে সাক্ষী যোগাড় হয়, তা এখন প্রায় সবাই জেনেছেন।

মিথ্যা সাক্ষী জুটিয়ে ফাঁসি দেয় অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরীকে এবং দ্বীপান্তর দণ্ড হয় হরিনারায়ণ চন্দ্র, ধ্রুবেশ চ্যাটার্জি, অনন্ত চক্রবর্তী ও রাখাল দে'র।

ভূপেন চ্যাটার্জির পেছনে অমূল্য প্রাণ গেল। কিন্তু ভূপেন চ্যাটার্জি ভূত হয়ে চাপল বাংলার রাজনীতির স্কন্ধে।

অনেকের ধারণা, আই. বি-র কাজ বুঝি কেবল খবর সংগ্রহ ক'রে বিপ্লবী ধরা। কি মনোভাব থেকে বিপ্লবী উত্তেজনা আসে, ছড়িয়ে পড়ে, এবং দল গড়ে ওঠে, সেটা বুঝে সেটাকে সমূলে নষ্ট করার চেষ্টাও যে আই. বি-র একটা কাজ —এ-ধারণা আমাদের খুব বেশী লোকের নেই।

নিরুপমবাবু এবং আশুতোষ ও তাঁদের বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে অতীতের যতরকম গল্প শুনেই ভূপেন চ্যাটার্জি নিরস্ত হল না, নিরুপমবাবু এবং আশুতোষ দু'জনার সঙ্গেই পুরানো এবং নতুন বিপ্লবীদের মনস্তত্ত্বের আলোচনা ক'রে—কোন্ উচ্চাশা আগেকার দিনের শিক্ষা দীক্ষাকে জাগাতো, কোন্ উচ্চাশা নতুন কর্মীদের প্রেরণা জোগায়—তার সব কিছু জেনে নিল। তারপর শিষ্য গুরুর স্থলাভিষিক্ত হল।

আশুতোষ কথা তুললেন, দাদারা আর কিছু করবে না, তরুণরা দাদাদের পেছনে না ঘুরে নিজেরা দল গড়।

নিরুপম একেই শ্লেষের ভাষা দিলেন: "দাদা কোম্পানীর সম্বল দু'টি ভাঙা পিস্তল, ওই দেখিয়ে ওরা দলপতিত্ব করবে।" এতটুকু বলার পর নিরুপমবাবুর আর কিছু বলার অবশিষ্ট থাকত না। অপরের নিন্দা করতে পারতেন, কিন্তু কি করতে হবে তার সন্ধান দিতে পারতেন না। তাঁর কোনো চেষ্টা তাই কখনও দানা বেঁধে ওঠেনি। পুরানো বিপ্লবীদের সাধনাকে হেয় ক'রে তুলতে ইনি এবং এঁর বন্ধুরা প্রথমবারে জেল থেকে বেরিয়েই অনেকখানি সহায়তা করছিলেন। এখন তাই আর একটু বাড়ল মাত্র। "দাদা কোম্পানী" কথাটা যাঁরা বলে বেড়াতে লাগলেন, তাঁরা কেবল বুঝলেন না যে, তাঁরা ভূপেন চাটুজ্যের অনুচরের কাজ করছেন।

অপর পক্ষে আশুতোষ যে বীজ ছড়ালেন, তারই গাছগুলি ডালপালা মেলে বিশাল জঙ্গল হয়ে দাঁড়াল পরবর্তী যুগে—anti-terrorist campaign-এর আমলে—অ্যাণ্ডার্সনের প্রেরণায় এবং বাংলায় কম্যুনিস্ট পার্টির সহায়তায়। অ্যাণ্ডার্সনের চরেরা এবং কম্যুনিস্ট পার্টি জেলে এবং জেলের বাইরে পরস্পরের

জন্ম রিক্রুট সংগ্রহ করল—পুরানো বিপ্লবী দলগুলো ধসে গেল। জনকতক লোককে টেনে নেওয়াতেই যে বিপ্লবী দল মরে গেল তা নয়। ভূপেন চ্যাটার্জি-নিরুপম-আশুতোষ সফল এখানেই; বহুযুগের ইতিহাসে বাংলার বিপ্লবী সাধনা এদেশে যে এক নতুন আপন-ভোলা আদর্শ-নিষ্ঠার দীপ জেলেছিল, তাকে নিভিয়ে দিল।

আগেকার দিনের বিপ্লবীরা শিখতেন, শেখাতেন—নিজেদের জন্ম কিছুই চাইতেন না—নাম না, যশ না, নেতৃত্ব না। এগুলো মানুষের last infirmity-র ভিতর। এই last infirmity-তে হাত পড়বার বহু আগেই ভূপেন চ্যাটার্জি-আশুতোষের চেষ্টায় যেটা জাগত, সেটা নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা এবং এই আকাঙ্ক্ষা-জাত ঈর্ষা। এই ঈর্ষাকে জাগিয়ে ১৯২৯-৩০ সালে সব দলের ভিতর বিদ্রোহের সৃষ্টি করল। এঁদের নিয়ে যে সম্মিলিত দল গড়ার চেষ্টা হয় তাকে বলা হতো Revolt Group। সরকারী কাগজপত্রে এর নামকরণ হয়েছে N. V. P. বা New Violence Party। ১৯৩০ সালের এপ্রিল থেকে যে অপূর্ব অসাধারণ-বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চলে তাকে এই রিভোল্ট গ্রুপের কাজ বলে চালাবার অপচেষ্টা কেউ কেউ করেছেন। কিন্তু এপর্ব একান্তভাবে যুগান্তরের কীর্তি। তার পরিচয় পাওয়া যাবে ১৯২৮-৩০ সালের যুগান্তরের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'স্বাধীনতা'য়। কিন্তু জেলে ক্যাম্পে anti-terrorist campaign-এর ভিতর দিয়ে বিশাল দলে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা হয়। এতে নতুন নামের সব গ্রুপও যেমন দেখা দেয় তেমনি কমুনিস্ট দলেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়। আদর্শের দ্বন্দ্বে অনেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে যান।

খালাসের পর আশুতোষের প্রচার-কেন্দ্র রইল মধ্য কলকাতায়। কিন্তু তাঁর একটি মন্ত্রশিষ্য জুটলেন দক্ষিণ কলকাতায়—বোমার আর রিভলবারের আশায় যে আড্ডায় গিয়ে ১৯২৯-৩০ সালে বহু কর্মী ধরা পড়েন। এই দুই কেন্দ্রের মাঝে পড়ে Revolt Group ভ্রূণেই শেষ হয়ে গেল।

সে সব পরের কথা।

আপাততঃ এই অমৃত-সমান কাহিনী শুনতে শুনতেই ১৯২৭ সালের আগস্ট মাস ফুরিয়ে গেল। এর ভিতর আমাদের মন পরীক্ষা করতে লোম্যান আর নলিনী মজুমদার বারকয়েক এল।

থাইসিসে আক্রান্ত—এই সন্দেহে জীবন বর্মা থেকে বাংলায় আসেন, আমি তখন বেসিন জেলে। তাঁর খবর জানতে স্বভাবতঃই আমি ব্যগ্র। স্টেট

প্রিজনার স্টেট প্রিজনারের কাছে চিঠি দিতে পারত না। আমি জীবনকে এক চিঠি দেই বেসিন থেকে এবং সেই সঙ্গে D. I. G., I. B.-কে এক চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানাই, যেন ঐ চিঠিখানা পাশ করা হয়। লোম্যান তখন ডি. আই. জি। সে আমার চিঠিখানা পাশ ক'রে আমায় এক ব্যক্তিগত চিঠি লিখে সেই খবর জানায়। আমি জীবনের উত্তর পেয়ে আবার যখন তাঁকে চিঠি দেই, সেই সময় ডি. আই. জি-কে চিঠি লেখবার বেলায়, আগের চিঠি পাশ করার জন্ম ধন্যবাদ জানাই। মামুলি ধন্যবাদ। তবু আমি যে ডি. আই. জি-কে ধন্যবাদ দিতে পারি, তা ওরা ভাবতে পারেনি। লোম্যান তা নিয়ে বন্ধুদের কাছে বলেছে, Bhupen Babu has thanked me. আলিপুর জেলের এত কাহিনী জানলে ধন্যবাদ দিতাম কিনা সন্দেহ। যাই হোক, এর কিছু ফল উপভোগ করলাম— জীবনের সঙ্গে আলিপুর জেলে একবার দেখাও হল। ডাক্তার হিসাবে যাদুদাকে দিয়ে তিনি এর আগে স্বাস্থ্যও পরীক্ষা করিয়ে গেছেন। এরপর জীবন গেলেন চিকিৎসার জন্য আলমোড়ায়, যাদুদা প্রদেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে রাঁচিতে এবং আমি অন্তরীণে কালিম্পং-এ।

অন্তরীণে

কালিম্পং যাবার আগে দার্জিলিং-এ পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে হল। ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে দেখা নামমাত্র। ভদ্রতাই দেখাল। তারপর যে অফিসারটি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, তার সাথেই পাঠিয়ে দিল অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে। এই লোকটি বিখ্যাত সর্দার বাহাদুর ল্যাডেন লা। ১৯২৩ সালে যখন মেদিনীপুর জেলে যাদুদার সঙ্গে ভারতের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ভূগোল বিবরণ পড়ি, সেই সময় থেকে লোকটির কিছু কিছু পরিচয় জানি।

একদিকে রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ফেলো, অন্যদিকে তিব্বতে ও ভূটানে ইংরেজের অনুগত ও অনুগৃহীতদের সাথে যোগাযোগ রাখেন এবং তিব্বত ভূটানসহ ওদিককার সমস্ত সীমান্ত অঞ্চল সম্পর্কেই খবর সংগ্রহের কাজ করেন। এই উপলক্ষে বাংলা, বিহার, আসামের অনেক রাজনৈতিকের সঙ্গে একটা গোপন সম্বন্ধ ছিল। তিব্বতে বেড়াতে যাবার আগ্রহ তখন আমার প্রবল —এই কথা পেড়ে আলাপ জুড়ে দিয়েছি, এমন সময় বিহারী মুসলমান এক ভদ্রলোক এলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন—সম্ভ্রান্তবংশীয় এবং বিশিষ্ট কংগ্রেস ও খিলাফৎ নেতা বলে। আলাপের ধরনে বুঝলাম, ইনিও সংবাদ সংগ্রহে ওঁর সহায়তা করেন।

স্থানীয় একজন পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে দিলেন, ঘুরে ঘুরে শহর দেখলাম। দিনটা মেঘে ঢাকা, ম্লান। সন্ধ্যার ঠিক আগে পৌঁছালাম Step Aside বাড়ি-খানার সামনে। আপনা থেকে চোখে জল এল।

দু'বছর আগে—তখন আমি ইনসিন জেলে—কে একজন পরিদর্শক এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলছি—হাতে দিয়ে গেল Rangoon Gazette কাগজখানা। ইংরেজদের কাগজ, পাতা উলটাতে একটা দুর্লক্ষ্য জায়গায় চোখে পড়ল

দার্জিলিং-এর ছোট্ট একটি খবর—নামকরা রাজনৈতিক নেতা সি. আর. দাসের আজ এখানে মৃত্যু হয়েছে।

সেদিনকার সে ব্যথা না ফুটল ভাষায়, না চোখের জলে—এ যেন গৃহকর্তা বাড়ির সবগুলি মানুষকে একান্ত অসহায় ক'রে চলে গেলেন।

আজ সন্ধ্যায় Step Aside বাড়িখানার সামনে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল সেদিনের কথা। এই বাড়িতেই দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

কালিম্পং বাজারের সামান্য নীচে ওখানকার খেলার মাঠ। আরও খানিকটা নীচে বুদ্ধিমন্ত সিং চেমজং-এর বাড়ি। তাঁর নীচের তলার দু'খানা ঘর আর একখানি বাথরুম আমার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। পাহাড়ের গা কেটে ছোট্ট একখানি কাঁচাঘর তৈরী হয়েছে রান্নার জন্যে। যেদিন পৌঁছালাম—সেইদিনই এক পাচক নিযুক্ত হল—প্রেম তার নাম, ছোট্ট ছেলেটি, লেপচা ক্রিশ্চিয়ান, বাবা কসাইয়ের কাজ করে। আমার আগে চৈতন্যদেব কালিম্পং-এ অন্তরীণ ছিলেন—তাঁরও ছিল ঐ ঘর আর ঐ পাচক। চৈতন্যদেবের 'কালিম্পং-এর ভুটিয়া ভিখারী' সুপরিচিত ছবি।

সামনের বারান্দাটুকুতে বসি। কালিম্পং-এর মেঘলা দিন তখনও চলছে। বাড়িখানার নীচে থেকে ধাপে ধাপে পাহাড় নেমে গেছে, আবার উঠেছে—প্রায় দশ-বারো মাইল দূরে ওদিককার উচ্চতম শীর্ষ এগারো হাজার ফুট, গভীর জঙ্গলে ঢাকা সমস্ত পাহাড়টি, তারই ঘোলাটে কৃষ্ণনীলের বুক চিরে নেমেছে গলিত রজতের ঋজুরেখা—তিস্তার বড় একটি ঝরনা।

হিমালয়কে আগে দেখেছি হরিদ্বারে, লছমনঝোলায়।—সেখানে যা দেখবার সুযোগ জোটেনি, তা এই প্রথম দেখলাম—আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং ছায়ামধঃসানুগতাং…শৃঙ্গাণি যস্যাতপবন্তি।

নতুন পরিচয় তখনও বিশেষ হয়নি, নিঃসঙ্গ জীবন। পরে যখন হল, তখনও নিঃসঙ্গতা তেমন কাটল না। কিন্তু অন্তরে দৈন্য কিছু বোধ করিনে। রিক্ততার মাঝেই পূর্ণতার একটা স্বাদ রয়েছে যেন সমস্ত মনে প্রাণে। ব্যথা হয়তো আছে, কিন্তু ব্যথা নেই তো শূন্য মনে।

ডি. আই. জি-র মারফত অরুণদার, জীবনের চিঠি মাঝে মাঝে পাই।

১৯১৬-১৭ সালে পলাতক অবস্থায় মেদিনীপুর, বাঁকুড়া অঞ্চলে ঘুরতে গিয়ে দেখেছি অন্তরীণে আবদ্ধ দু'একজনের জীবন। গ্রামের ভিতর সঙ্গী নাই, সাথী নাই—আছে ঘরের পাশেই থানায় অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত সরকারী কর্মচারী।

অন্তর বলে বস্তুটি এদের প্রায় শূন্য। একযুগের শিক্ষা-সংস্কৃতি ভেঙে পড়েছে, অপর যুগেরটাও পায়নি। রাষ্ট্রাধিপতি ইংরেজ—শিক্ষা সংস্কৃতি, সব কিছুতে তারাই যেন শ্রেষ্ঠ। তাদের কিন্তু খুব উঁচু পদের দু'একজনকে বাদ দিলে আর যারা, তারা অন্তরের শূন্যতায় সময়কে ভরে রাখে খেলাধুলায়, মদে আর নারীতে। ইংরেজের সাথে সাথে খেলাধুলা আমাদের দেশে ঢুকেছে বেশীর ভাগই শহরে। ওদের অনুকরণে দেশী কর্মচারীরা, যারা মদের মূল্য পোষাতে পারে, তারা খায়। নীচের দিকের কর্মচারীদের ভাগ্যে সেটা সব ক্ষেত্রে জোটে না। বাকি দিকের ব্যভিচারটা যেখানে অপেক্ষাকৃত সহজ-আয়ত্ত, অন্তরীণে রাখবার স্থান অনেক ক্ষেত্রে সেখানেই বেছে নেওয়া হতো—বিশেষ ক'রে অল্পবয়স্কদের জন্য—যাদের দলের ভিতর শিক্ষাদীক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হবার আগেই ধরা হয়েছে। এসব দিকে টেগার্ট-লোম্যানের শিক্ষক ছিল ভূপেন চাটুজ্যে, নলিনী মজুমদারের দল। আজও এই চাটুজ্যে-মজুমদাররাই আসল শাসক!

জেলের বাইরে অন্তরীণের জীবন এই আমার প্রথম। পুলিশের ভিতর বন্ধু জোটেনি—তাদের সঙ্গে সম্পর্ক সকালে একবার, বিকালে একবার হাজতে—থানার ঘরে চেহারাটা দেখিয়েই বেরিয়ে পড়ি।

বন্ধু জুটল স্থানীয় বাঙালীদের ভিতর—দু'একজন আমার সমবয়সী, অধিকাংশ ছোট। বাঙালীও বেশী নেই।

পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর বন্ধু ডাঃ গ্রেহাম তখনকার বাংলায় সুপরিচিত ছিলেন। এই পাদরি ওখানকার 'কালিম্পং হোম'-এর প্রতিষ্ঠাতা। এই 'হোম'-এর প্রভাবে স্থানীয় লেপ্‌চারা অনেকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। লেপ্‌চা মেয়েরা সুন্দরী বলে পরিচিত। কালিম্পং হোমের ছেলে ও মেয়ের দল এবং ওখানকার লেপ্‌চা মেয়েদের নিয়ে একটা আলাদা আবহাওয়া। স্থানীয় বাঙালী ছেলেরাও এই আবহাওয়া উপভোগ করে।

এই ধরনের সঙ্গী-সাথী আমার জীবনে এই প্রথম। আমরা বিপ্লবী দলে যারা মানুষ হয়েছি, কালিম্পংয়েই প্রথম অনুভব করলাম, তাদের গড়ে উঠবার সমস্ত আবেষ্টনটিই আলাদা। দেশের ছেলেরা সাধারণতঃ যে অবস্থার ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে, তার সাথে এর কোনো সাদৃশ্য নেই।

যে সব বিপ্লবী কর্মী অন্তরীণে গিয়ে একটা উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ভিতর পড়েছেন, তাঁদের অনেক নিন্দা শুনেছি, করেছিও। তাঁদের সঙ্গে আজ নিজের

অবস্থার তুলনা করি। কাজকর্ম নিজে সৃষ্টি না ক'রে নিলে কোথাও কিছু নেই। পড়াশোনাও তাই। আমার সমাজ থেকেও আজ আমি দূরে—লোকলজ্জায় ভয় নেই। যেসব বন্ধু সারাদিন আমারই ঘরে বসে তাস পিটছেন, চা সিগারেট খাচ্ছেন, অবাধে আমি সর্বব্যাপারেই তো তাঁদের সহচর হতে পারি।

মনে হয়, এটা সুযোগ-সুবিধার কথা নয়, প্রবৃত্তি-অপ্রবৃত্তির কথা। এই প্রবৃত্তি-অপ্রবৃত্তি কোনো পরীক্ষার সামনেও পড়ে না, যদি হৃদয়ের বন্ধন থাকে অন্যত্র। তাছাড়া আছে নিজের সম্মানবোধ, আদর্শের সম্মানবোধ। নিছক কর্তব্য-বোধ জীবনের অনেক ঝড়ঝাপটায় সামাল দিতে পারে না, যতক্ষণ না তার মূল রস টানে অন্যত্র থেকে। এই সত্য, এই তত্ত্ব থেকে সেকালে আমাদের বিপ্লবী জীবনের গোড়ায় ধর্মসাধনার উপর জোর দেওয়া হতো। এতে ক'রে যেমন ফাঁসি অত্যাচারের সামনে দাঁড়াবার জন্য মানুষ তৈরী হবে, তেমনি কামিনী-কাঞ্চন সম্পর্কে উদাসীন থেকে সমাজে চরিত্রবান পুরুষ বলে পরিচিত হবে এবং চরিত্রের বলে অপরকে স্বাধীনতাকামী হতে উদ্বুদ্ধ করবে—এই ছিল প্রথম যুগের বিপ্লবী নেতাদের ধারণা।

দেশের প্রতি কর্তব্য করতে তখন বলা হতো ভগবৎ-লাভ বা ব্যক্তিগত মুক্তি লাভের উপায় হিসাবে। কিন্তু একান্তভাবে এই নিজের মুক্তির সন্ধান থেকে স্বার্থের সন্ধান দূরের বস্তু নয়—বিশেষ ক'রে সাধ যখন দূর থেকে দূরের দিগন্তে মিলিয়ে যেতে থাকে, আর সাধনা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত হয়ে আসে। এতে পরিণামে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের জীবনে চূড়ান্ত সংকীর্ণতা টেনে এনেছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক প্রাচীন সমাজব্যবস্থার ভিত্তি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে—সে-যুগের সেই ধর্মের সাধনা আমাদের বৃহত্তর সত্তার আধ্যাত্মিক মৃত্যুর দিনে আজ আর আমাদের কোনো কাজে লাগল না। আমাদের জীবনে দেখেছি, যতীনদা স্বাধীনতার ও ধর্মের সাধনার সঙ্গে মানুষের প্রতি আকর্ষণকে সুস্থ, সবল রাখতেই উৎসাহ দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে, এর ফলে, সহকর্মীদের নিয়ে এক-একটা যেন পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, স্বার্থের গণ্ডি প্রসারিত হয়েছে, সংকীর্ণতা লজ্জা পেয়েছে। এটা ছিল আমাদের অনেকের জীবনে যেন একটা third line of defence এবং এই তিন লাইনে মেশামেশি হয়ে আমরা অনেকে সাধারণ সমাজে হয়ে পড়েছিলাম কতকটা বেখাপ্পা।

আজ নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি, প্রবৃত্তিই আলাদা হয়ে গড়ে উঠেছে। বন্ধুরা যাতে রস পান, আমি তাতে পাইনে। অথচ তাঁরা সেই রস উপভোগে

সত্তত যত্নবান বলে যে তাঁদের প্রতি একটা অবজ্ঞা বা করুণা জাগে, তাও নয়। বরং তাঁদের আনন্দ দেখে হাসি। ভেবে দেখি, সমাজের অধিকাংশ লোকের প্রবৃত্তি যেভাবে গড়ে উঠেছে বা ওঠে, তাতে অধিকাংশকে অপরাধী মনে করবার তো অর্থ হয় না। মানব-মনের অভিব্যক্তির এ একটা স্তর মাত্র।

ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববার অবসর প্রচুর। কি করব? আলোচনা ইন্‌সিনেও হয়েছে অরুণদার সাথে, আলিপুরে হয়েছে যাদুদার সাথে।

আমরা যখন বর্মার জেলে, সেই সময়ের ভিতর বাংলার জেলে যুগান্তরে-অনুশীলনে মিলন-ব্যবস্থা অনেক দূর এগিয়েছে। আমি যতদিন জেলের বাইরে—অন্তরীণে, মনোরঞ্জনদা তখন মুক্ত, কিন্তু কলকাতা, ২৪ পরগনা, হাওড়া ও বরিশাল—এই কয়টি জায়গায় ঢুকতে পারবেন না। তিনি থাকেন হুগলী বিদ্যামন্দিরে এবং ঐ কয়টি জায়গা ছাড়া অন্যত্র ঘুরে ফিরে মিলন-ব্যবস্থাকে রূপ দেন।

জেলে বসে মিলন-ব্যবস্থার ভিতর দু'টি কথা হয়েছে—নেতিমূলক কথা। প্রথম কথা, 'কর্মীসংঘ'কে বাঁচিয়ে রাখা হবে না। দ্বিতীয় কথা, কম্যুনিস্টদের সঙ্গে যোগ দেওয়া চলবে না।

নীতি হিসাবে কোন্‌টি ভালো, কোন্‌টি মন্দ—সেটা আলাদা কথা এবং প্রকাশ্য কথা। অপ্রকাশ্য আসল কথা যেটি—সেটি মিলনের খাতিরে চাপা রইল। প্রথমটিকে ধরে নেওয়া হল সুরেশ দাসের দল, এবং দ্বিতীয়টিকে এম. এন. রায়ের দল। দুইজনই যুগান্তরের লোক। মিলন হয় সমানে সমানে। এ দু'টিকে অপাংক্তেয় না করলে একপক্ষকে গোড়াতেই একটা শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিতে হয় যে অপর পক্ষকে সেখানে মিলতে যেতে হয় অনেকখানি মাথা নীচু ক'রে—অন্তত এই ভাবটি ছিল একপক্ষের মনে। এই মিলন-চেষ্টার ভিতর তাই দলের মোহই বড় হয়ে ফুটল, দেশের স্বাধীনতার জন্য শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা চোখের সামনে থেকে অনেকখানি সরে গেল। বিরুদ্ধ-ধর্মী দু'টি দলের এই মিলন-চেষ্টা শেষ পর্যন্ত বাংলার বিপ্লবী সাধনাকে তাই পঙ্গু করল।

এখানে কর্মীসংঘ ও কম্যুনিস্ট পার্টির উত্থানের গোড়ার কথা কিছুটা বলা অবান্তর হবে না।

১৯২৩ সালে আমাদের ধরপাকড় এবং ১৯২৪ সালে অর্ডিন্যান্স ক'রে সুভাষচন্দ্র, সত্যেন মিত্র প্রভৃতির গ্রেফতার থেকে দেশবন্ধু বুঝেছিলেন, বিপ্লবান্দোলন দমন করার কথা ইংরেজ সরকার একটা বাজে অজুহাত হিসাবে

তুলেছে, যুগান্তর দলের কর্মীরা বাংলার কংগ্রেস ও স্বরাজ্যদলের সংগঠনকে শক্তিশালী ক'রে না তুলতে পারে—এইটিই ছিল ওদের আসল মতলব। তাই ১৯২৪-২৫ সালে দেশবন্ধু বাংলা কংগ্রেসের যে কার্যকরী সমিতি গড়লেন, তাতে যুগান্তরের যত কর্মীকে সম্ভব স্থান দিলেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। একদিকে দেশপ্রিয় জে. এম. সেনগুপ্ত, অপরদিকে শরৎচন্দ্র বোস, নলিনীরঞ্জন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও তুলসীচন্দ্র গোস্বামী—এই Big Five বা 'পাঁচ চাঁই'য়ের দল। ঝগড়া শুরু হতেই গান্ধীজি দেশপ্রিয়ের মাথায় 'তিন মুকুট' (Triple Crown) পরিয়ে ঝগড়ার অবসান করতে চাইলেন—তাঁকে যুগপৎ প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট, বাংলা কাউন্সিলে কংগ্রেস দলের নেতা ও কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ক'রে দিয়ে গেলেন। কিন্তু গান্ধীজিও বাংলা ছাড়লেন, ঝগড়াও নিত্যকার বস্তু হয়ে উঠল।

এই ঝগড়ায় নেতারা বিভিন্ন দলের কর্মীদের আজ একটুকরো-কে এদিকে, কাল আর একটুকরো-কে ওদিকে টানেন—দেশেরও অনিষ্ট হয়, কর্মীদেরও সর্বনাশ হয়। আমাদের দলের প্রবীণদের মধ্যে বাইরে ছিলেন সুরেশ দাস। তিনি এই অবস্থাটার অবসানের জন্য 'কর্মীসংঘ' গড়লেন। অনুশীলন দলের লোকেরাও এতে যোগ দিলেন।

যে-দোষ জাতির চরিত্রে ঢুকেছে, তাকে এমন ক'রে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তবু সুরেন ঘোষ ও হরিকুমার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে যে বিরাট দল তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের সময় গড়ে উঠেছিল, সুরেশবাবু তাদের অনেককে বেশ কিছুদিন একত্র ক'রে চালাতে পেরেছিলেন। নেতারা তবু থাবলা মেরে এক-একজনকে মাঝে মাঝে সরিয়ে নিতেন।

ইতিমধ্যে অপর দলের যাঁরা কর্মীসংঘে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রধানদের মধ্যে একজন সংঘের অর্থ থেকে কিছু টাকা ধার নিলেন। অপর দিকে সুরেশবাবু যে দলের লোক, তার আদর্শ-নিষ্ঠা তখনও স্তিমিত হয়নি—দলের অর্থের অপব্যয় হতে দিতে সুরেশবাবু অপারগ। তিনি টাকার তাগিদ দিলেন। ফলে বিবাদ পেকে উঠল। এবং অপর দলের প্রধানটি সুরেশবাবুর নামে নালিশ পাঠালেন জেলখানায় নিজের দলের নেতাদের কাছে।

কর্মীসংঘের আসল অপরাধ এখানে।

কিন্তু বাক্ত অপরাধ অন্যত্র। কর্মীসংঘ সুরেশবাবু চালাতে চালাতে অমরদা

(চ্যাটার্জি) খালাস হয়ে এলেন। সুরেশবাবু সংঘের নেতৃত্ব তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন।

হিন্দুমহাসভা বাংলায় এই সময় কিছু প্রবল। এবং অমরদার সাথে হিন্দুমহাসভার পুরোনো লোকদের খানিকটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। অপরদিকে উপেনদা (ব্যানার্জি) অমরদার উপদেষ্টা। উপেনদা জেল থেকে বেরিয়ে 'দাদা কোম্পানী' শব্দটি চালু করলেন এবং বক্তৃতায় বিপ্লবীদের নিন্দা গাইতে লাগলেন।

মোটের উপর জেলখানায় কর্মীসংঘ সম্পর্কে নিন্দা শোনা গেল—ওটা হিন্দুমহাসভা-ঘেঁষা এবং বিপ্লবীদের শত্রু। আমি বর্মা থেকে আলিপুরে এসে দেখলাম, যাদুদা এটা মেনে নিয়েছেন; এবং সিদ্ধান্ত হয়েছে, কর্মীসংঘের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা হবে না। অপর দলের রবিবাবু (রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত) এই মতের উগ্র প্রচারক এবং আলিপুরে যাদুদার পরামর্শদাতা, যেমন ছিলেন মেদিনীপুরে মনোরঞ্জনদার।

যাদুদা এবং মনোরঞ্জনদা দু'জনেরই তখন ধারণা, মিলনের জন্য no sacrifice is too great.

এর পর কম্যুনিস্ট দল পত্তনের কথা।

বোধহয় ১৯২২ সালের গোড়ায়, জার্মানী থেকে এম. এন. রায় এক ব্যক্তিকে পাঠান এখানে—তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে, অথবা তা সম্ভব না হলে, অন্য যে কোনো উপায়ে এদেশে একটি কৃষক-শ্রমিকের বিপ্লবী দল গড়তে এই ব্যক্তি বোম্বেতে পুরোনো পরিচিত এক বাঙালী বন্ধুর মারফত কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে কলকাতায় আসেন, কিন্তু এখানে এম. এন. রায়ের পুরোনো বন্ধুরা এই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে রাজী হননি—একথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আমি তখন কুন্তল ও চারুকে নিয়ে যশিডিতে। কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছি। সাতুদা (সাতকড়ি ব্যানার্জি) বললেন, এত বছর বাদে নরেন (এম. এন. রায়) এত বিপদ-আপদের ভিতর একজন লোক পাঠাল, তার সঙ্গে কেউ দেখাও করবে না? যাদুদার অনুমোদন নিয়ে আমি ডাঃ টি. এন. রায়ের বাড়িতে এই লোকটির সঙ্গে দেখা করি।

ডাঃ টি. এন. রায় ও ডাঃ এস. সি. সেনগুপ্ত (দন্ত চিকিৎসক) তখন এক বাড়িতেই থাকতেন। ওঁদের সামনেই প্রথম কথা হল। লোকটি তো চাল দিতে শুরু করল। বলে, এম. এন. রায় কে? কে তাকে চেনে? লেনিনের কাছে যাতায়াত আমারই ইত্যাদি।

বুঝলাম, ধাপ্পা। ধমক দিয়ে বলি, আপনি কে মশাই ? আপনার credentials কি ? কে আপনাকে চেনে ?

বলে উঠে আসছি —বাইরে এসে হাত ধরল : কিছু মনে করবেন না—রায়ই আমায় এইরকম বলতে বলেছে।

এর পর অনেক কথাই হল। দেখলাম, যতদিন যাদুদা প্রভৃতি কেউ ওর সঙ্গে দেখা করেননি, ততদিন সে চুপ ক'রে বসে থাকে নি—মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পুরোনো দলের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেকের সঙ্গে আলাপ করেছে।

আমার সঙ্গে যাঁদের সে আলাপ করিয়ে দিল, তার মধ্যে প্রধান মজফর আহমেদ। আলাপ ক'রে ভাল লাগল—শান্ত মানুষ, একনিষ্ঠায় পুরোনো বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে তুলনীয়।

ব্যবস্থা হল, তাঁর কাছেই চিঠিপত্র আসবে, তিনি যেসব ঠিকানা দিয়েছেন, সেইসব ঠিকানাতেই কাগজপত্র আসবে। আমার কোনো চিঠি দিতে হলে তাঁর কাছেই দেব এবং তিনিও কোনো চিঠি দিতে হলে আমায় দেখিয়ে দেবেন, অথবা আমার সঙ্গে আলোচনা ক'রে লিখবেন। অর্থাৎ, প্রকারান্তরে তিনি হলেন আমাদের একটি ডাকবাক্স।

যাদুদা এই ব্যবস্থা সমর্থন করলেন। মজফর আহমেদ এই ব্যবস্থার কখনও অন্যথা করেন নি।

মজফরের সঙ্গে এই ব্যবস্থা হয়ে যাবার পরই এম. এন. রায়ের লোকটি (এখন থেকে এর নাম বলব 'কুমার'—কারণ, এম. এন. রায়ের চিঠিতে এর সম্বন্ধে 'কুমার' বলেই উল্লেখ থাকত) ইউরোপ চলে যায়।

শুধু যাদুদা নন, আমাদের ভিতর তখন যাঁরা কলকাতায় সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন—অমর চ্যাটার্জি, উপেন ব্যানার্জি, সতীশ চক্রবর্তী, সাতকড়ি ব্যানার্জি, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপতি মজুমদার, অতুল ঘোষ, অরুণ গুহ, জীবন চ্যাটার্জি, কুন্তল চক্রবর্তী, চারু ঘোষ—সবাই ক্রমে এম. এন. রায়ের সঙ্গে এই যোগাযোগের কথা জানলেন এবং অনেকে মজফর ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। এম. এন. রায়ের চিঠিতে অনেক সময় অমরদার নাম অনুযায়ী আমাদের উল্লেখ থাকত চ্যাটার্জি এণ্ড কোং বলে। ভূপতিদার সঙ্গেও এম. এন. রায়ের পাড়াগেঁয়ে সংস্কৃত ভাষাতে চিঠিপত্র বিনিময় হতো। সব চিঠিই অবশ্য যেত মজফরের মারফতেই।

কুমার ফিরে যাবার কিছুদিনের মধ্যেই মজফ্‌ফর কলেজ স্ট্রীটে এক অফিস খুলে কাজী নজরুল ইসলামকে সেখানে বসালেন। কাজী 'ধুমকেতু' বের করলেন। কী তখন উদ্দীপনা! দু'চার সংখ্যাতেই শহর গরম হয়ে উঠল।

আমাদের আড্ডা জমে ওখানে। শিশুর মতো চরিত্র কাজীর। হৈ-হল্লার অন্ত নেই। আমি তখন রুগ্ন চারুকে নিয়ে থাকি শ্যামবাজারে। এক-একখানা কাগজ বের হতেই এনে রোগীকে একটানা পড়ে শোনাই। কাজী অনেক সন্ধ্যায় অত পথ হারমোনিয়াম ঘাড়ে ক'রে আসেন রোগীকে গান শোনাতে।

কাগজ বের হবার অল্পদিন বাদেই ভূপতিদা প্রায় যেচে কাগজ চালাবার অনেকখানি ভার নিলেন। কাজী ধরা পড়তে যশোরের পুরোনো কর্মী অমরেশদাকে (কান্তিলাল) এনে জোটালেন ভূপতিদাই। অমরেশদা ছিলেন যতীনদার (মুখার্জি) ও যশোরের বিজয়দার (রায়) সহকর্মী।

কুমার ফিরে যাবার কিছুদিন বাদে তারই মতো গোপনে এসে পৌঁছাল অবনী মুখার্জি। সে বলে, ইণ্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি সে ; এম. এন. রায় ধাপ্পাবাজ। আমাদেরই এক বন্ধুর বাড়িতে উঠেছে—জার্মানীতে তাঁর সঙ্গে আলাপ। বন্ধুটি ইন্দো-জার্মান ট্রেডিং কোম্পানীর যতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। তিনি মনোরঞ্জনদাকে খবর দেন। মনোরঞ্জনদা ভূপতিদাকে সঙ্গে নিয়ে যান। ভূপতিদা অবনীকে সিঙ্গাপুরে বন্দী থাকা কাল থেকেই ভালোভাবে চেনেন। সব কথা স্বীকার করার ফলে সেখানে parole-এ বাইরে রাখে। সেই সুযোগে এক হাঙ্গেরিয়ানের সঙ্গে পালায়। মনোরঞ্জনদা, ভূপতিদা চেষ্টা করেন ওকে আবার দেশ থেকে বের ক'রে দিতে। ও যাবে না। ইতিমধ্যে ক্যালিনিনের (অথবা ক্যামেনেফের ?) এক চিঠি এল। তার মর্ম এই—মুখার্জি বলে একটি লোক নিজেকে ইণ্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি বলে এবং মিঃ এবং মিসেস রায়ের বিরুদ্ধে ভারতে প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে। এ লোকটি কেউ নয়, এম. এন. রায়ই ইণ্টারন্যাশনালের পক্ষে কাজ করছেন।

যাবার পাথেয় পর্যন্ত নিয়েও লোকটি যাবে না। শেষ পর্যন্ত ভূপতিদার সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি। কিন্তু আমাদের দেশে দলের অন্ত নেই। আমাদের আশ্রয় থেকে যখন সে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হল, অপর একটি দল তাকে লুফে নিল।

ভূপতিদা ছাড়া আর যাঁরা এই সময় বাংলায় কম্যুনিজমের প্রচারে কিছু অংশ নেন, তার ভিতর উপেনদার নাম উল্লেখযোগ্য। জার্মানী থেকে এম. এন. রায়ের কাগজ আসত ভ্যানগার্ড। এর ভাবগুলো উপেনদা 'আত্মশক্তি'র মারফত তো

প্রচার করতেনই—অমৃতবাজারেও তখন তিনি সহকারী সম্পাদক, তারও সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ঐ কথাগুলোই একটু অদল-বদল ক'রে চালাতেন। 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'র কর্তৃপক্ষ হুঁশিয়ার। উপেনদাকে ওখান থেকে সরতে হল। উপেনদাও হুঁশিয়ার কম নন। বের হবার বেলায় সাথে নিয়ে বের হলেন মৃণালকান্তি বোসকে ও কিশোরীলাল সরকারকে। তখন দেশবন্ধু *Forward* বের করবার সংকল্প করছেন। একরকম স্থির হয়ে রইল, এঁরা সেই কাগজে যোগ দেবেন।

কম্যুনিজমকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন আমাদের ভিতর জীবন। এই গ্রহণের ভিতর এম. এন. রায়ের প্রতি ব্যক্তিগত টানও যেমন ছিল, থিওরিটাকে বুঝবার চেষ্টাও তেমনি ছিল। কি ক'রে দেশে বিপ্লব জাগানো যায়, আমাদের সমস্ত বিপ্লবী জীবন ধরে সেই পথই খুঁজেছি। কাজেই কোনো নতুন আইডিয়াকে বর্জন করার চেষ্টা আমাদের দিক থেকে কখনও হয়নি। কিন্তু ঢাকা থেকে জিতেন কুশারি নালিশ জানালেন, জীবন গোপনে ছেলেদের *Vanguard* ও *International Press Correspondence* পড়ান। আমি তখন পূর্ববঙ্গ সফরে যাচ্ছি। মনোরঞ্জনদা এই নালিশ সম্পর্কে আমায় অনুসন্ধান করতে বললেন। নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদের প্রতি অনুরক্তি ছাড়া জিতেনবাবুর নালিশের যুক্তিসহ কোনো ভিত্তি খুঁজে পেলাম না। যাদুদাকে, মনোরঞ্জনদাকে তা-ই জানিয়ে দিলাম।

ইতিমধ্যে ইন্টারন্যাশনালের এক মিটিং-এর তারিখ আসছে। এম. এন. রায় লিখলেন, লেনিন ভারতের বিপ্লব আন্দোলনকে সাহায্য করবার বিরোধী—কারণ, এ-আন্দোলন শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন নয়। এম. এন. রায় তাঁর দিকে হয়ে ভারতের আন্দোলনকে সাহায্য করার প্রস্তাব সমর্থন করতে পারে এমন দু'জন ডেলিগেট পাঠাতে বললেন। সময়মতো কাউকে পাঠানো সম্ভব হবে মনে হল না। তখন দলের তরফ থেকে এক থিসিস পাঠানো হল। সে থিসিসের মর্মকথা এই: ভারতের মতো সস্তা কাঁচামালের এবং জীবিকার নিম্নমানের কোটি কোটি লোকের দেশ যদি ব্রিটেনের মতো ক্যাপিট্যালিস্ট দেশের অধীনে থাকে, তা হলে শ্রমিক-কৃষকের সোভিয়েট দেশেরই টিকে থাকা শক্ত। সেই হিসেবেও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাহায্য করা উচিত। এবং ভারতের গণ-আন্দোলনও অনতিবিলম্বে কৃষক-শ্রমিকের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে উঠতে বাধ্য।

ইতিমধ্যে কুমার আর একবার এদেশে আসে ও ধরা প'ড়ে Regulation III-তে বন্দী হয়। মজফর আহমেদও ধরা পড়ে যান। আমি থিসিসটি সুভাষচন্দ্রকে দেখাই। তিনি উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এবং তিনিই এটা গোপনে রায়কে পাঠাবার ভার নেন।

এর কিছুদিনের মধ্যেই আমরা সবাই ৩নং রেগুলেশনে বন্দী হই। পরে জেনেছিলাম, রায় এ-থিসিস কাজে লাগিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবগুলি হয় কতকটা যেন বিপরীতমুখী। আর, লেনিন সেইসব প্রস্তাবের যে সংশোধনী প্রস্তাব পাশ করেন তা পুরোপুরি আমাদের থিসিসের সমর্থক। রায়ের লক্ষ্য কি ছিল পরে জিজ্ঞাসা করিনি।

এরপর কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার বিচার অন্তে মজফর প্রভৃতি খালাস হয়ে যখন Workers' and Peasants' Party ক'রে দাঁড়ান, তখনও আমরা জেলে।

জেলখানায় যুগান্তর অনুশীলনে মিলনের বেলায় স্থির হল—এ পার্টির সঙ্গেও আমরা যোগ রাখব না। মিলন না হলেও যোগ রাখতামকিনা সঠিক বলতে পারিনে। তবে আমরা যখন ১৯২৩ সালে জেলে গেছি, তখনও লেনিন জীবিত। কম্যুনিস্ট পার্টির strategy ও tactics সব পরে যা দেখেছি, তখন পর্যন্ত সে সব অজ্ঞাত। আমরা কিন্তু মিলনের খাতিরে জেল থেকে বেরিয়ে এসে মজফরদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কও প্রায় রাখিনি। অবশ্য, ইতিমধ্যে Workers' and Peasants' Party-র সঙ্গে এসে জুটেছিল এমন সব লোক যাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ছিল না। আবার আমরাও এই পার্টির সঙ্গে থাকলে ওসব লোক বেশীদিন থাকতে পারত কিনা সন্দেহ।

অপর দিকে, আমাদের কাছ থেকে তাড়া খাবার পর অবনী জুটলো অনুশীলনের সঙ্গে, এবং বীর অবনীতে পরিণত হল। কুমারও জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ওঁদের সঙ্গে জুটেছিল এবং দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে ওঁদের নেতৃস্থানীয় একজনের হত্যার চেষ্টা প্রভৃতি অনেক অনর্থ ঘটিয়ে ওঁদের নেতৃবর্গের বিরাগ-ভাজন হয়েছিল। কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমরা যোগ রাখতে পারব না—মিলনের শর্তের মধ্যে এই নিষেধ-বাণীর সমুহ কারণ এইটি।

কম্যুনিজম সম্পর্কে আমাদের অনেকের ভিতর এবং অনুশীলনের নেতৃস্থানীয় প্রত্যেকের ভিতর এমন একটা বিরুদ্ধতা ছিল যে, জিনিসটাকে বুঝবার চেষ্টাও কম হয়েছে—বোলশেভিক বিপ্লবের পর থেকে ক্যাপিটালিস্ট ও ইম্পিরিয়া-

লিস্টদের সংবাদ-সরবরাহকারীদের মারফত যা প্রচার হয়েছে, তাকেই এঁরা এ-সম্পর্কে প্রায় শেষ কথা বলে ধরে নিয়েছিলেন।

ভূপতিদার ব্যাপারটা কিন্তু অদ্ভুত। এই সময়ে মনোরঞ্জনদার কম্যুনিজম-বিরোধিতার জন্য ভূপতিদার তাঁর প্রতি যে মনোভাবটা প্রায়শ দেখা যেত, তাকে বলা চলে ক্ষিপ্ত। অথচ, আসলে কমুনিজম-বিরোধিতাটাও তাঁর ভিতর প্রায় ক্ষিপ্ত ধরনেরই (rabid)। এই পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় একমাত্র এম. এন. রায়ের প্রতি একটা ব্যক্তিগত টানের ভিতর। যাই হোক, কম্যুনিজম সম্পর্কে আমাদের প্রধানদের বিরোধিতা যখন অনস্বীকার্য, তখন অনুশীলনের দাবি সহজেই মেনে নেওয়া হল। আমরা এ-দলের সংস্রব ত্যাগ করলাম।

এই তো গেল নেতির দিক। ইতির দিক নিয়ে কালিম্পং-এর অবাধ অবসরে ভাবি। সেপ্টেম্বরের মেঘলা দিনগুলো কেটে গেল। অক্টোবরের গোড়ার দিকে ভোরের বেড়ানো সেরে একদিন এসে পড়তে বসেছি—বাড়িওয়ালা চেমজং বললেন, আজ যান—কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাবেন। সমস্ত উত্তর আকাশকে ঘিরে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোট বড় অগণিত স্তম্ভবিশিষ্ট রুপোর এক দেয়াল, চেয়ে চেয়ে আর চোখ ফেরে না—যেমন দিনের মৃদু রোদে তেমনি রাতের স্ফুট জোৎস্নায় সঙ্গী-সাথী যদি কখনও থাকেও, আপন মনে আনমনা হয়ে যেতে আটকায় না।

আমাদের জীবনে এ যেন পুরোনো সংস্কারকে ছেড়ে এক নতুন জীবনের পত্তন। অসহযোগের দিনে গণ-আন্দোলনের এমন রূপ দেখিনি যাতে ইংরেজের কামানগোলাকে তুচ্ছ ক'রে দেশকে স্বাধীন করতে পারে। গান্ধীজি যে দেশকে ধাপে ধাপে তৈরি করছেন, সেটা তখনও স্পষ্ট হয়নি। কাজেই দেশের সাধারণ লোককে ইংরেজ-বিমুখী করবার ভার গান্ধীজি ও কংগ্রেসের উপর রেখে আমরা অস্ত্রের শক্তিকে দাঁড় করাবার কল্পনা নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এই কল্পনা মাথায় নিয়েই ধরা পড়ি ১৯২৩ সালে।

গণ-শক্তিকে কাজে লাগাবার যে প্রোগ্রাম এম. এন. রায় দিচ্ছেন, তাতেই বা আমরা কতটা এগুতে পারব? গণ-আন্দোলনের ধারা ধরে তখনও আমরা চিন্তা করতে তেমন অভ্যস্ত হইনি। তার উপর, তখন পর্যন্ত আমাদের দেশের কৃষককে আমরা যা জানি, তারা জীবনের সর্ব ব্যাপারে উদাসীন—দুঃখ-দৈন্যে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, অদৃষ্ট ছাড়া নিজের চেষ্টার যে কোনো স্থান আছে, একথা

কোন্ যুগে ওরা ভাবতে পারবে, তা আমাদের কল্পনায় আসে না। আর শ্রমিক কয়জন আমাদের দেশে ?—দু'চারটে জায়গায় যারা আছে, সংগ্রাম হয়তো তারা করতে পারে নিজেদের মাইনে বাড়াবার জন্যে। সে সংগ্রামে একটা ব্যাপক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কত যুগে আসতে পারে, তা আমরা তখনও ভেবে উঠতে পারিনে। বরং মনে হয়, ব্যাপক গণ-জাগরণে বাধাই সৃষ্টি করতে পারে এই মাইনে বাড়ানোর আন্দোলন—যাকে লেনিন 'ইকনমিজম্' আখ্যা দিয়েছেন। এতে জাতির সংঘশক্তি ক্রমে টুকরো টুকরো হবে।

তাছাড়া, মধ্যবিত্ত কর্মীও তখন পর্যন্ত আমাদের দেশে মুষ্টিমেয়। কংগ্রেস আন্দোলনে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের ভিতর দু'পাঁচজন ছাড়া আর সবাই সহজের সাধক। ইন্‌সিনে ও আলিপুরে আলোচনায় আমাদের যে সিদ্ধান্ত হয়, তাতে বুঝি, অসহযোগ আন্দোলনের মতো আরও একটা আন্দোলন আগামী দিনে আসছে—যার ভিতর আমাদের কাজ হবে মধ্যবিত্তেরই একটা বিরাটতর মরিয়া ধরনের কর্মীশ্রেণী গড়ে তোলা। সে কাজ আমরা কংগ্রেসের ভিতর থেকেই করতে পারি। এবং এরও পরের স্তরে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রশস্ততম ভিত্ গড়ে উঠবে, কৃষক-শ্রমিককে কংগ্রেসের ভিতরই আমরা পাব—মরিয়া ধরনের কর্মীশ্রেণীর বিরাটতর দল কৃষক-শ্রমিককেও মরিয়া ক'রে তুলবে। সেই দিনই আসবে ইংরেজের সামরিক শক্তির সঙ্গে আমাদের গণ-শক্তির সত্যিকারের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন।

আগের বারেও জেল থেকে বেরিয়েছি একটা ভাঙা-গড়ার মুখে। তখনও ভবিষ্যতের পন্থা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করতেগিয়ে চোখের সামনে দেখেছি, গান্ধীজি ইংরেজের সাথে অসহযোগের জন্যে দেশকে উত্তেজিত মথিত করে তুলছেন। দেশেরই সাধারণ উত্তেজনা থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছেন, অথবা সেই উত্তেজনার সুযোগে দাঁড়িয়েছেন।

এবারেও অন্তরীণে বসে দেখছি, দেশময় একটা যুব-আন্দোলনের সূচনা দেখা দিচ্ছে। এর ভিতর ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে সদ্য রুশিয়া-প্রত্যাগত জওহরলালের এবং সদ্য জেল থেকে মুক্ত সুভাষচন্দ্রের প্রেরণা। এঁরাও প্রেরণা সংগ্রহ করছেন দেশের একটা অশান্ত উত্তেজনা থেকে।

আমরা ভাবছি, একে আরও উন্মত্ত ক'রে তোলা যায় কি ক'রে ? দেখছি আর ভাবছি, ভাবছি আর দেখছি। এই করেই অন্তরীণের দিনগুলো আমার কাটছে।

এ ছাড়া কালিম্পং-এর জীবন প্রায় ঘটনাবৈচিত্র্যহীন। ওখানে পৌছাতেই শুনি, ওখানে আগে থেকেই একজন মস্ত বড় বিপ্লবী রয়েছে। ইংরেজী ধরনে, নাম কেউ বলতে পারে না, বলে 'সরকার'। একটু অনুসন্ধানে নাম সংগ্রহ করতেই বুঝলাম, এ ১৯১৫ সালের এক বিখ্যাত স্বদেশী মামলার এক কুখ্যাত রাজসাক্ষী। ও যে একজন ডাগড়াগোছের বিপ্লবী, ওর নিজের মুখের দেওয়া সেই পরিচয় ওখানকার বাঙালীদের মুখে মুখে শুনি। কাউকে কিছু বলিনে।

কোর্টে সাক্ষী দেবার পর দূরে এক নিভৃত পাহাড়ে ইংরেজ সরকার ওকে কিছু জমি দেয়। সেখানে চাষবাস করে, এক পাহাড়ী মেয়েকে বিয়ে করে। আট-নয় বছর এইভাবে কাটে—সেই স্ত্রীটির মৃত্যুর পর ইংরেজ সরকার এক রায়বাহাদুরের ব্যবসায়ে চাকরি দিয়ে ওকে শহরে এনেছে। দেশে এসে আবার এক বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করেছে। এরকম ছেলেকে বিয়ে করবারও আমাদের দেশে মেয়ের অভাব হয় না!

প্রবৃত্তি যায়নি—কালিম্পং শহরে কে কে আমার সঙ্গে মেশে, খবরটি ওখানকার সার্কেল্ ইনস্পেক্টরকে পৌছে দেয়। আমি বুঝি—অন্যে টের পায় না।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত আমি বাইরে থাকতে পারি। সেটা বোধ হয় হবে নভেম্বর মাস। ও-অঞ্চলে তার ভিতরেই যেন বেশ রাত হয়ে যায়। ওখানকার লাইব্রেরী থেকে বের হচ্ছি, সামনেই সার্কেল ইনস্পেক্টর।

বলে, 'আপনি এতক্ষণ পর্যন্ত বাইরে থাকতে পারেন?'

'পারি কিনা ঘড়ি খুলে দেখুন গিয়ে।'

'আপনি লাইব্রেরীতে আসতে পারেন?'

'কোন্ আইনে আটকায়?'

'Don't carry your duty too far'—বলে একটা ধমক দিয়ে চলে এলাম।

এরপর ও লাগল আমার পেছনে।

একদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বাড়ির দিকে যাচ্ছি, ঐ বিপ্লবীটি এসে প্রথম পরিচয় করল, সঙ্গের ভদ্রলোকও পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর বিপ্লবী হাতজোড় ক'রে বলে, কাল আমার ছেলের অন্নপ্রাশন, আমার বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দেবেন।

বলি, মাপ করবেন। আপনাকে আমি জানি। আপনি যাঁদের সর্বনাশ ক'রে এসেছেন, তাঁদের আমি ব্যক্তিগতভাবে না জানলেও, তাঁরা আমার সহযাত্রী,

আমরা এক পরিবারের লোক। আপনি তাঁদের আন্দামানে পাঠিয়ে এসেছেন, আর আজ আমি এখানে এসে আপনাকে জাতে তুলে যাব? সে আমি পারব না।

আর কথাটি না বলে, এক পা দু' পা ক'রে সরে গেল। সঙ্গের ভদ্রলোকটি তো অবাক। তারপর আমার কাছে সব শুনলেন। ওর বাড়িতে রান্নাবান্না দেখার, লোকজন খাওয়ানোর ভার ছিল এঁর উপর। ইনি আর গেলেন না।

কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। রাস্তায় ঘাটে ছেলেরা ওকে দেখতে পেলে চেঁচাত, 'মীরজাফর', 'উমিচাঁদ' বলে।

সার্কেল ইনস্পেক্টর রিপোর্টের উপর রিপোর্ট পাঠাতে লাগল আমার নামে।

কমলা লেবু পেকে উঠেছে। রোজ তিনচারজন সঙ্গীসাথী নিয়ে সার্কেল ইনস্পেক্টরের বাংলোর সামনে দিয়েই অনেক নীচে কমলা লেবুর বাগানে চলে যাই—সে আমার গতিবিধির জন্য নির্দিষ্ট শহরের যে অংশ, তার বাইরে বহু দূরে।

কালিম্পং-এর শীত জমে উঠেছে। আকাশের চেহারা, পাহাড়ের রং, পাহাড়ের খাতে খাতে জমা পুঞ্জীকৃত মেঘের অপরূপ রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বন্ধু মণি ফটোগ্রাফার। ভোর পাঁচটা বাজতে না বাজতে ওভারকোট চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ওখানকার উঁচু উঁচু শিখরে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষে প্রথম সূর্যের আলো পড়বার প্রতীক্ষায় অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। বার বার মুখে আসে সেই কথা, 'আহা, কি দেখিলাম? জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।' একটু রোদ উঠতে মেঘ, বন, পাহাড়—সবের ফটো নিতে নিতে ফিরি।

কমলালেবু খেতে যেমন স্বাদের দিক দিয়ে, দৃশ্য দেখতে তেমনি সময়ের দিক দিয়ে আইন ভাঙি।

তিস্তা যেখানে নেমেছে, একদিন কানু আর ননীকে নিয়ে সেখানের উদ্দেশে যাই। গিয়ে পাহাড়ে পথ হারিয়ে ফেলি। সমস্ত দিন ধরে সে যে কি ঘোরাঘুরি আর পথ খোঁজা! কোথাও পাশের জঙ্গলেই বাঘের ডাক শুনছি, গায়ের গন্ধ পাচ্ছি, কোথাও বহু উপর থেকে গাছের শিকড় ধরে ধরে নদীগর্ভে নামছি, আর উপর থেকে বালুর উপর দিয়ে পাথর নেমে আসছে। একবার তো ননী উপরে দাঁড়িয়ে ভয়ে শুষ্ক মুখে দেখছে আর ভাবছে এইবারে হয় আমি প্রকাণ্ড এক পাথরের নীচে গুঁড়ো হয়ে যাব, নয়তো ওর চাপে গাছের শিকড় থেকে আমার হাত খসে যাবে, আর হাজার দুই ফুট নীচে পড়ে শেষ হয়ে যাব। সে সব

কিছুই হল না, ডান হাতে শিকড় ধরেই, বাঁ হাত তার তলায় দিয়ে ধাক্কা দিতে বুকের উপর দিয়েই গেল বটে, কিন্তু আমায় পিষে দিয়ে গেল না। অবশেষে নদীর ওপারে উঠে অনেক উপরে ধানের ক্ষেতে এক কৃষককে আবিষ্কার করা গেল। তাকে কিছু পয়সা দিয়ে কালিম্পং-এ ফিরবার পথ পাওয়া গেল। জীবনে এমন ক্লান্ত কখনও হইনি। থানায় হাজিরের সময় পেরিয়ে গিয়ে প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে, ধুলোবালি মাখা মাথা আর জামাকাপড় নিয়ে সার্কেল ইনস্পেক্টরের বাড়ির সামনে দিয়েই বাসায় পৌঁছালাম।

লোম্যান ওদিকে রিপোর্ট পেয়ে পেয়ে আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না। অবশেষে এক ডেমি-অফিসিয়াল পত্র দিল দার্জিলিং-এর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে: এইসব লোকের বিরুদ্ধে এইসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মামলা করা সরকারী নীতি নয়—বিশেষত এসব ব্যাপারের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বলেও আমাদের কোনো রিপোর্ট নেই। অন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

অন্য ব্যবস্থা ওরা যা করল, তার আগে একটু কাজ হয়ে গেল। আমার বাড়ি-ওয়ালার স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি গভীর। তিনি রাত্রে রাত্রে এসে পরামর্শ করেন। নেপালের কোনো সংবাদপত্র নেই, এবং কোন্ হরফে সংবাদপত্র চলতে পারে—সে-ও একটা সমস্যা। অথচ সংবাদপত্র না হলে দেশে স্বজাতিপ্রীতিও জাগানো যাবে না—নেপালীরা বিশ টাকা মাইনেয় চিরকাল ইংরেজের নোক্রি ক'রে ভারতবর্ষের আর অন্যান্য দেশের স্বাধীনতার শত্রুতা ক'রে বেড়াবে। এই আলোচনায় গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে ওখানকার একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীও যোগ দেন। দেরাদুনের *Himalayan Review* পত্রিকার সম্পাদক, তখনকার দিনের নেপালী নেতা ঠাকুর চন্দন সিং-এর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন ডাঃ কিচ্‌লু ১৯২৩ সালে। তাঁকেও আনাবার ব্যবস্থা হল। এবং হিন্দি হরফেই কাগজ বের হবে স্থির হল। চেমজং কলকাতায় এলেন মনোমোহন ভট্টাচার্যের নামে আমার চিঠি নিয়ে—প্রেসের মেসিন এবং টাইপ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

লোম্যান অন্য ব্যবস্থা করল—হুকুম হল আমার বাড়িতে অন্তরীণের।

এটা ১৯২৮ সালের গোড়ার কথা। যশোর শহরে দেখা হল অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রাঘবেন্দ্র ব্যানার্জির সঙ্গে। রাত্রের বেলায় ডেকে পাঠিয়ে আই. বি অফিসারকে বাইরে বসিয়ে রেখে ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে আলাপ

করলেন। আমি যখন কলেজে পড়ি ইনি তখন নামকরা ছাত্র-নেতা। আর এখন বিদেশী সরকারের পুলিশ কর্মচারী!

আভাসে কথাটার উল্লেখ করতেই বলেন, শীঘ্রই বিলেত যাচ্ছি ব্যারিস্টারি দিতে। তারপরই এ-চাকরি ছেড়ে দেব।

সব সরকারী কর্মচারীর মতোই কথা, এবং সব সরকারী কর্মচারীর মতোই চাকরি ইনি ছাড়েন নি—বিলেতও গিয়েছিলেন, ব্যারিস্টারিও পাশ করেছিলেন।

জীবনে বাড়িতে অল্পই থেকেছি। যখনই থেকেছি, গ্রামের ছেলেরা প্রায় দিনরাত আমাদের বাড়িতেই কাটায়। তাদের কাছে গ্রামের অবস্থা সব শুনি।

গ্রামের মাঝখান দিয়ে একটা পথ—নদীর ঘাট পর্যন্ত গেছে। বর্ষার দিনে সে পথ প্রায় অগম্য, কাদা তো আছেই, কোথাও কোথাও হাঁটুর উপর অবধি জল। মেয়েদের সেই পথেই জল আনতে যেতে হয়।

ঝুড়ি-কোদাল হাতে ছেলেদের দল নিয়ে মাটি কেটে রাস্তা তৈরি করতে শুরু করি। বেশ উৎসাহ। ভিন্ন গ্রাম থেকেও ছেলেরা আসে।

আবার বাধাও আসে। একটি ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন, গ্রামে এমন ভালো কাজ হতো না, যাতে বাধা সৃষ্টি করা তিনি যুক্তিযুক্ত না মনে করতেন। তার ফলে, আই. বি-র লোক ও-অঞ্চলে গেলে স্থান তাঁর বাড়িতেই। এবং সমূহ অপর ফল ফলল, গ্রামের রাস্তাটি তাঁর বাড়ির সামনেই আজও সরু রয়ে গেছে।

আরও বাধা এল অন্য দিক থেকেও। তবে কোনো বাধাই টেকে না। কারণ, সব বাড়িরই ছেলেরা আমাদের দিকে।

এই রাস্তার কাজের ফল পেলাম। আমাদের ও-অঞ্চলটা প্রায় পাণ্ডব-বর্জিত। তবু পরবর্তী যুগে ওখান থেকেও কয়েকজন কর্মী রাজবন্দী হলেন।

তার চেয়েও বড় ফল ফলল অন্য দিকে অন্য ভাবে। এ-ও এক বাধারই ফল: রাস্তার কাজের পরিশ্রমের পর স্নান সেরে আমাদের বাড়িতেই হোক, অন্য বাড়িতেই হোক, প্রায় সন্ধ্যাতেই কিছু জলযোগ জুটে যায়। রাধারমণ সাহার মা একদিন লুচি তরকারি ক'রে খাওয়ালেন। আমাদের পুরোহিত-পুত্র ধীরেন চক্রবর্তী। তাঁর কাকা বলে বসলেন, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ধীরেন বলেন, এমন কিছু অপরাধ করেছি বলে তো মনে করিনে। প্রায়শ্চিত্ত কেন করতে যাব?

প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার আমাদের পাড়াগাঁ—কাকার তর্জন সমর্থন পায়।

পরামর্শের জায়গা আমারই ঘর। বলি, চুপ ক'রে থাক, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ঠাণ্ডাই হয়ে গেল। আজ আর আমাদের দেশে জল-অচল কোনো হিন্দু নেই, পুজোর ঘরে জল দেবার, ভোগ দেবার অধিকার সবার সমান। নিমন্ত্রণে আমন্ত্রণে একসঙ্গে খাওয়াই বিধি। ধীরেন আর রাধারমণ আজও কর্মী, এবং এদিকে সজাগ।

জুন মাস প্রায় শেষ হয়। খালাস হয়ে কলকাতায় এলাম।

সমাপ্ত

॥ পরিশিষ্ট ॥

নরেন শেঠ: বীডন স্ট্রীটের সুপরিচিত শেঠ বংশের। হাইকোর্টের উকিল হিসাবে সেকালে এঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। এঁদের বাড়ির প্রায় সকলেই জানতেন, এঁদের দুই ভাই—যতীন ও ফণি বিপ্লবী দলের কর্মী। যতীন শেঠ ছিলেন বিজ্ঞানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। এঁদের ভাইপোরাও অল্প বয়স থেকে অনেক কাজে সাহায্য করতেন। বিপ্লবের কাজে পরিবারের এই সহানুভূতির ফলে কলকাতার দলের নেতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ও তাঁর সহোদর অমর অনেক কর্মীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ এই বাড়িতেই করতেন। দলের কাজের জন্যে ব্যবহারের বইকাগজ রাখারও এটি ছিল একটি বড়ো আস্তানা।

অমৃতলালগুপ্ত: স্কুলের ছাত্র ছিলাম ফরিদপুরে। সেখানে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্য হিসাবে আমার বিপ্লবী জীবনের পত্তন। স্থানীয় নেতা ছিলেন ঢাকা বিক্রমপুর চুড়াইনের সুরেন দাসগুপ্ত। তিনি আমায় বিশেষ স্নেহ করতেন। ১৯১১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে যখন কলকাতায় পড়তে আসব সুরেশবাবু তখন অমৃতবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। কলকাতায় আমায় দেখাশুনো করার ভার দেন তাঁর উপর। ফরিদপুর ডুলালী গ্রামের অধিবাসী অমৃতবাবুর দাদা শ্রীশবাবু তখন শহরে একজন সুপরিচিত কবিরাজ। অমৃতবাবু ১৯১০ সাল পর্যন্ত ছিলেন বিক্রমপুর সোনারং-এ মাখনলাল সেনের প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষক। এই স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে এই সময়ে পুলিশের চক্রান্তে স্থানীয় মুসলমানদের এক দাঙ্গা হয়। স্কুলটি উঠে যায়। কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্রের দাঙ্গার অপরাধে দু'একমাস ক'রে জেল হয়। অমৃতবাবু জেল থেকে বেরিয়ে ফরিদপুরে দাদার কাছে ওঠেন। একই সময়ে আমরা দু'জন কলকাতায় আসি। তিনি মেট্রোপলিটান (বর্তমান বিদ্যাসাগর), কলেজে ভর্তি হন, আর আমি স্কটিশ চার্চ কলেজে। দু'জনই প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে। দেখা-সাক্ষাৎ আমাদের প্রায়ই হতো এবং তাঁর সঙ্গেই বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির, উদ্বোধন আফিস প্রভৃতি স্থানে যাই; রামকৃষ্ণ মিশনের ও অন্য সাধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করি। পরে ধর্মজীবনের প্রভাবে রাজনীতি ছেড়ে দিয়েও অমৃতবাবু স্নেহবশত আমার সঙ্গে মিশতেন।

হেমেনদা ও ইন্দু সরকার: ফরিদপুর জেলায় পদ্মার এক অংশের জলকরের মালিক হিসাবে সেকালের এক বিখ্যাত ধনী ব্যক্তি ছিলেন ঈশানচন্দ্র

সরকার। দানশীল বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। ফরিদপুরে এক উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর অর্থে এবং তার নাম হয় ঈশান স্কুল। তাঁরই ছেলে ইন্দু। ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি ছাত্রজীবনে বেশ বড় এক দল করেন। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ তুলে ধরতেন তিনি ছেলেদের সামনে। চাঁদপুরের হেমেন্দ্র ঘোষ ও ইন্দু এই দলেরই লোক। অভয়াশ্রমের ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, ডঃ নৃপেন বোস, অন্নদা চৌধুরী, সুভাষ বোস (পরে নেতাজী), কৃষ্ণনগরের হেমন্ত সরকার, কটকের বিধু রায় (পরে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের কায়রা প্রফেসর), শশাঙ্ক মুখার্জি (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) প্রমুখের জীবন এই দলেই শুরু। আমি যখন পরে দৌলতপুর কলেজে পড়ি, সুরেশদা তখন ঐ কলেজে দল গড়তে চেষ্টা করেন, সেই চেষ্টায় মাঝে মাঝে ওখানে যেতেন এবং এঁদের কাউকে কাউকে সঙ্গে নিতেন বা পাঠাতেন। এইভাবে হেমেনদা এবং এঁদের আরও অনেকের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা। পরে আমি কলকাতায় যখন বি. এ পড়ি তখন হেমেনদাই প্রথম আমার কাছে কথা তোলেন তাঁদের দলের আদর্শ সম্পর্কে। হেমেনদার ছিল এক যুক্তিপ্রবণ মন। তাঁদের দলের কোনো positive ideal বা সক্রিয় আদর্শ খুঁজে না পেয়ে নিরাশ হন। সুরেশদা এবং দলের অন্যদের সঙ্গেও আলোচনা করেন। খুশি হতে পারেননি। অসন্তোষ ক্রমে সংক্রামক হয়ে ওঠে।

প্রায় এই সময়েই জার্মানীর সাহায্য নিয়ে যতীন মুখার্জি বিপ্লবায়োজন করছেন, এই ধরনের একটা কথা কলকাতার ছাত্রমহলে কানাঘুষো চলতে থাকে। যতীনদার সংস্পর্শে আসি আমি দৌলতপুরে। ঢাকা অনুশীলন দলের সঙ্গে ফরিদপুরে ও কলকাতায় যখন মিশি, ওঁদের কার্যধারা দেখে ক্রমে আদর্শের দ্বন্দ্বে মন অতৃপ্তিতে ভরে ওঠে। ফলে, নিজের মতো ক'রে দল গড়ব, এই সংকল্প নিয়ে দৌলতপুরে যাই। এই দলের খবর পেয়ে কিছুদিনের ভিতর যতীনদা দৌলতপুরে আসা-যাওয়া শুরু করেন। আলাপে মনের অতৃপ্তি কেটে যায়, আমার জীবনের পরিপূর্ণ উদ্যম ফুটে ওঠে। তখনও জানিনে যে দেশে বিভিন্ন দল আছে। ধারণা ছিল, বিপ্লবী দল একটাই, যতীনদা সেই দলেরই নেতা বা নেতৃস্থানীয়।

১৯১৫ সালে যখন কলকাতায় পড়ছি যতীনদা তখন পলাতক। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে সুরেশদার দলের বন্ধুদের দু'একজন জানতেন। এবং এঁদের প্রায় ১৫।১৬ জন একযোগে দল ছেড়ে আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন, এই সিদ্ধান্ত একদিন প্রায় নাটকীয়ভাবে আমায় জানিয়ে দেন। সুভাষ এর

পর ওটেন-প্রহারের অভিযোগে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে কটক চলে যান। বিপ্লব-চেষ্টার কাজে হেমেনদা ও শশাঙ্ক ছাড়া আর প্রায় কেউ সক্রিয় অংশ নেবার সুযোগ পাননি। এঁরা দু'জন ১৯১৭ সালে ধরা পড়ে অন্তরীণ হন। মুক্ত হয়ে এসে এম.বি পাশ ক'রে হেমেনদা উচ্চশিক্ষার জন্যে ফ্রান্সে যান। আর শশাঙ্ক এম. এস-সি পাশ ক'রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ইন্দুর ঢাকা মেল ট্রেনের এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়।

দেবেন ঘোষ : দলে লোক সংগ্রহ করার কাজে সেযুগে সতীশ চক্রবর্তীর খ্যাতি ছিল। সতীশদা পলাতক হবার পর আমি, কুন্তল, জীবন, পুলিন মুখার্জি (ঠাকুর) প্রায়শ দেবেন ঘোষের কাছে যাওয়া-আসা করতাম। আমরা শুধু জানতাম তিনি সতীশদার লোক। সতীশদা কবে কোথায় কিভাবে বাঁকুড়ার এই একান্ত নিষ্ঠাবান ভদ্রলোককে সংগ্রহ করেছিলেন, তা আমরা কেউই কখনও জানতে পাইনি। তিনি যে বাঁকুড়ার লোক, তা আমরা পরে জেলে বসে খবরের কাগজ থেকে জানতে পাই। এরকম কর্মী বা সহযোগী আমরা আরও পেয়েছি, যাঁদের পূর্বপরিচয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দুঃখ ও কারাভোগও তাঁরা অনেকে করেছেন।

দেওয়ান সিং : রাসবিহারী বোস পাঞ্জাব বা যুক্তপ্রদেশ থেকে সংবাদ কিছু দিয়ে কোনো লোক যখন পাঠাতেন সে-লোক এসে প্রায়ই দেখা করতেন শ্রমজীবী সমবায়ে অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। খবর যা থাকত অমরদা অতুলদাকে জানাতেন। অতুলদা প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি, ঐভাবে এক পাঞ্জাবী এসে বলেন, হাওড়া গুরদোয়ারার সঙ্গে দলের যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। সতীশদা তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে এম. এ ও ল' কলেজে পড়েন। অতুলদার কথায় তিনি ঐ পাঞ্জাবীর সঙ্গে গিয়ে ঐ গুরদোয়ারার সঙ্গে পরিচিত হন। এর পর বাবা গুদিত সিংয়ের নেতৃত্বে কোমাগাটা মারু জাহাজে আমেরিকা-প্রবাসী একদল পাঞ্জাবী বিপ্লব-সৈনিক আসেন। বজবজে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে কিছু হতাহতের পর তাঁরা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েন এবং সতীশদা, সাতুদা (সাতকড়ি ব্যানার্জি) এবং আরও কারও কারও ঠিকানায় গিয়ে দেখা করেন। এই সব ঠিকানা তাঁরা পান ভাংকুবরে তারকনাথ দাস, হরনাম সিং প্রমুখ ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে। অতুলদা ও সতীশদা হাওড়ায় দেওয়ান সিংয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে ঐ সব পলাতক বিপ্লবীদের সাময়িক আশ্রয়ের ও পাঞ্জাবে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।

ননীগোপাল সেনগুপ্ত, দুর্গাচরণ বোস ও আশুতোষ ঘোষ: ননীবাবু ১৯১০-১১ সালের হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান অভিযুক্তদের ভিতর অন্যতম। এই মামলায় বিভিন্ন জায়গার অনেকগুলি গ্রুপের কর্মীরা অভিযুক্ত হন। তাঁদের ভিতর পরবর্তীকালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়) ও আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সুরেশচন্দ্র মজুমদার (পরাণ)। যতীনদা ১৯০৬ সাল থেকে যেসব গ্রুপ গড়েন, সেগুলি ছিল পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, কোনো গ্রুপের সঙ্গে কোনো গ্রুপের সাধারণভাবে পরিচয় হতো না। এই ছিল তাঁর বিকেন্দ্রিক গুপ্তসমিতি গড়ার পদ্ধতি। এক-একটি গ্রুপের নেতৃস্থানীয় দু'একজন ছাড়া আর কেউ তাঁকে জানত না। গুপ্তসমিতির আদর্শ গঠনপদ্ধতিতে গড়া হয়েছিল এই দল।

কাজের জন্য সব গ্রুপের নেতাদের যোগ ছিল কলকাতার 'ছাত্রভাণ্ডারে'র সঙ্গে। এর প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ। প্রকাশ্যত এটি একটি স্বদেশী দ্রব্য বিক্রির দোকান। পরিচালনভার হুগলীর পবিত্র দত্তের উপর। গুপ্তসমিতির কাজ চালাবার ভার দিয়ে যতীনদা এখানে বসান নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক আর ইন্দ্রনাথ নন্দীকে। এঁদের দূতের কাজ যাঁরা করতেন, তাঁদের ভিতর ছিলেন কিরণদা (মুখার্জি) ও কার্তিক দত্ত। এইভাবে নেতৃত্বের সঙ্গে সাধারণ কর্মীর বেশ কয়েক ধাপ দূরত্ব বজায় থাকত। গোপনীয়তা সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার ফলে বিদেশের সঙ্গে এবং দেশের ভিতর দেশীয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিনা বাধায় অত বছর চলতে পেরেছিল।

ঢাকা ধামরাইয়ের নিখিলবাবু সেযুগের বিপ্লবী দলে একজন বিশেষ বিদ্বান ও বিচক্ষণ লোক বলে পরিচিত ছিলেন। পরে ইনি সন্ন্যাসী হয়ে যান। নাম হয় ভবানন্দ গিরি। ইন্দ্রনাথ কর্নেল পি. নন্দীর পুত্র। এককালে আত্মোন্নতি গ্রুপে ইনি নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তেজস্বী পুরুষ। কাজ চাইতেন, এদল ওদল ভেদাভেদ করতেন না। যতীনদার বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার আসল চার্জ ছিল ফোর্ট উইলিয়ামের ভারতীয় সৈন্যদের হাত করা। এটা যে আসল চার্জ তা জানা যায় তখনকার ভাইসরয় লর্ড হার্ডিংয়ের সব নোট থেকে। এগুলি সম্প্রতি দেখতে পাওয়া গেছে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাফেজখানায়। এটাকে কিন্তু প্রধান চার্জ ক'রে মামলা করা এদেশের শাসকগোষ্ঠীর অন্যেরা পছন্দ করেনি। তাদের বোধ হয় আশঙ্কা ছিল, এ করলে দেশপ্রেমিক যুবকদের চোখ ফুটতে পারে আর ব্রিটিশ

প্রেষ্টিজেও ঘা লাগবে। তারা মামুলি ডাকাতি ইত্যাদি নানা চার্জের ভিতর এটাকে গণ্ডায় এণ্ডা দিতে চেয়েছিল। যতীন মুখার্জিকেও একটা 'হীরো' ক'রে তুলতে তারা চায়নি। প্রধান অপরাধী ক'রে দাঁড় করিয়েছে এমন একজনকে পুলিশ রিপোর্টেই যার বর্ণনা দিয়েছে দুর্বল চরিত্রের বলে। প্রধানত দলগড়ার পদ্ধতির ফলেই ষড়যন্ত্র মামলা ফেঁসে যাওয়া অনিবার্য ছিল। এবং ফেঁসে যাবার পর লর্ড হার্ডিং ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে বলেছেন, নানা চার্জে ৪৬ জনকে কাঠগড়ায় খাড়া না ক'রে ঐ 'one criminal' (যতীন মুখার্জি) আর ঐ 'one charge'-ই (দেশী সৈন্য ভাগানো) রাখলে ফল ভালো হতে পারত।

যাক সে কথা। এই যে সৈন্য ভাগাবার অভিযোগ, ওটার কৃতিত্ব ননীবাবুর শিবপুর গ্রুপের এক বিশেষ উৎসাহী কর্মী নরেন চ্যাটার্জির। ইনি এই ষড়যন্ত্র মামলার ফেরারী আসামীই থেকে যান। ফোর্ট উইলিয়ামের সৈন্যদের সাহায্যে পরে ইনি বারাণসী থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত কয়েকটি ক্যান্টনমেন্টের দেশীয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এঁদের সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্য ছাত্রভাণ্ডার থেকে আত্মোন্নতির নরেন বোসকে বারাণসীতে বসানো হয়। পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে এই সংযোগ রাসবিহারীবাবুর কাজে লাগে।

ফোর্ট উইলিয়ামের সৈন্যদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হওয়ার কিছুদিন পরে ঐ সৈন্যরা নরেন চ্যাটার্জিকে বলেন, গঙ্গা পার হয়ে তাঁদের পক্ষে শিবপুরে যাওয়া-আসা করা শক্ত। ননীবাবু কথাটি নিখিলবাবুকে জানিয়ে সৈন্যদের ছাত্র-ভাণ্ডারে এসে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে বলেন। এ-ব্যাপারে যতীনদার সম্মতি প্রয়োজন। তিনি শোনামাত্রই নিষেধ করেন। বলেন, ছাত্রভাণ্ডারে সৈন্যদের আনাগোনার ফল সব দিক থেকেই খারাপ হবে। তিনি খিদিরপুরে ডাঃ শরৎ মিত্রের গ্রুপের সঙ্গে সৈন্যদের যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা করার উপদেশ দেন।

এই থেকে যুগান্তরের খিদিরপুর কেন্দ্রই হয় ফোর্ট উইলিয়ামের ভারতীয় সৈন্যদের যোগাযোগের আস্তানা। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ডাঃ শরৎ মিত্ররা তিন ভাই ও অন্য বন্ধুরা রাজনীতি থেকে অবসর নেন। পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে যতীনদার কথায় পাঁচুগোপালদা (ব্যানার্জি) এইদিকের ভার নেন এবং ননীবাবুর সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি খিদিরপুরের শিক্ষক আশুতোষ ঘোষ ও দুর্গাচরণ বোসকে নিয়ে ওখানে নতুন কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এঁরা অবশ্য আগে থেকেই দলের কর্মী ছিলেন। এখানে এক কুস্তির আখড়া হয়। সেখানে সৈন্যরা পাঁচুগোপালদার কাছে আসতেন। এঁদের

বাদকদলের একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে। পুলিশ ঘিরে ফেলেছে দেখে পাঁচুগোপালদা আখড়ার বেড়া টপকে পালিয়ে যান। যাদুদাদের সঙ্গে তিনিও প্রায় সাত বৎসর পলাতক ছিলেন। আশুবাবু ও দুর্গাবাবু এখানে এবং ননীবাবু শিবপুরে ধরা পড়ে এবং রেগুলেশনে রাজবন্দী হন। দুইবারেই কিছু সংখ্যক জাঠসৈন্যের কোর্ট মার্শালে সাজা হয়। কি সাজা হয় জানতে পারা যায়নি।

Citizen Protection League: ১৯২০ সালে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব তোলার সঙ্গে সঙ্গে দেশে এমন গণ-চাঞ্চল্য দেখা দেয় যে, ইংরেজ সরকার, ইংরেজ ব্যবসায়ী ও নাগরিক আন্দোলনের সম্ভাবনা সম্পর্কে বেশ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে। এ আতঙ্ক যুদ্ধের যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের এবং রাওলাট রিপোর্ট প্রকাশের পর বাংলাতেই বিশেষ ক'রে দেখা দেয়। তার ফলে বাংলা সরকার, ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইংরেজের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স এবং দেশী ও বিদেশী ব্যারিস্টাররা মিলে Citizen Protection League বলে এক রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে। সরকারী বেসরকারী টাকায় চেষ্টা হয় একটা বেসরকারী কর্মীসংঘ গড়ে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করার। এই চেষ্টায় সক্রিয় ভূমিকা ছিল দেশী ব্যারিস্টারদের— বিশেষত এস আর. দাস ও বি সি. চ্যাটার্জির। এঁরা চেষ্টা করেন মুক্ত বিপ্লবীদের বোঝাতে যে, তাঁরা তো অহিংসায় বিশ্বাস করেন না, সুতরাং গান্ধী যখন দেশকে অহিংসার ভ্রান্ত পথে নিয়ে চলেছেন, তখন তাঁরা গান্ধীর সঙ্গে কেন যাবেন।

এঁরা আরও বলেন, বরং এঁদের অর্থানুকূল্যে যদি এঁরা শহরে গ্রামে প্রচার চালান ও সংগঠন গড়েন তাহলে তার সাহায্যে ভবিষ্যতে বিপ্লবের কাজের সুযোগ বাড়বে। অন্য বিপ্লবীরা বিশেষভাবে এই অর্থ সাহায্যকে সন্দেহের চোখে দেখেন এবং এদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করেন। অনুশীলন দল বিপ্লবের চেয়ে একটা coup বা বিদ্রোহের কল্পনাই সাধারণত করতেন। এতে প্রধানত অস্ত্র সংগ্রহের জন্য অর্থের প্রয়োজন বেশি। গান্ধীজীর প্রবর্তিত আন্দোলনের ফলে গণ-জাগরণের সার্থকতা এঁরা বিশেষ দেখেননি। পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে এঁরা সহজেই এই সাহায্য গ্রহণে রাজী হলেন এবং 'ভারতসেবক সংঘ' গড়লেন। নলিনীকিশোর গুহের সম্পাদনায় 'হক কথা' নামে গোপন প্রচারপত্র এবং 'শঙ্খ' নামে সাপ্তাহিক কাগজ বের করেন। এর সাহায্যে এঁদের কর্মীরা জেলায় জেলায় অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার করতে থাকেন।

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের 'বিপ্লবের পদচিহ্ন' গ্রন্থখানির পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পেরে আমরা বিশেষ গর্ব অনুভব করছি। কিছুকাল যাবৎ মুদ্রণ-জগতে নানা বিভ্রাট চলায় গ্রন্থের প্রকাশে কিছু বিলম্ব হল। গ্রন্থকারের বয়স বর্তমানে প্রায় ৮০ বছর, তাঁর পক্ষে প্রুফ-সংশোধন করা সম্ভব হয় নি। অনেকদিন ধরে মুদ্রণের কাজ চলায় বিভিন্ন প্রুফ-রিডারের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। ফলে বানানের সমতা সর্বদা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। 'গান্ধীজী' অনেক সময় 'গান্ধীজি' হয়েছেন; যাঁদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাসূচক 'ওঁর' বা 'করলেন' ব্যবহার করা উচিত, সর্বদা তা ব্যবহৃত হতে পারে নি। কিছু মুদ্রণ-প্রমাদও ঘটে গেছে। এ সমস্ত কারণে গ্রন্থকার ও পাঠকবর্গের কাছে আমরা আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী। অর্থবোধে অসুবিধা ঘটতে পারে এমন কিছু ভ্রম ও সংশোধনের উল্লেখ নিচে করা হল। প্রথম সংখ্যাটি পৃষ্ঠার ও দ্বিতীয় সংখ্যাটি চরণের সূচক; >চিহ্নের পর শুদ্ধ রূপটি দেওয়া হয়েছে;

২৩/৭ তথ্যটা>তত্ত্বটা; ৪৬/১৪ বাপু>বাবু; ৪৬/১৮ Misdeamanant>Misdemeanant; ৪৯/৬ ভগবান দাশগুপ্ত>ভগবানদাস; ৬০/২৭ brought>bought; ৬৩/২৬ ২০শে তারিখে>২৯শে তারিখে; ৭৪/১১ ওর দিকে>ওঁর দিকে; ৮২/১৪ কফির>কপির; ৮৩/১১ সেইদিন>যেদিন; ৮৮/১৭ অক্ষপথে>কক্ষপথে; ৯৪/১৩ মারাঠা>মারাঠী; ৯৭/২ তা তিনি আমায়>তা তিনি শুনবেন না, আমায়; ৯৭/২৩ মধ্যস্থ>মধ্যস্থতা; ১১০/১০ তাজা ফল যেন>তাজা ফল যদি ভালো না পাওয়া যায়, কিশমিশ পেস্তা প্রভৃতি শুকনো ফল যেন; ১১৫/২৯ বায়া>বাঁয়া; ১৩৮/১০ নিবেদিত-জীবনে>নিবেদিত-

জীবন ; ১৪৯/২১ সি. সি. চ্যাটার্জি>বি. সি. চ্যাটার্জি ; ১৫১/১২ বর্তমান কলা>মর্তমান কলা ; ১৫৮/৩০ একটি তালিকা ক'রে>একটি ক'রে ; ১৭০/৭ দিয়েছিল>দিচ্ছিল ; ১৭১/১৬ কারও কাছে নয়। >কারও নেই। ; ১৭৮/১০ জন্যে।>জন্যে তা জানতে। ; ১৭৯/১৮ পাশ করেন।>পাশ করান। ; ১৮১/৮ চৌরিচৌরা বাজে>চৌরিচৌরা বলে ; ১৮৮/১১ হাসান একেন্দি>হাসান এফেন্দী ; ১৮৯/২৯ এগিয়ে চলি।>এড়িয়ে চলি। ; ১৯১/৫ রাজদ্রোহ>রাজদ্রোহ-জনক ; ২০২/২৭ আমরা বলি,>আমি বলি, ; ২১৬/২৪ ইনসিনে এনেও> ইনসিনে এসেও ; ২২৬/২৫ ভিক্ষুক>ভিক্ষু ; ২৩৮/৫ নিতে যাচ্ছেন। >নিতে যাচ্ছেন। ; ২৪০/১৭ লাল লাজপত>লালা লাজপত ; ২৪১/১০ মহম্মদ অজাম>মহম্মদ আজম ; ২৪২/১, ২৬, ২৯ মহম্মদ অজাম>মহম্মদ আজম ; ২৫৭/১ সামনেই>সমানই

—